নাট্যকার মধুসূদন

ক্ষেত্র গুপ্ত

অধ্যাপক, সিটি কলেজ এবং রামমোহন কলেজ, কলিকাতা।

প্রকাশক :
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
গ্রন্থ-নিলয়
৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
কমল শেঠ

বেঁধেছেন :
সারদা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০, সূর্য সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোল লেন
কলিকাতা-৯

মূল্য : ৬·৫০

আমার অধ্যাপক সুসাহিত্যিক—

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

নিবেদন

মধুসূদনের নাট্যগ্রন্থাবলী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র আলোচনার চেষ্টা সম্ভবত এই প্রথম। বর্তমান গ্রন্থটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ। সেই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় হল মধুসূদনের কবিমন এবং কাব্যগ্রন্থাবলীর আলোচনা। "মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প" নামে তা আগেই প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যগ্রন্থাবলীর আলোচনা উক্ত পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়ে কবির পত্রাবলীর সহায়তায় তাঁর জীবন, মন এবং শিল্পকর্ম বুঝবার চেষ্টা। "কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী" নামক গ্রন্থে তা প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে মধুসূদনের অন্যান্য নানা বিষয়ক সৃষ্টি-কর্মের আলোচনা স্থান পাচ্ছে "মধু-বিচিত্রা" নামক গ্রন্থে।

বর্তমান গ্রন্থ রচনায় আমি সর্বদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তর উৎসাহ এবং আশীর্বাদ লাভ করেছি। আমার অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীবিভূতি চৌধুরী আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন। বন্ধুবর জ্যোতির্ময় মজুমদার এবং চিন্ময় মজুমদার গ্রন্থটি সুন্দর করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

১৭।৮।৬২ ক্ষেত্র গুপ্ত

বিষয় সূচী

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা (সম্পাদনা)

মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প

মধু-বিচিত্রা

কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী

প্রথম অধ্যায়

নাট্যকার মধুসূদন

বন্দী বিহঙ্গের মুক্তিস্বপ্ন

॥ এক ॥

মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে আধুনিকতার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা নাটকেও তিনি আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলার নব-জাগৃতির মর্মসত্যকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ন্যায় তিনি বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেন নি, জ্ঞানসাধনা ও সমাজ-কর্মের মধ্যে প্রয়োগ করতে চান নি। তিনি আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে, উপলব্ধির সমগ্রতা দিয়ে এ-সত্যকে বুঝেছিলেন। সাহিত্যশিল্পরূপে সেই বোধকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য, মধুসূদনের প্রতিভা যে পরিমাণ কাব্যসাফল্য লাভ করেছিল, সে পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব নাট্যরচনায় আয়ত্ত করতে পারে নি। তিনি প্রথম শ্রেণীর একাধিক কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু প্রথম শ্রেণী সুলভ উৎকর্ষ তাঁর লেখা কোন নাটক লাভ করে নি; অবশ্য একখানা প্রথম শ্রেণীর প্রহসন তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সাধারণ দুর্বলতার কথা মনে রাখলে মধুসূদনের নাট্যকৃতিরও প্রশংসা না করে পারা যায় না। মঞ্চানুগ নাট্যধারায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর নাটক কেউই লেখেন নি। তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট নাটক যাঁরা লিখেছেন মধুসূদন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কৃষ্ণকুমারীর কথা মনে রাখলে বলতে হয় বাংলা ভাষায় ভাল নাটক তিনিই প্রথম লিখেছেন। তার চেয়েও বড় কথা বাংলা নাট্যসাহিত্যের মুক্তির পথটি তিনিই স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

নাট্যকার হিসেবে মধুসূদনের কৃতিত্ব যতখানি সাহিত্যিক তার চেয়ে অনেক বেশি ঐতিহাসিক। একারণেই মধুসূদনের নাট্যপরিচয়ের পূর্বে বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

॥ দুই ॥

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। এই বৎসর পর্যন্ত মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে উনত্রিশ খানা নাটক প্রকাশিত হয়। কবির

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র প্রকাশ কাল ১৮৬১ সাল। কবির নিয়মিত নাট্যরচনার এখানেই সমাপ্তি।) এই বৎসর পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা নাটকের সংখ্যা বেয়াল্লিশ। এই নাটকগুলির তালিকার[১] পর্যালোচনার তাৎপর্য আছে।

১৮২২

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন,

গদাধর ন্যায়রত্ন এবং

রামকিঙ্কর শিরোমণি—আত্মতত্ত্ব কৌমুদী[২]

? —হাস্যার্ণব[৩]

১৮২৮

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার—কৌতুকসর্বস্ব নাটক[৪]

১৮৪৮[৫]

রামতারক ভট্টাচার্য—অভিজ্ঞান শকুন্তলা

১৮৪৯

নীলমণি পাল—রত্নাবলী

১৮৫২

তারাচরণ শিকদার—ভদ্রার্জুন

যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত—কীর্তিবিলাস

১৮৫৩

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাবু

হরচন্দ্র ঘোষ—ভানুমতী-চিত্তবিলাস

১৮৫৪

রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীনকুলসর্বস্ব

১৮৫৫

নন্দকুমার রায়—অভিজ্ঞান শকুন্তলা

১৮৫৬

উমেশচন্দ্র মিত্র—বিধবা-বিবাহ

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—বিধবোদ্বাহ

রাধামাধব মিত্র—বিধবামনোরঞ্জন

রামনারায়ণ তর্করত্ন—বেণীসংহার

১৮৫৭

কালীপ্রসন্ন সিংহ—বিক্রমোর্বশী

বিহারীলাল নন্দী—বিধবা-পরিণয়োৎসব

১৮৫৮

কালীপ্রসন্ন সিংহ—সাবিত্রী সত্যবান

তারকচন্দ্র চূড়ামণি—সপত্নী নাটক

নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি—কলিকৌতুক

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—বিদ্যাসুন্দর

রামনারায়ণ তর্করত্ন—রত্নাবলী

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—মুক্তাবলী

হরচন্দ্র ঘোষ—কৌরববিয়োগ

১৮৫৯

উমাচরণ দে—নলদময়ন্তী

কালিদাস শর্মা—মুক্তাবলী

কালীপ্রসন্ন সিংহ—মালতীমাধব

মধুসূদন দত্ত—শর্মিষ্ঠা

মণিমোহন সরকার—মহাশ্বেতা

১৮৬০

মধুসূদন দত্ত—একেই কি বলে সভ্যতা

মধুসূদন দত্ত—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

মধুসূদন দত্ত—পদ্মাবতী

দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণ

যদুনাথ মিত্র—বিশ্ববিনোদ

রামনারায়ণ তর্করত্ন—অভিজ্ঞান শকুন্তলা

রামচন্দ্র দত্ত—বাল্যবিবাহ

শ্যামাচরণ শ্রীমানী—বাল্যোদ্বাহ নাটক

শিমুয়েল পীরবক্স—বিধবাবিরহ

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—মালবিকাগ্নিমিত্র

১৮৬১

মধুসূদন দত্ত—কৃষ্ণকুমারী

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—চপলা-চিত্ত-চাপল্য

হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দলভঞ্জন

এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম পর্বের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। সরাসরি অনুবাদ বা অনুবাদধর্মী নাটক রচনার দিকেই ঝোঁকটি ছিল বেশি, তাও আবার সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের দিকে। সমকালীন সামাজিক সমস্যা নিয়ে মৌলিক নাটক বিশেষ করে প্রহসন লিখবার তাগিদও তাঁরা খুবই অনুভব করেছেন। তালিকার বেয়াল্লিশটি নাটকের মধ্যে অনুবাদজাতীয় রচনা ষোলটি, তার মধ্যে পনেরোটিই সংস্কৃত থেকে, বাকী একটি ইংরেজী থেকে। মৌলিক নাটকের মধ্যে সতেরোটি সমাজসমস্যামূলক (প্রধানত প্রহসন), চারটি পুরাণাশ্রিত, দুটি কাল্পনিক, একটি ইতিহাসাশ্রিত এবং একটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

(নাট্যকাররূপে মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রধান প্রবণতাগুলি বুঝবার জন্য এ পর্বের কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যকার (তিনজন মাত্র একাধিক নাটক লিখেছেন) এবং কয়েকটি বিশিষ্ট নাটক সম্পর্কে কিছু পরিচয় নিতে হবে।)

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক। ভদ্রার্জুনের কাহিনী মহাভারতের অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ-ঘটনাকে আশ্রয় করেছে। এই নাটকের ভূমিকাটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য,

> "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে,—। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে য়ুরোপীয় নাটকের প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্যপদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় য়ুরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরেজী ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্তে 'সংযোগস্থল' ব্যবহার করা গেল। যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। নাটক-নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় য়ুরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। য়ুরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের

প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ য়ুরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

নাট্যরচনা হিসেবে ভদ্রার্জুনের মূল্য সামান্য। প্লটগঠনে, চরিত্রসৃষ্টিতে বা সংলাপ রচনায় নাট্যকার কিছুমাত্র দক্ষতা দেখাতে পারেন নি, পারা স্বাভাবিকও ছিল না। এই নাটকটির মূল্য ঐতিহাসিক কারণে। লক্ষ্য করবার মত, নাট্যরচনার প্রারম্ভ কালেই বাঙালি নাট্যকার ইংরেজী নাটকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন।

'কীর্তিবিলাসে' দেখি ট্রাজেডি রচনার চেষ্টা। রূপকথার শীত-বসন্ত জাতীয় একটি কাহিনী অবলম্বনে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত য়ুরোপীয় আদর্শে ট্রাজেডি লিখতে চেয়েছেন। সব দিক থেকেই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এর ঐতিহাসিক মূল্যও উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের ভূমিকায়ও নাট্যকার এমন কিছু মন্তব্য করেছিলেন নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যা একান্তভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন,

"অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যন্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, এ কারণ সেক্‌সপীয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোকপ্রয়াসী।

* * * *

আরিষ্টটল নামা গ্রীসদেশীয় সুপণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যদি কখন উক্ত দেশস্থ নাট্যশালে অভিনয়কালে দুই বা অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত, যে কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট তখন করুণাভিনয়কারকেরাই জয়পতাকা পাইত। আশঙ্কা এবং অনুকম্পা সাধারণ জনগণের মনোমধ্যে অশেষ মায়া উপস্থিত করিয়া অন্যান্য অভিনয়ের ক্ষণিক হর্ষ এবং উল্লাস নির্বাণ করিত। পতি লইয়া পতিব্রতা কামিনী পতিসহ আমোদপ্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিল, শুনিলে হর্ষ জন্মে, কিন্তু পতিবিয়োগে পতিব্রতা কামিনী পতিসহ প্রাণত্যাগ করিল, শ্রবণে করুণা উপস্থিত হয়।

হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা বহুকালস্থায়িনী। ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার কালে তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র। জীবনধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এমত নহে। অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, সুতরাং যে করুণাভিনয়ে অধর্ম বিরুদ্ধে পুণ্যবান ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সেই করুণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ জন্মে।"

যে দেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এই জাতীয় রচনাকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ সে দেশে এরূপ সাহসিক প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদধর্মী নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রকাশিত হয়। নাটকটি সেক্‌সপীয়রের "Merchant of Venice"-এর মুক্ত অনুবাদ। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অনুবাদ করতে গিয়েও তিনি সংস্কৃত নাটকসুলভ নান্দী-সূত্রধরের মোহ ত্যাগ করেন নি। তাঁর রচনার নাট্যগুণ একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ১৮৫৮ সালে তিনি 'কৌরব বিয়োগ' নামে পুরাণাশ্রিত এক নাটক লিখলেন। এটিও একান্তভাবে বিবৃতিধর্মী। কথোপকথনে পাঠ্য পুস্তক রচনারই ইচ্ছা তাঁর ছিল। আপনার নাটকের ভূমিকায় হরচন্দ্র ঘোষ একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। অভিনয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেন নি। তাঁর অপর নাটক দুটি পরবর্তী কালের রচনা।[৬] তাঁর নাট্যরচনা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না, বাংলা নাটকে তিনিই প্রথম সেক্‌সপীয়র-অনুবাদের সূচনা করলেন।

রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয়ও ছিল না। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের বিদ্যালয়েই তিনি পাঠ নিয়েছিলেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন। সংস্কৃত নাট্য-আঙ্গিকের প্রভাব অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে ছিল একরূপ অসম্ভব। এমন কি সমকালীন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নাটকেও তিনি নান্দী-প্রস্তাবনা পরিহার করতে পারেন নি, গদ্যে-পদ্যে সংলাপ লিখেছেন। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যকলার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েও ইংরেজী অনভিজ্ঞ রামনারায়ণ শুধুমাত্র আপন অন্তর্দৃষ্টির বলে নবযুগে পদার্পণ করতে পেরেছেন। প্রথমত, সমকালীন সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে তিনি একাধিক নাটক ও প্রহসন রচনা করেছেন, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং

পুরাণের রাজ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখেন নি। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক সমাজসমস্যা বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমাজচেতনা নবযুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। প্রহসনের সমাজবোধে যে লঘুতা থাকে তাঁর দুখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক তা থেকে মুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি একখানি ট্রাজেডি লিখে মোহমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্থত, প্রধানত সংস্কৃতানুগ আলঙ্কারিক রীতির সংলাপ রচনা করলেও, সামাজিক নাটকের (বিশেষত প্রহসনে) সংলাপে কখনও কখনও জীবনৈকট্য এবং উত্তাপ অনুভূত হয়েছে।

রামনারায়ণের প্রথম নাটকটি লঘু ভঙ্গীতে রচিত হলেও বিষয়গুরুত্বে আদৌ মামুলী প্রহসনের পর্যায়ে পড়ে না। প্লটে সংহতির অভাব আছে, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন নকশার শিথিলবদ্ধ সঙ্কলন বলে একে মনে হয়। তবে কুলপালকের তিন কন্যার চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি বিস্ময়কর জীবনসামীপ্য দেখিয়েছেন। কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে রহস্যরস সৃষ্টি করলেও রামনারায়ণ মনের দিক থেকে ছিলেন 'সিরিয়াস'। তাঁর 'চক্ষুদান,' 'উভয় সঙ্কট' প্রভৃতি প্রহসন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর রচনা।[৭]

কুলীনকুলসর্বস্ব লিখে খ্যাতি অর্জন করবার পরে তিনি স্বাধীন সামাজিক নাট্যরচনা পরিহার করে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করতে শুরু করলেন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে তিনি 'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী' এবং 'শকুন্তলা' নাটকের অনুবাদ করেন। পরে তিনি 'মালতীমাধব' নাটকটিরও অনুবাদ করেছিলেন। সম্ভবত কুলীনকুলসর্বস্ব লেখার খ্যাতিকে তিনি আকস্মিক বলে মনে করেছিলেন, এই খ্যাতিকে স্থায়ী করবার জন্য তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কাছ থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এই অনুবাদগুলি বাংলা ভাষার কোনরূপ উন্নতিই সূচিত করে না।

(তাঁর 'রুক্মিণীহরণ', 'ধর্ম বিজয়' (হরিশ্চন্দ্র কাহিনী অবলম্বনে রচিত) এবং 'কংসবধ' প্রভৃতি মৌলিক পুরাণাশ্রিত নাটক পরবর্তী কালে রচিত। এগুলি সংস্কৃত নাটকের আদর্শকে সম্পূর্ণত অনুকরণের চেষ্টা করেছে।)

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবুনাটক' বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন। এই ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া রচনাটির অন্য কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। তিনি 'বিক্রমোর্বশী' এবং 'মালতীমাধবে'র অনুবাদ করেছিলেন এবং সংস্কৃত নাটকের আদর্শে 'সাবিত্রী সত্যবান' নামক মৌলিক পুরাণাশ্রিত নাটকও রচনা করেছিলেন।

সমকালীন সমাজসমস্যাকে কেন্দ্র করে সেকালে যেসব নাটক রচিত হয়েছিল তার মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে নাম করতে হয় উমেশ মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকের। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সপক্ষে রচিত এই নাটক প্রচারধর্মী বক্তৃতায় পরিণত না হয়ে পূর্ণাঙ্গ নাট্যকাহিনী ও প্রাণবন্ত চরিত্রের সমন্বিত রূপ হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসের বিচারে এটি বাংলা নাটকের দ্বিতীয় ট্রাজেডি। কিন্তু কীর্তিবিলাসের তুলনায় এখানে ট্রাজিক রস অনেক বেশী দানা বেঁধেছে।

॥ তিন ॥

মধুসূদনের নাট্যকার হিসেবে আবির্ভাবকাল পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনের যে পরিচয় নেওয়া হ'ল, তার সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার ক্রমবিবর্তনের চিত্রটি মিলিয়ে বিশ্লেষণ করলে সমকালীন বাঙালির নাটকীয় রুচি ও প্রবণতার পরিচয় মিলবে।[৮]

১৮৭৬ সালে নাটকবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে।

এক। ১৮৫৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রস্তুতি পব।

দুই। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত সখের থিয়েটারের কাল।

তিন। ১৮৭২ সাল থেকে আরম্ভ হল সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যুগ।

প্রস্তুতি পর্বের আরম্ভ ১৭৯৫ সালে গেরাসিম লেবেডফ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'বেঙ্গলি থিয়েটার' থেকে। য়ুরোপীয় রীতিতে বাংলা নাটকের এই প্রথম অভিনয় হল। নাটক দুটি 'The Disguise' এবং 'Love is the best doctor' নামক দুটি ইংরেজী প্রহসনের অনুবাদ।

এই নাট্যাভিনয়ের পরে দীর্ঘকাল বাংলা নাটকের মঞ্চাভিনয়ের কোন নিদর্শন মেলে না। একদিকে পুরাতন যাত্রার অনুসরণ চলছিল, অন্যদিকে সহরাঞ্চলে নব্য শিক্ষার প্রভাবে যাত্রা বিষয়ে একটা বিরুদ্ধভাব তীব্রতর হচ্ছিল। পুরাতন যাত্রাকে মার্জিত ও রুচিসম্মত করে উপস্থাপিত করবার চেষ্টাও চলছিল কোন কোন মহলে। সাহেব পাড়ায় ইংরেজদের স্থাপিত রঙ্গমঞ্চগুলিতে সেক্সপীয়র প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যকারদের নাটকাভিনয় হত। সেখানে বাঙালি তরুণদের ভীড় লেগেই ছিল। কেউ কেউ নাট্যাভিনয়ে যোগও দিতেন। এরই অনুকরণে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে হিন্দু

থিয়েটার স্থাপিত হয়। সেক্সপীয়রের নাটকের পাশাপাশি এখানে 'উত্তররাম চরিতে'র ইংরেজী অনুবাদও অভিনীত হয়।[৯]

১৮৩৩ সালে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু যে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন তাতে বাংলা নাটকের অভিনয় হত। নাট্যালয়টিতে প্রথম দু বৎসর বেশ কয়েকখানা নাটকের অভিনয় হয়েছিল বলে খবর পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব নাটক সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। ১৮৩৫ সালে এখানে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়েছিল।

এই প্রস্তুতি পর্বের নাট্যাভিনয় থেকে সাধারণভাবে বাঙালির নাট্যরুচি ও প্রবণতা বিষয়ে কিছু সূত্র আবিষ্কার করা চলে।

এক। এ দেশে এতকাল প্রচলিত লোকাভিনয় সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিত বাঙালি ক্রমেই অধিকতর বিরূপ হয়ে উঠছিল। এ বিষয়ে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' লেখা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> "খেঁউড় ও কবি যে কি পর্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই।...ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্রসমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।..গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেকস্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্মলরসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড় প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষী-দিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।"

শিক্ষিতশ্রেণীর এরূপ মনোভাবের ফলে কলকাতায় পুরাতন যাত্রাকে মার্জিত ও রুচিসম্মত করে তোলার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজী ধরনের

রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় যাঁদের মন কেড়ে নিয়েছিল এই নব্যযাত্রা তাদের যথার্থ দাবি মেটাতে পারল না।

দুই। ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৩ সালের পূর্ব থেকে য়ুরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত রঙ্গমঞ্চে ইংরেজী নাটকের অভিনয় চলছিল। বাঙালি শিক্ষিতশ্রেণীর মনও ঐ জাতীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করত। প্রসন্নকুমারের নাট্যালয় বা সহরের স্কুলকলেজে প্রতিষ্ঠিত ড্রামাটিক ক্লাবগুলির উদ্ভব এই উৎসেই।

তিন। বাংলা সাহিত্যে নাটকের উদ্ভব ঘটলেও তখনও মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে তা সম্পর্কিত হয় নি। এই সময় পর্যন্ত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে দু-একটি ইংরেজী নাটকের অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা যাত্রার ঢঙে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে মঞ্চোপযোগী রূপ দিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

চার। ইংরেজী ধরনের মঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় স্বভাবতই এই পর্বে ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত এবং সংখ্যার দিক থেকেও গুরুত্বহীন।

বাংলা নাট্যশালার দ্বিতীয় পর্ব সখের থিয়েটারের যুগ। ১৮৫৭ সালের সাতুবাবুর বাড়ির 'শকুন্তলা' নাট্যাভিনয় থেকে এই পর্বের সূত্রপাত। এই পর্বের কলকাতার বিশিষ্ট রঙ্গালয়গুলি হল রামজয় বসাকের বাড়ির অভিনয় কেন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ, পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা, মেট্রোপলিটান থিয়েটার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় এবং বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (শ্যামবাজার নাট্যসমাজ)। এ ছাড়াও কলকাতায় এবং মফস্বলে কতগুলি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে যেসব নাট্যাভিনয় হয়েছিল তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির একটি তালিকা বৎসরানুযায়ী এখানে দেওয়া হল।[10]

১৮৫৭। অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কুলীনকুলসর্বস্ব, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার, মহাশ্বেতা।

১৮৫৮। কুলীনকুলসর্বস্ব, রত্নাবলী।

১৮৫৯। বিধবাবিবাহ নাটক, শর্মিষ্ঠা, মালবিকাগ্নিমিত্র।

১৮৬০। মালবিকাগ্নিমিত্র।

১৮৬৫। কৃষ্ণকুমারী (?), একেই কি বলে সভ্যতা, বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম তেমনি ফল, পদ্মাবতী।

১৮৬৬। বুঝলে কিনা, নবীন তপস্বিনী (?), মহাশ্বেতা, শকুন্তলা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, সীতার বনবাস।

১৮৬৭। কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, নবনাটক, কিছু কিছু বুঝি, পদ্মাবতী, শকুন্তলা।

১৮৬৮। সধবার একাদশী, রামাভিষেক, নলদময়ন্তী, ইন্দুপ্রভা, উষানিরুদ্ধ, বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি, জানকীবিলাপ, কৃষ্ণকুমারী, এরাই আবার বড়লোক।

১৮৬৯। মালতীমাধব, বেণীসংহার।

১৮৭০। চক্ষুদান, উভয়সঙ্কট, ভ্যালারে মোর বাপ।

১৮৭১। প্রভাবতী।

১৮৭২। রুক্মিণীহরণ, লীলাবতী, উভয়সঙ্কট।

এই তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী ঝোঁক ছিল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং পুরাণাশ্রিত নাটক অভিনয়ের দিকে। ১৮৬৫ সালে 'পদ্মাবতী' নাটক যখন প্রথম অভিনীত হ'ল তখন নাটকটি সংস্কৃতানুগ নয় বলে সাময়িক পত্রিকায় নিন্দিতও হয়েছিল। জনপ্রিয়তার দিক থেকে সম্ভবত প্রহসনের স্থান ছিল দ্বিতীয়। মঞ্চাভিনয়ে এ জাতীয় নাটকের সংখ্যাপ্রাচুর্য অনুরূপ ইঙ্গিতই করে।

এই পর্বের মঞ্চাভিনয়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বিবৃত করা যেতে পারে।

এক। দ্বিতীয় পর্বের বিশিষ্ট রঙ্গালয়গুলি সবই ধনী ব্যক্তিদের উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট। অভিজাত শ্রেণীর মনোভাব এই রঙ্গালয়গুলির পরিচালনায় নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। জাঁকজমক, সাজসজ্জা, মঞ্চব্যবস্থা ও অভিনয়কলার উৎকর্ষের দিকে এঁরা বিশেষ নজর দিতেন এবং তার জন্য প্রভূত অর্থব্যয়েও কার্পণ্য করতেন না। য়ুরোপীয় ধরনের মঞ্চসজ্জা ও অভিনয়াদির আদর্শই যে এঁদের চোখের সামনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিশিষ্ট বিদেশিদের আমন্ত্রণ করতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না, নিজেদের নাট্যউপস্থাপনার কলাকৌশল সম্বন্ধে তাঁরা এতটা সাহস পোষণ করতেন।

দুই। পূর্ব পর্বের তুলনায় এইসব মঞ্চগুলিতে নাট্যাভিনয় ব্যবস্থা কিছুটা নিয়মিত করবার চেষ্টা হয়েছিল। বহু নাটকই একাধিকার এক মঞ্চে অভিনীত

হয়েছে, কোন কোন নাটক এক মঞ্চে আট-নয়বার পর্যন্ত অভিনীত হবার সংবাদ পাওয়া যায়।

তিন। বাংলা নাটকের জন্ম হয়েছে। এই কালসীমার মধ্যে অনেক-গুলি নাটক রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মঞ্চের সঙ্গে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারার সম্পর্ক ঘটেছে। নাটক রচিত হবার পেছনে মঞ্চানুকূল্য যেমন প্রয়োজন, মঞ্চের আয়ুষ্কাল এবং সমুন্নতিও নাট্যরচনার উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। বাংলা নাটক ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই সম্পর্ক শুভ ফলপ্রদ হয়েছে সন্দেহ নেই। এই পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাট্যাবলী সর্বাধিক অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে। বিভিন্ন মঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের মঞ্চে তাঁর নিজের নাটকের অভিনয় হয়েছে, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তাই। মধুসূদনের নাটকের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বেলগাছিয়া থিয়েটারের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও অমরত্ব লাভ করেছে। মনোমোহন বাবুর নাটকগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়। এই পৃষ্ঠপোষকতা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যেমন উৎসাহের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তেমনি আবার নাট্যসৃষ্টির প্রাচুর্য ও বহুমুখীতাকে সীমাবদ্ধও করেছে। মঞ্চের উপরে ধনিক ব্যক্তিবিশেষের আধিপত্য, মঞ্চের সংখ্যাল্পতা এবং অভিনয়ের অনিয়মিত ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রেই নাট্যপ্রতিভাকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিতে পারে নি। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের বিকাশকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে।

চার। আরও একটি দিকে এই দ্বিধা প্রকট। মঞ্চসজ্জা, অভিনয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইংরেজী রঙ্গালয়ের আনুগত্য ও অনুকরণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নাটক নির্বাচনের দিকে এঁদের ঝোঁকটি প্রাচীন ভারতীয় রচনার প্রতিই ধাবিত। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং ঐ আদর্শে রচিত পুরাণাশ্রিত নাটকাভিনয়ের দিকেই এঁরা সবিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন। Content-এর দিক থেকে এঁরা অনেকেই প্রাচীনের পক্ষাবলম্বন করলেও, form-এর দিক থেকে পাশ্চাত্ত্য রীতিকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন। এই দ্বিধা বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম পর্বে অতিপ্রকট। তবে বিশিষ্ট সখের থিয়েটারগুলির মধ্যে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি, মেট্রোপলিটান থিয়েটার, জোড়াসাঁকো থিয়েটার এবং বাগবাজার এমেচার থিয়েটার নাট্য-বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তুলনামূলক প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ রঙ্গালয়পূর্ব যুগের অভিনীত নাটকগুলির সঙ্গে

সাধারণ রঙ্গালয় যুগের নাটকগুলির তুলনা করলে এই সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে অভিজাতদের সখের পৃষ্ঠপোষকতার তুলনায় সাধারণ রঙ্গালয় পুরাতন রীতি ও ভঙ্গির নাটক অপেক্ষা নবীন ভঙ্গির নাটকের বিশেষ করে সামাজিক ও ইতিহাসাশ্রিত নাটকের দিকে অধিক ঝোঁক দেখিয়েছিল।

ঐতিহাসিক কারণেই শেষ পর্যন্ত অভিজাত পৃষ্ঠপোষিত সখের থিয়েটারের স্থানে এল সাধারণ রঙ্গালয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন,

> "বহু বৎসর ধরিয়া সখের থিয়েটার করার ফলে এদেশে নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপত্তিও ঘটনাচক্রে একটি সখের দল হইতেই হয়। সুতরাং বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ও প্রসারে সখের থিয়েটারের কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহের একান্ত তৃপ্তি হয় নাই, উহাতে একটু অভাব ছিল। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন বড়লোকের উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়িতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্তার গণ্যমান্য বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জন সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও জনসাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। নিতান্ত রবাহূত হইয়া গেলেও বিমুখ হইয়া আসিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। এই সুবিধা ছাড়া সে-যুগের নাট্যাভিনয়ের আর একটি অসম্পূর্ণতাও ছিল। তখন পর্য্যন্তও বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক ভাবে আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী বা বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজুক দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, মত-পরিবর্ত্তন বা উৎসাহলোপ হইলে সে-নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইত, এবং আর একজন নাট্যানুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না-হওয়া পর্যন্ত নাট্যাভিনয় একেবারে বন্ধ থাকিত।"
>
> —[বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।]

১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সখের থিয়েটারের ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হল।

বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চের বিকাশের এই পটভূমিতে স্থাপন করলেই মধুসূদন দত্তের নাট্যকার-পরিচিতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাবে।

॥ চার ॥

বাঙালির নাট্যচেতনা ইংরেজী সাহিত্য-শিক্ষা তথা নাট্যাভিনয়ের সংস্পর্শে এসে উদ্বোধিত হয়েছিল। মধ্যযুগের অবশেষ পুরাতন যাত্রা প্রভৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা তীব্র ছিল। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যোপস্থাপনা সম্পর্কে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষিত বাঙালির হচ্ছিল না। অথচ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার তাদের সামনেই পড়ে ছিল। নব্য বাঙালি ইংরেজী রীতিতে নাট্যাভিনয় করতে চাইল, রঙ্গমঞ্চ তৈরী করল, ইংরেজী রীতির নাট্যরচনার প্রতি আগ্রহ দেখাতেও সুরু করল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তার জাতীয়তাবাদের কাছে সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণই এখনও হয়ে রইল যুগের মূল আদর্শ। অধিকাংশ মঞ্চ সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের প্রতিই আগ্রহ দেখাতে লাগল। দু-একজন নাট্যকার ইংরেজী নাট্যরীতির প্রতি সরব সমর্থন জানালেন। ট্রাজেডি রচনার সমর্থনেও কেউ কেউ এগিয়ে এলেন। কিন্তু এখনও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ঝোঁকটাই বেশি, গম্ভীর রসের মৌলিক নাটক লিখতে গেলে সংস্কৃতানুযায়ী পুরাণাশ্রিত নাট্যরচনার পথে তাঁরা বেশি করে চলতে লাগলেন। মৌলিক সামাজিক নাটক এমন কি ইংরেজী নাটকের অনুবাদেও নান্দী-প্রস্তাবনা স্থান পেয়েছে। সংলাপে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ চলেছে। সংলাপে সংস্কৃতানুগ বর্ণনামূলক ভাষা এবং সামগ্রিক নাটকের বিবৃতি ধর্ম তথা বিদূষক চরিত্র-কল্পনায়ও সংস্কৃতানুসারিতা চলেছে। আসলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টির প্রেরণা এসেছে ইংরেজী শিক্ষা এবং য়ুরোপীয় আদর্শ থেকে। মঞ্চাভিনয় ও সাজসজ্জায়ও এই প্রভাব রয়েছে। নাট্যসাহিত্য রচনার তথা অভিনয়ের জন্য নাটক নির্বাচনে সংস্কৃতেরই জয় জয়কার চলেছে। মধুসূদনের পূর্বে যে দু একজন ইংরেজী আদর্শে নাটক রচনা করতে চেয়েছেন তাঁরা সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য ধারার নাটকের আভ্যন্তরীণ পার্থক্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারেন নি। তারাচরণ শিকদারের নাটকের ভূমিকা থেকে বোঝা যায় এই পার্থক্যবোধ তাঁর চিত্তের বহিরঙ্গ অতিক্রম করতে পারে নি।

এই ইতিহাসধারায় মধুসূদনের আবির্ভাব। নাট্যকাররূপে মধুসূদনের মূল্যায়ন নির্ভর করে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলির উপরে।

এক। নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রভাব।

দুই। মধুসূদনের নাটকে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যরীতির মধ্যে পথের সন্ধান।

তিন। মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা বনাম কবিপ্রতিভা।

চার। মধুসূদনের নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ধারা।
প্রত্যেকটি নাটকের সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিমাণ স্বতন্ত্র ও বিস্তৃতভাবে নির্ণয়যোগ্য।

॥ পাঁচ ॥

বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকতায় মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। এই বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রভাবে তার নাট্যপ্রতিভা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিতও হয়েছিল। আবার এই রঙ্গমঞ্চই নাট্যকাররূপে কবির সাফল্যের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালার স্বরূপ এবং কবির সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিমাণ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এই নাট্যশালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাকের নিম্নোদ্ধৃত সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

> "To say that the Belgatchia Theatre scored brilliant success, is to repeat a truism that has passed into a proverb. It actuated a success unparalleled in the annals of Amateur Theatricals in this country. The graceful stage, the superb sceneries, the stiring orchestra, the gorgeous dresses, the costly appurtenances, the splendid get up of the whole concern were worthy of the brother Rajas and the genius of their intimate friend Maharaja Sir Jotindramohan Tagore, an accomplished connoisseur. The performance of a single play, Ratnavali, which alone cost the Rajas ten thousand rupees, realized the idea, and established the character, of the real Hindu Drama with the improvements suited to the taste of an advanced age."[১১]

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে মধুসূদন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই প্রেরণায় তিনি নাট্যরচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের মঞ্চে প্রবেশ করলেন। মধুসূদনের প্রথম নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত ব্যয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে বেলগাছিয়া কর্তৃপক্ষ যে উৎসাহের সৃষ্টি করলেন কবির স্রষ্টাচিত্ত তাতে সাড়া দিয়েছিল, ফলে দ্রুত একের পর এক নাটক রচনা

করতে তিনি শুরু করেছিলেন। একাধিক নাটক ও কাব্যের প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রহসন রচনার জন্য মধুসূদনকে এঁরাই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, প্রহসন দুটি মুদ্রণের ব্যয়ভারও বহন করেছিলেন। মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যজীবনে বেলগাছিয়া থিয়েটারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পাশাপাশি এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না যে ঐ রঙ্গালয়ের যতটা আড়ম্বর, ঐশ্বর্য ও রুচিপারিপট্যা ছিল ততটা সাহসিকতা ছিল না নূতনকে বরণ করবার। মেট্রোপলিটান থিয়েটার যেখানে বিধবাবিবাহের মত নাটকের বারংবার অভিনয়ব্যবস্থা করেছিল, শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি মধুসূদনের একাধিক রচনা প্রথম অভিনয় করার সাহস দেখিয়েছিল, বাগবাজার এমেচার থিয়েটার যেখানে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের মত ঐতিহাসিক কর্তব্য করেছিল সেখানে বেলগাছিয়ার সর্বচেষ্টা মাত্র দুটি নাটকের অভিনয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। তার একটি রত্নাবলীর মত অকিঞ্চিৎকর অনুবাদ, অপরটিও সংস্কৃতরীতির পুরাণাশ্রিত রচনা শর্মিষ্ঠা। পদ্মাবতীতে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ছিল, কিন্তু বেলগাছিয়া কর্তৃপক্ষ তার প্রতি নীরব অবহেলা দেখিয়েছেন; মধুসূদনকে দিয়ে তাঁরা প্রহসন লিখিয়ে নিলেন, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক অভিনয় করলেন না। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় জানা যায় যে সহরের কোন প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের আপত্তির জন্য অভিনয়ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। মধুসূদনের কাব্যনাট্য সুভদ্রা তাঁদের পছন্দ হয় নি, 'রিজিয়া'র পরিকল্পনা তাঁরা প্রত্যাখান করেছেন, কৃষ্ণ-কুমারী অভিনয় করার ব্যাপারেও কোনরূপ আগ্রহ তাঁরা দেখান নি। যে বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে কবির এ পরিমাণ ঘনিষ্ঠতা; যার পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর সাহিত্যজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার এই মনোভাব, ব্যক্তি হিসেবে মধুসূদনের প্রতি বিরুদ্ধতা থেকে আসে নি। আসলে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার মনোবল বা চিন্তাগত প্রগতিশীলতা অধিকাংশের কাছ থেকেই প্রত্যাশিত নয়।

বেলগাছিয়া থিয়েটার মধুসূদনের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছিল তেমনি আবার তাঁর নাট্যরচনাবলীকে নানা দিক থেকে সীমাবদ্ধও করে ফেলেছিল। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির পত্রালাপের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি তাঁর এবং বেলগাছিয়া থিয়েটারের মধ্যেকার যোগসূত্ররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে

ভাবে কেশববাবু এবং বেলগাছিয়া কর্তৃপক্ষের কথামত নাটক লিখতে এবং পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন পত্রগুচ্ছে সেই বিবরণ পড়ে ব্যথিত হতে হয়। অভিনয় ব্যতীত নাট্যরচনা অর্থহীন এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও দৃঢ়। তাই স্বরচিত নাট্যাবলী অভিনয় করাবার কাতরতায় তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে হয়েছিল। অথচ সমকালীন রঙ্গমঞ্চ যথেষ্ট পরিণত ছিল না। ফলে তাঁর নাট্যরচনা নানাভাবে ক্লিষ্ট হয়েছে। শর্মিষ্ঠা নাটকে প্রাচ্য প্রভাবের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য দেখাবার কারণ হল বেলগাছিয়ার আনুকূল্য লাভের বাসনা।

দুই। পদ্মাবতীতেও শুধুমাত্র কাহিনী অংশ ব্যতীত অপর কোন দিকেই সংস্কৃত ভঙ্গি তিনি পরিহার করতে সাহসী হন নি। বেলগাছিয়া থিয়েটার এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কথা মনে রাখার ফলেই এরূপ হয়েছে।

তিন। প্রহসন দুটির, বিশেষ করে 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'র বিস্ময়কর সাফল্যের পরেও এদিকে তিনি আর অগ্রসর হন নি বেলগাছিয়া থিয়েটার কর্তৃক অনাদৃত হবার ফলে। তিনি একাধিকবার তাঁর চিঠিতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন,—

"১। Mind, you all broke my wings once about the farces ; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chineese."

"২। As a scribbler, I am of course proud to think that you like my farces, but to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have farces."

চার। সুভদ্রা কাব্যনাট্যের দু অঙ্ক তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু কেশববাবু তথা বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় আর অগ্রসর হন নি কবি। মধুসূদনের রচিত কাব্যনাট্য বাংলা সাহিত্যের নব দ্বার উন্মোচন করতে পারত।

পাঁচ। হিন্দুদের জাতীয় জীবনে প্রবলপ্রবৃত্তির তরঙ্গ সংক্ষোভের অভাব, এই যুক্তিতে তিনি মুসলমান ইতিহাস থেকে কাহিনী সঙ্কলন করে প্রতীচ্যের আদর্শে ট্রিজিয়া নাটক লিখবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়-কে লেখা পত্রাংশ—

"The Mahomedans are a fiercer race than ourselves and would afford splendid opportunity for the display of passions. Their women are more cut out for intrigue than ours."

তিনি এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হবার পূর্বে তিনি এই বিষয়ে ইংরেজীতে এক কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির পরামর্শে এই পরিকল্পনা শিল্পরূপ পেল না।[১২]

ছয়। কৃষ্ণকুমারীর সংলাপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। অন্তত এর স্বগতোক্তি অংশ অমিত্রাক্ষরে লিখবার কাতর অনুমতি তিনি কেশববাবুদের কাছে চেয়েছিলেন। কিন্তু পান নি। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই নাটকটি অভিনয়ও করেন নি। প্রকৃত য়ুরোপীয় ভঙ্গি এ নাটকে অনেকটা মধুসূদন আত্মসাৎ করেছিলেন, তার উপরে এর রস ট্রাজিক। রত্নাবলী-শর্মিষ্ঠার ভাবরসে পুষ্ট বেলগাছিয়ার এতদূর অগ্রসর হবার মত মনোবল ছিল না। এর ফল হল এই, মধুসূদনের নাট্য-রচনা ক্ষমতা যখন পরিণতি পেল, তখনই তাঁর আর নাটক লিখবার কিছুমাত্র উৎসাহ অবশিষ্ট রইল না।

কবির নাটক এবং প্রহসনগুলির মধ্যে অধিকাংশের ভাগ্যই শর্মিষ্ঠার মত উজ্জ্বল ছিল না। এদের প্রকাশকাল এবং কলকাতার বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে এদের প্রথম অভিনয়ের তারিখ দেখলেই সে সত্য অনুধাবন করা যাবে।

	প্রকাশকাল	প্রথম অভিনয়	রঙ্গমঞ্চ
শর্মিষ্ঠা	১৮৫৯	১৮৫৯, ৩রা সেপ্টেম্বর	বেলগাছিয়া নাট্যশালা
পদ্মাবতী	১৮৬০	১৮৬৫,[১৩] ১১ ডিসেম্বর	পাথুরিয়াঘাটার কোন এক রঙ্গমঞ্চ

একেই কি বলে সভ্যতা	১৮৬০	১৮৬৫, ১৮ জুলাই	শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি
বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ	১৮৬০	১৮৬৬	আরপুলি নাট্যসমাজ
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১৮৬১	১৮৬৭, [১৪] ৮ ফেব্রুয়ারী	শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি
মায়াকানন	১৮৭৪ (মৃত্যুর পরে)	১৮৭৪, [১৫] ১৮ এপ্রিল	বেঙ্গল থিয়েটার

মধুসূদন তাঁর সমকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা ছাড়া তাঁর অপর নাটকগুলির অভিনয় সৌভাগ্য আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। মায়াকাননের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করাই ভাল। কারণ তখন সখের থিয়েটারের যুগ শেষ হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ চল্‌ছে। সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর নাটকগুলিই দীর্ঘকাল প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সখের থিয়েটারের যুগে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, বিশেষত্বহীন পৌরাণিক নাটক এবং অপদার্থ প্রহসনের চাহিদাই ছিল অধিক। নূতনের প্রতি আগ্রহ ছিল না, উৎকর্ষের বোধও ছিল না স্পষ্ট। পদ্মাবতীর মত অভিনব কাহিনীসম্বলিত নাটক প্রকাশিত হবার পরে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কোন রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি। অথচ শর্মিষ্ঠার বিস্ময়কর সাফল্যের পরে তাঁর খ্যাতি সমকালীন সাহিত্য-সমাজের শীর্ষে উঠেছিল। এমন কি বেলগাছিয়ার কর্তৃপক্ষ এ রচনাটির উচ্চ প্রশংসা করলেও অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন নি। পদ্মাবতী প্রথম অভিনীত হয়েছিল এক স্বল্পখ্যাত রঙ্গমঞ্চে এবং সাময়িকপত্রে এটি বিষয়গত অভিনবত্বের জন্যই প্রধানত নিন্দিত হয়েছিল—

> "পদ্মাবতী একখানি বিদেশীয় নাটকের ভাব গ্রহণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে গল্পটির মূল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। কোন পৌরাণিক গল্প না হইলে স্বভাবতঃ এদেশীয় লোক তাহাতে আস্থা করেন না। পদ্মাবতীর ভাগ্যে সেটি ঘটিয়াছিল।"
>
> —['সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকা।]

কৃষ্ণকুমারীর মত নাটক বেলগাছিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নি,

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এটি অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হয়েও পরে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। প্রহসন দুটি নির্দয়ভাবে বেলগাছিয়া কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং পরেও দীর্ঘকাল অভিনীত হয় নি। আসলে মধুসূদনের অসাধারণ মৌলিকতা এবং বিদ্রোহী মনোভাবের স্পর্শ সখের থিয়েটারের অভিজাত কর্তাব্যক্তিরা এড়িয়ে যেতে চাইতেন। তাঁর কাব্যে বিদ্রোহী মনোভাব অনেক তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু কাব্যের রসাস্বাদের জন্য প্রস্তুত থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ, নাট্যউপস্থাপনা উপস্থাপককেও সংগ্রামের অংশীদার করে তোলে। সেদিক থেকে 'শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি' যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন বলা চলে।

মঞ্চাধ্যক্ষদের এজাতীয় নিরুৎসাহ মধুসূদনের মত অভিনয়সচেতন কবি-নাট্যকারের সৃষ্টিউৎসকে যে শুকিয়ে আনবে এ খুবই স্বাভাবিক। বাস্তবত নাট্যসাহিত্যে কবির অধিকতর সাফল্যের অভাবের এ একটি প্রধান কারণ।

॥ ছয় ॥

মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যে পথের সন্ধান চলেছে। ইংরেজী নাট্যরীতি অনুসরণের বাসনা কোন কোন নাট্যকার স্পষ্টত প্রকাশ করলেও সংস্কৃতানুগ পদ্ধতির একাধিপত্যই এতকাল চলেছে। আসলে মধুসূদনের পূর্ববর্তী অন্য কোন নাট্যকারই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যরীতির নাটকের মধ্যেকার প্রকৃত পার্থক্যটি অনুধাবন করতে পারেন নি। মধুসূদনই প্রথম নাট্যকার যিনি নিঃসংশয়ে পাশ্চাত্যরীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ যে-য়ুরোপীয় সাহিত্যকে আত্মসাৎ করার মধ্যে তাঁর এই বিশ্বাসে কোথাও দ্বিধা ছিল না। কাব্যের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের অনুবর্তন করায় তিনি কোন বাধাই মানেন নি। নাট্যসাহিত্যের মুক্তিও যে ঐ একই পথে তা তিনি জানতেন। কিন্তু নানা কারণে দ্বিধাহীন চরণে তিনি চলা শুরু করতে পারেন নি। তাঁর প্রথম দুটি নাটক মূলত সংস্কৃত রীতিকে মেনে চলেছে। কবি নিজেও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। শর্মিষ্ঠা নাটক রচনাকালে তিনি গৌরদাসকে তাঁর নাটকের "foreign air"-য়ের কথা বলেছেন। কিন্তু এ নাটকে কবি বিদেশীয় ভাবসৌরভ কিছুমাত্র সঞ্চারিত করতে পারেন নি, আকণ্ঠ সংস্কৃত প্রভাবের মধ্যেই নিমজ্জিত থেকেছেন। এর কারণ কি?

প্রথমত, রঙ্গমঞ্চের প্রভাব।

দ্বিতীয়ত, মধুসূদনের শিল্পী-স্বভাব যথার্থ নাটকের (অর্থাৎ য়ুরোপীয় নাট্য-রীতি অনুগ) তুলনায় কবিত্বপ্রধান ও বর্ণনাবহুল সংস্কৃত নাটকের কাছে সহজে আত্মসমর্পণ করল।

দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতীতেও সংস্কৃত প্রভাবের মাত্রা কমে নি। কবি নিজে তা অন্তরে বুঝেছেন এবং আত্মদ্রোহী হতে চেয়েছেন। এ পথে তাঁর কবিপ্রাণ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে নি, অথচ রঙ্গমঞ্চের চাহিদার দিক থেকে অন্য ধরনের নাট্যরচনাও সম্ভব ছিল না। পদ্মাবতীতে তিনি বিদেশী গল্প গ্রহণ করে, নিজের মনের সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ একরূপ আত্মপ্রতারণা। কবি পাশ্চাত্ত্য কাহিনীকে সংস্কৃত রীতিতে উপস্থিত করেছেন, এ পথে সমস্যার সমাধান নেই তা তিনি জানতেন ; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য রীতিকে সোজাসুজি আমন্ত্রণ জানাতে পারেন নি।

প্রহসন দুটি রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রাচ্যরীতি পরিত্যাগ করলেন। ইংরেজী Comedy of manners-এর আদর্শ এখানে বলিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, এবং শৈল্পিক উৎকর্ষও এখানে এসেছে। কিন্তু লঘুরসের প্রহসনের নাটকীয়তা গম্ভীর রসের নাটক থেকে বহু দূরে।

য়ুরোপীয় রীতির নাটকের সঙ্গে ভারতীয় নাটকের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে কত সূক্ষ্ম ছিল তার প্রমাণ আছে কেশব গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে[১৬]। সেক্সপীয়রকে নাট্যজগতের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কৃষ্ণকুমারী নাটকে তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন, গম্ভীর রসের নাটকে পাশ্চাত্ত্যরীতি এর চেয়ে বেশি আত্মসাৎ গত শতাব্দীর অন্য কোন বাঙালি নাট্যকার করতে পারেন নি। এ নাটকে ইংরেজী নাট্যাদর্শ বাধা পেয়েছে দুটি জায়গায়।

প্রথমত, আমাদের জাতীয় জীবনধারায় প্রবৃত্তির সংঘর্ষজাত প্রকৃত নাট্যসম্ভাবনার কিছু অভাব রয়েছে। মধুসূদন নিজে তা লক্ষ্য করেছিলেন, এবং মুসলমানী বিষয় নিয়ে এ অভাব মেটাতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, মধুসূদনের প্রকৃতির মধ্যেই কবিস্বভাবের প্রাধান্য ছিল। ইংরেজী নাট্যরসাবেদনের পক্ষে এই গীতিরসের অনুপ্রবেশ হানিকর। কবি নিজে তা বুঝতেন এবং সে কারণেই কাব্যনাট্য রচনার প্রতি বারবার এত বেশি আগ্রহ তিনি দেখিয়েছেন।

মধুসূদনের নাটকে গ্রীক নাটকের প্রভাব খোঁজা অসঙ্গত নয়। গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল গভীর, এর প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল সুপ্রচুর। কিন্তু গ্রীক নাট্যকলা যথেষ্ট পুরাতন ও অচলিত বলে সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছে। তাঁর নাট্যবিষয়ক বহু সংখ্যক পত্রের মধ্যে কোথাও গ্রীক নাট্যধারা প্রসঙ্গে কোন-রূপ মন্তব্য করা হয় নি। তিনি সেক্‌সপীরিয় যুগের ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের প্রভাবকেই অনুসরণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। গ্রীক নাটকের সাধারণ প্রভাব মধুসূদনে নেই। তবে গ্রীক সাহিত্য ও জীবনদৃষ্টির প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা এবং সমর্থন ছিল নাটকে তার কিছু চিহ্ন পড়ে থাকবে; যেমন—

এক। পদ্মাবতী নাটকের কাহিনীটি তিনি গ্রীক পুরাণ-কথা থেকে সঙ্কলন করেছিলেন।

দুই। কৃষ্ণকুমারী নাটকে গ্রীক নাটক 'ইফিজিনিয়া ইন টরিসের' তথাকথিত ছায়াপাতের প্রসঙ্গ এ দিক দিয়ে উল্লেখ করা যায়।

তিন। কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজেডি-কল্পনায় গ্রীক-ভাবনার চিহ্নও সম্ভবত দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাঁর প্রহসনে এরিস্টফেনিসের কমেডির কিছুমাত্র প্রভাব নেই, অনুসরণ আছে ইংরেজী Comedy of manners-এর। এবং সামগ্রিক ভাবে কৃষ্ণকুমারী গ্রীক ট্রাজেডির নিকটবর্তী নয়, সেকস্‌পীরিয় ট্রাজেডির ধারায়ই রচিত।

॥ সাত ॥

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে এসে মধুসূদন অকস্মাৎ নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু আবাল্য কবি হিসেবে সাফল্য লাভেরই বাসনা তাঁর ছিল। মাদ্রাজ প্রবাসকালে তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্চার পাশাপাশি যে নাটকটি লিখছিলেন তা একটি কাব্যনাট্য।[১৭] কিন্তু বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি গদ্যে নাটক লিখলেন। অবশ্য শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীর গদ্যে কবিত্বের বাড়াবাড়ি পাঠকমাত্র লক্ষ্য করে থাকবেন। পদ্মাবতী নাটকে তিনি অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তাঁর কবিপ্রাণের জাগরণ ঘটল। অমিত্রাক্ষরে কাব্যরচনা করতে করতে তিনি একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে উচ্চবাক্‌ হয়ে উঠলেন। নাটকের সংলাপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে হওয়া উচিত। তাঁর পত্রাদিতে এই কথা বারবার বলেছেন এবং দর্শকদের কান অমিত্রাক্ষরে যথেষ্ট অভ্যস্ত নয় বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনায় হাত দেবার আগে তিনি 'সুভদ্রা' নাম দিয়ে একটি কাব্যনাট্যের

দুই অঙ্ক লিখে ফেলেছিলেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকটির সংলাপ অমিত্রাক্ষরে লিখবার বাসনা তাঁর ছিল, অন্তত এই নাটকের স্বগতোক্তি অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে পারলে তিনি খুশি হতেন।

নাটকের সংলাপ কবিতায় কিংবা গদ্যে হওয়া উচিত তা নানা পারিপার্শ্বিক বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু মধুসূদনের এই বিশিষ্ট প্রবণতার কারণটি দুরধিগম্য নয়। মধুসূদন মনের দিক থেকে মূলত কবি, নাট্যকার নন। কবির হাতে সাধারণ নাটক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, গীতিধর্মের আধিক্যে নাটক একাগ্র তীব্রতা, ঘটনাপ্রাধান্য ও সংঘর্ষপ্রাণতা থেকে চ্যুত হয়। কিন্তু কাব্যনাট্যে নাট্যরস ও কাব্যরসের সহজ মিলনের সুযোগ থাকে। বর্ণনার আধিক্যে ঘটনা-বহুলতা সেখানে আচ্ছন্ন, ঘটনাগত সংঘাত সেখানে ভাবাবেগগত সংঘর্ষের (conflict of emotions) স্তরে নীত। কাব্যিক উপলব্ধির সঙ্গে নাটকীয় বোধের এবং পরিবেশ সৃজনের মূল পার্থক্য আছে। শুধু ভাষাকে গদ্য থেকে কবিতায় বা কবিতা থেকে গদ্যে রূপান্তরিত করলেই এই পার্থক্যটি আয়ত্ত হয় না। মধুসূদন প্রহসন দুটি ছাড়া অন্য কোন নাটকের ক্ষেত্রেই মনের দিক থেকে স্বস্তি পান নি। তাঁর কল্পনার বিশিষ্টতা, তাঁর কবি-স্বভাব বারবার তাঁকে আকর্ষণ করেছে কবিত্বের রাজ্যে। সাধারণ ভাবে ঘটনা বিরলতার দিকে তাঁর মনের আকর্ষণ বলেই কৃষ্ণকুমারী কাহিনীকেও তাঁর মনে হয়েছে "barren of incidents"।[১৪] তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি মনের দিক থেকে মুক্ত ছিলেন না। সম্ভাবনা সত্ত্বেও কৃষ্ণকুমারী দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাল নাটক হয়ে থেকেছে, প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার সম্মান পায় নি।

॥ আট ॥

মধুসূদনের নাটকগুলির রচনাকাল তাঁর পত্রাবলী এবং অন্যান্য সাক্ষ্যাদি থেকে খুঁজে বের করা যেতে পারে। কাব্যগুলির রচনাকালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়ায়—

নাটক	রচনাকাল	প্রকাশ[২৩]	সমকালে রচিত কাব্য[২৪]
শর্মিষ্ঠা	১৮৫৮ সাল। ১৬ই জুলাইয়ের পূর্বে এটি সম্পূর্ণ না	জানুয়ারী ১৮৫৯	

	হলেও বেশির ভাগ রচিত হয়েছিল।[১৯]		
পদ্মাবতী	১৮৫৯ সাল। মার্চ মাসে আরম্ভ হয়। মে মাসের পরে কোন সময়ে শেষ হয়।[২০]	এপ্রিল (?) ১৮৬০	
একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ	১৮৫৯ সাল। ৮ই মের পরে লেখা আরম্ভ এবং অল্প কালের মধ্যে শেষ হয়।[২১]	১৮৬০-এর প্রথম ভাগ	তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ১৮৫৯ সালের জুলাইয়ের পূর্বে শুরু এবং ১৮৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বে শেষ হয়। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৮৬০ সালের এপ্রিলের পূর্বে সমাপ্ত।
কৃষ্ণকুমারী	১৮৬০ সাল। ৬ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর।[২২]	১৮৬১-এর শেষভাগ	মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিলের পূর্বে আরম্ভ, ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পরে অল্প-কালের মধ্যে শেষ হয়।

			বীরাঙ্গনাকাব্য ১৮৬২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর পূর্বে সমাপ্ত।
			চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১৮৬৫ সালের জানুয়ারীর পূর্বে আরম্ভ, কয়েক মাসের মধ্যেই সমাপ্ত।
মায়াকানন	১৮৭৩ সাল	১৮৭৪ সাল। (কবির মৃত্যুর পরে)	

কোন গ্রন্থের প্রকাশকালের তুলনায় তার রচনাকালের সন্ধান জানা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রহসন দুখানির পূর্বে কবি পদ্মাবতীর অন্তত চার অঙ্ক সমাপ্ত করেছিলেন, এ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রহসন দুটি নাটকীয় গুণে পদ্মাবতীর চাইতে অনেক পুষ্ট। কিন্তু প্রকাশ কালের হিসেবে বিভ্রান্তি জন্মাতে পারে। প্রহসন দুটির পরে পদ্মাবতী প্রকাশিত হয়। কিন্তু অত পরিণত প্রহসন রচনার পরে এজাতীয় পরীক্ষামূলক নাটক লেখা কি করে সম্ভব ভেবে পাওয়া কঠিন। রচনাকালের হিসেব সমালোচককে সে সমস্যা থেকে মুক্ত করে।

১৮৫৮ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে ১৮৬০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মধুসূদনের নিয়মিত নাট্যরচনার পর্ব। এর মধ্যে অবশ্য কৃষ্ণকুমারী রচনার পূর্বে প্রায় সম্পূর্ণ এক বছর তিনি কোন নাটক রচনা করেন নি। এর কারণ অনুধাবনযোগ্য। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং প্রহসন দুটিতে পরের পর কবির নাট্যরচনার ক্রমপরিণতি এসেছে, ক্রমে অধিকতর সাহস সঞ্চয় করেছেন কবি। কিন্তু তারপরেই পরিণত ক্ষমতা নিয়ে তিনি একবছর চুপ করে বসে রইলেন কেন? এর একাধিক কারণ থাকা সম্ভব—

এক। পাইকপাড়ার রাজাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি প্রহসন দুটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই দুটি অভিনীত হয় নি। এ ঘটনা তাঁর

স্পর্শকাতর চিত্তকে বিদ্ধ করেছিল। নাটক লেখা থেকে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হবার এটি অন্যতম কারণ হতে পারে।

দুই। পদ্মাবতী রচনাকালে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করে যেন নিজের অন্তরের কবিব্যক্তিত্বকে স্বরূপে চিনে নিলেন। নবছন্দ আবিষ্কারের নেশায় তিনি কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করে নাটকের কথা কিছুকালের জন্য ভুলে রইলেন। মধুসূদন মূলত কবিপ্রাণ—এ সত্য কিছুতেই ভোলা চলে না। কাব্যচেতনার মূলে যে ছন্দবোধ তরঙ্গিত তার উৎসটি খুলে যেতেই কবি সেই স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাইলেন। যে পর্যন্ত না কাব্যরাজ্য অধিকারে এল নূতন নাটক রচনার কথা আর ভাবলেন না।

মধুসূদনের নাটকগুলির মধ্যে প্রথম দুটি সংস্কৃত আদর্শে, কবির ভাষায় "classical model"-এ লেখা। নাটকীয় অপরিণতি, পরীক্ষা-প্রস্তুতি এবং কৌতূহলসৃষ্টিই এদের প্রধান আকর্ষণ। শর্মিষ্ঠায় প্রাচ্যরীতির বন্ধনে কবি ক্লিষ্ট, মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন মাত্র, সামান্যও করায়ত্ত করতে পারেন নি। পদ্মাবতীতে বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে পাশ্চাত্ত্য ভাবজগতে বিচরণের ভঙ্গিমাত্র করেছেন, আত্মপ্রতারণা করেছেন। প্রাচ্যভূমিতে কিন্তু তাঁর পদস্থাপনা থেকেছে অবিচল।

পদ্মাবতী লিখতে লিখতে মাঝখানে প্রহসন রচনা করতে গিয়ে হঠাৎ সংস্কৃত-সীমিত প্রাচ্যরীতির বন্ধন উন্মোচিত হল। একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ খুব স্বল্পকালের জন্য হলেও কবিকে তাঁর সমগ্র নাট্যসত্তা ধরে নাড়া দিল। এর মধ্যে আবার দ্বিতীয়টিতে নাট্যোৎকর্ষ খুবই উচ্চস্তরে উঠেছিল। প্রথমটির দুর্বলতা তিনি দ্বিতীয়টিতে কাটিয়ে উঠেছিলেন। কবিচিত্তের একপ্রান্তে নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টির যে বীজটি বর্তমান ছিল, যাকে আমি অন্যত্র absolute vision নামে অভিহিত করেছি তার সক্রিয়তা এই সাফল্যের ভিত্তি নির্মাণ করেছে।[২৫] কিন্তু এরাজ্যও সম্পূর্ণত কবির স্বরাজ্য নয়, যে রাজ্যের তিনি একচ্ছত্র সম্রাট।

পদ্মাবতীর অমিত্রাক্ষর ছন্দ কবিকে সেই রাজ্যে পৌঁছে দিল। কবি মধুসূদন নানা কারণে নাট্যকারের জীবন কাটিয়েছেন, নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এবারে তিনি কাব্যচর্চায় মেতে উঠলেন। কবিতার ভাষা এতকাল প্রকাশের স্থান পায় নি, নাটকের মধ্যে তাই অনধিকার প্রবেশ করেছে। এর পরে কাব্য জগতে মহৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তিনি যখন

নাটক লিখতে গেলেন তখন তা হল বাংলার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির নাট্যরচনায় নূতন করে পদার্পণ। প্রহসন দুটি যে নাটকীয় মুক্তি তাঁকে দিয়েছিল—প্রাচ্যরীতির বন্ধন থেকে পাশ্চাত্ত্য রীতির চর্চায়, সেই পথেই তিনি চলতে চাইলেন। 'রিজিয়া' নাটক লিখবার পরিকল্পনায় পাশ্চাত্ত্য ধরনের প্রবৃত্তিসংক্ষুব্ধ ঘটনাবহুল ও সংঘর্ষতরঙ্গিত নাট্যরচনার বাসনা কাজ করেছিল। কিন্তু কবি-নাট্যকারের দুর্ভাগ্য তিনি সমর্থক পান নি। তবে কবি মধুসূদন সাধারণ গদ্যনাটক লিখে যে তৃপ্ত নন তা মনেপ্রাণে অনুভব করতে লাগলেন এবার। কাব্যনাটক লিখতে চাইলেন, অন্তত পক্ষে পূর্ণাঙ্গ মঞ্চনাটকের সংলাপে কবিতার ব্যবহার করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণকুমারী নাটক লিখবার আগে তিনি 'সুভদ্রা' নামে এক কাব্যনাট্যের দুই অঙ্ক লিখে ফেলেছিলেন, মঞ্চপ্রধানদের উৎসাহ না পেয়ে তাঁকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপে কবিতা ব্যবহারের ইচ্ছাও তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল ঐ একই কারণে।

কৃষ্ণকুমারীর রচয়িতা আত্মসচেতন কাব্য-প্রাণ নাট্যকার। মেঘনাদবধ রচনা করতে করতে তিনি কৃষ্ণকুমারী লিখেছিলেন। মেঘনাদবধকাব্যে জীবন-বোধের যে তীব্র তীক্ষ্ণতা ও গভীর ট্রাজিক আর্তনাদ ধ্বনিত কৃষ্ণকুমারীতে সামান্যত হলেও তার প্রতিফলন শ্রুত হয়েছে। একই কালে কবির মনের তার একই সুরে কাঁপছিল।

কবির শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক নিয়মিত নাট্যসাধনার তেরো বছর পরে এবং নিয়মিত সাহিত্যসাধনা শেষ করার আট বছর পরে রচিত। কবি তখন রোগজীর্ণ, মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে জীবন বিষয়ে হতাশ্বাস। তাঁর সাহিত্যজীবনের বিকাশের ধারায় এ নাটকের স্থান নয়, তাঁর জীবন-সমাপ্তির অনুভূতি প্রতিফলনের দিক থেকে এ রচনাটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে।

[১]এই তালিকাটি তৈরী করার ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' দেবকুমার বসু সঙ্কলিত 'বাংলা নাটক' এবং সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ডের সহায়তা গ্রহণ করেছি। ১৭৯৫ সালে লেবেডফ যে দুটি নাটকের অনুবাদ তাঁর থিয়েটারে অভিনীত করান বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম নাটক সেই দুটি। তা পাওয়া যায় নি।

[২]সুকুমার সেন মহাশয় 'আত্মতত্ত্বকৌমুদীকে' প্রথম বাংলা নাটক বলে মানতে রাজী হন নি। একটি সংস্কৃত নাটকের গদ্যানুবাদ বলে তিনি একে অভিহিত করেছেন। এই গ্রন্থ র একখণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি ঠিক, না সুকুমার সেনের প্রতিবাদ তা নির্ণয় করার জন্য আসল গ্রন্থটির সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন। তবে সমকালীন পত্রিকার আলোচনা দেখে এটিকে নাটক বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

[৩]'হাস্যার্ণবে'র লেখকের নাম পাওয়া যায় নি। লং সাহেবের গ্রন্থতালিকা এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় এর উল্লেখ আছে।

[৪]'কৌতুকসর্বস্ব নাটক' মূল সংস্কৃতের আংশিক বঙ্গানুবাদ। বৃটিশ মিউজিয়ামের পুস্তক তালিকায়, লং সাহেবের পুস্তক তালিকায় এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই রচনার উল্লেখ আছে।

[৫]১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকটি প্রকাশিত হয় নি। এটি যাত্রা পালা না নাটক—কোন্ আদর্শে রচিত ছিল বলা কঠিন। ১৮৪০ সালে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে'র বঙ্গানুবাদ করেন। কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট কালসীমার বহু পরে তা প্রকাশিত হয়।

[৬]হরচন্দ্র ঘোষের অপর দুটি নাটক "চারুমুখ-চিত্তহারা' (সেকস্‌পীয়রের রোমিও জুলিয়েটের স্বাধীন বঙ্গানুবাদ) এবং 'রজতগিরিনন্দিনী'।

[৭]বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি 'নবনাটক' নামে একটি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছিলেন।

[৮]বাংলা নাট্যশালা সম্পর্কিত তথ্যাদির ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি। বিশ্লেষণ অংশের দায়িত্ব আমার।

[৯]বাঙালিদের স্কুল কলেজে ইংরেজী নাটকের যে সব অভিনয় হয় তা কিছু পরবর্তীকালের ঘটনা।

[১০]এ তালিকা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের সহায়তায় প্রস্তুত।

[১১]'Reminiscences of Michael M. S. Dutta.' যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত"-এর পরিশিষ্টে সংকলিত।

[১২]কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্রের অংশ, " Baboo Jotindra thinks, and the Raja seems to participate in the opinion, that

Mahomedan names will not perhaps hear well in a Bengalee Drama, and they doubt whether an experiment of doubtful success is worth being hazarded by the author of শর্মিষ্ঠা and তিলোত্তমা।" মধুসূদন উত্তরে বলেছিলেন, "The prejudice against Moslem names must be given up." কিন্তু এ নাটক রচনায় অগ্রসর হন নি। অভিনীত না হলে নাটক লিখে কি লাভ—এ কথা তিনি বারবার বলেছেন।

[১৩]অল্প কিছু পূর্বে নাটকটির আরও দুটি অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু তার তারিখ পাওয়া যায় নি।

[১৪]জোড়াসাঁকো থিয়েটারে কৃষ্ণকুমারীর যে অভিনয় হয় বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন তার যথার্থ তারিখ তিনি নির্দেশ করতে পারেন নি। আমরা এখানে যে তারিখের উল্লেখ করেছি তার আগে উক্ত অভিনয় ঘটেছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় দেওয়া তারিখে ভুল থাকলেও শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটিতেই যে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল এই মন্তব্য মূল্যবান।

[১৫]গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় এই অভিনয়ের তারিখ দেন ১৮৭৩ সালের ১৬ই আগষ্ট। কিন্তু সমকালীন পত্রপত্রিকার সাক্ষ্য নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তারিখ দিয়েছেন তাইই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। তারিখের ব্যাপারে মানুষের স্মৃতি ভুল করতে পারে কিন্তু সমকালীন পত্রপত্রিকা ভুল করবে না।

[১৬]আমার "কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী"তে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

[১৭]"Rizia the Empress of Ind, a dramatic poem."

[১৮]অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল তাঁর "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা" গ্রন্থে অভিযোগ করেছেন যে কৃষ্ণকুমারী নাটকের ঘটনাবিরলতা মধুসূদনের নিজের সৃষ্টি, টডের কাহিনী এতটা ঘটনা বিরল ছিল না। আসলে মধুসূদনের কবিস্বভাব ঘটনাবহুল কাহিনী থেকে প্লট তৈরী করতে গিয়ে তাকে ঘটনা-বিরল করে ফেলেছে।

[১৯]যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই নাটক প্রসঙ্গে গৌরদাসকে ১৬ই জুলাই ১৮৫৮ সালে লেখেন "I am very anxious to have a perusal of your

friends' manuscript drama"···নাটকটি সম্পূর্ণভাবে, অন্তত অনেকাংশে তখন লেখা হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়।

[২০]১৮৫৯ সালের ১৯ই মার্চ তারিখে গৌরদাসকে লেখা কবির চিঠি এর সাক্ষ্য।

[২১]কবির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ৮ই মের চিঠিতে অনুরোধ, "I am thinking of some domestic farces to follow immediately after first the representation of the Shermistha and before it is repeated, just to show the public that we can act sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors." মনে হয় অনুরোধের পরেই কবির প্রহসন দুটির রচনা শুরু হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই শেষ হয়।

[২২]কবির পত্রাংশ—"Begun 6th August, finished 7th September rather quick work, old fellow."

[২৩]প্রকাশকাল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সাহিত্যসাধক-চরিতমালা" থেকে গৃহীত।

[২৪]কাব্যগুলির রচনাকাল কবির নিজের লেখা চিঠি এবং অন্যান্য সাক্ষ্যের সাহায্যে স্থির করা হয়েছে।

[২৫]আমার "মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্পে" এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শর্মিষ্ঠা

ইতিহাস-বিজয়

॥ এক ॥

ভাল ইংরেজী জানতেন বলে মধুসূদনের উপরে রামনারায়ণ-অনূদিত শ্রীহর্ষ-প্রণীত 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ করবার ভার দেওয়া হয়েছিল। অনুবাদ করতে করতেই এই নাটকের অকিঞ্চিৎকরতা বিষয়ে বন্ধু গৌরদাসের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

"The first act in the original is a very common place affair and the translation, I fear, is no better."

পাইকপাড়ার রাজারা বহু অর্থব্যয় করে নাটকটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মধুসূদন তা দেখে একদিন বন্ধু গৌরদাস বসাককে বললেন,

"দেখ, কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।' গৌরদাস বাবু শুনিয়া বলিলেন, 'নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায়?... ভাল নাটক বাংলা ভাষায় কোথায়?' মধুসূদন বলিলেন, 'ভাল' নাটক? আচ্ছা আমি রচনা করিব।"[১]

—[মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু।]

মধুসূদনের এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞাকে সেদিন বন্ধুমহলে নির্দোষ আত্মম্ভরিতা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু মধুসূদন সত্যই একটি নাটক লিখে ফেললেন। সংস্কৃতনবীস পণ্ডিতের দল ব্যঙ্গ করে বললেন,

"সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই; কাটকুট করিলে রচনাটি সমুদয় নষ্ট হইবে, আমার ইহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা নাই।"

তখনকার দিনের প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার রামনারায়ণের কাছে পাণ্ডুলিপির কতকাংশ ব্যাকরণশুদ্ধির জন্য পাঠান হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত রামনারায়ণ সংলাপের ভাষা পর্যন্ত বদল করে দিলেন।[২] পুরাতন সংস্কৃত-পন্থী সম্প্রদায় মধুসূদনের এই নাটকটিকে একরূপ নাকচ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু নব্য সম্প্রদায় নাটকটিকে বরণ করে নিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র

'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই নাটকটির প্রশংসা করে লেখেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন, সন্দেহ নাই।"

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং পাইকপাড়ার ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে মধুসূদনের কাছে উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ পত্র পাঠালেন। নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের ব্যবস্থা চলতে লাগল, রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনের কাছে পত্রে নাটকটির সমালোচনা করলেন।[৩] তাছাড়া নাটকটি অভিনীত হবার পরে চারদিক থেকে উচ্চ প্রশংসাবাণী বর্ষিত হতে লাগল।

মধুসূদন বাংলা নাট্যসাহিত্যের জগতে আকস্মিকভাবে বীরবেশে প্রবেশ করলেন এবং সে জগতে বিজয়পতাকা ওড়ালেন।

শর্মিষ্ঠা রচনার ভিত্তিতে ইতিহাসকে জয় করবার জন্য যে মুখ্য প্রেরণা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে মধুসূদনের তাঁর নিজস্ব ভূমি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। আবাল্য বিখ্যাত হবার বাসনা তিনি পোষণ করেছেন, চেষ্টাও যে করেন নি তা নয়। মাদ্রাজে প্রবাসকালেও ইংরেজী কাব্যচর্চার মাধ্যমে অমর হতে তিনি চেয়েছিলেন। নিজের পথ পরিত্যাগ করে ভিন্নতর কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান নি। এই নাটক বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রেরণা জাত না হলেও এর পিছনকার বিজীগিষা বৃত্তির সঙ্গে সাহিত্যিক মেজাজের সংযোগ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে শর্মিষ্ঠার মূল্য যতটা ঐতিহাসিক ততটা সাহিত্যিক নয়। নাট্যসাহিত্য হিসেবে যুগোত্তীর্ণ হবার উপকরণ এর মধ্যে নেই। সমকালীন সমালোচকদের প্রশংসাবাণীতে ইতিহাসের উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে, রসিকের বিচার সেখানে আবৃত। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের এক মুখ্য প্রতিভার আবরণ মোচনের পরিচয় এখানে মিলবে। অবশ্য 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' রচনাকালেও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসঙ্গে কিছু অভাবনীয় উচ্চকণ্ঠ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। জয়লাভের বাসনা থেকে জন্ম নিলেও এই কাব্য কবির অন্তরতর সত্তাকে অন্তত একটি মুখ্য বিন্দুতে স্পর্শ করেছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিচিত্ত মুক্তির প্রকৃত দরজা খুঁজে পেয়েছিল। তাই জিগিষাবৃত্তির তৃপ্তি সাধনে এ কাব্যের জন্ম হলেও বৃহত্তর কিছুর স্পর্শ এর সঙ্গে কোথাও কোথাও লেগেছে।

শর্মিষ্ঠা নাটকে কবি শুধুই জয়কামী-সাহিত্য গবেষণাগারের এক অনুসন্ধিৎসু নব্য পথিক। কোন গভীরতর সাহিত্যিক জিজ্ঞাসা এ নাটকের কোথাও প্রকাশিত নয়, এর সাফল্যের সীমা তাই সমকালের স্তুতিবাচনে আবদ্ধ।

॥ দুই ॥

মধুসূদনের জীবনীকার বলেছেন যে নূতন নাটক লিখবার প্রতিজ্ঞা করে তিনি কতকগুলি বাংলা গ্রন্থ ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন।

> "The next morning he called on me at the rooms of the Asiatic society for thc loan of a few vernacular and sanskrit books dramas, specially..." —[G. D. Bysack]

কি কি বই মধুসূদন পড়েছিলেন জানা যায় না। তবে প্রচলিত দু-চার খানা নাটক তিনি পড়ে থাকবেন। সেই নাটকগুলির প্রতি মধুসূদনের কবিপ্রাণ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছিল এমন মনে হয় না। তবে প্রচলিত বাংলা নাটকের বহিরঙ্গ আকারটি বুঝে নেবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। বাংলা গদ্য-গ্রন্থও কয়েকটি তিনি পড়েছিলেন বলে মনে হয়। সাহিত্যিক গদ্যের প্রকৃতি বুঝে নেবার জন্য এটি প্রয়োজনীয় ছিল। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে প্রধানত কালিদাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। রত্নাবলী অনুবাদ করতে গিয়েও মূল সংস্কৃতের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে সমকালীন বাংলা নাটকের প্রধান আদর্শ ছিল সংস্কৃত নাটক। সেই কারণেই সংস্কৃত নাটকের কিছু ঘনিষ্ঠতর পরিচিতি পেতে তিনি চেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর মনোগত বাসনা ছিল অন্যরূপ। ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের রসাবেশ পাঠকচিত্তে তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠা প্রসঙ্গেই তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন,

> "I am aware, my dear fellow, that there will in all likelihood; be something of a foreign air about my Drama ;····· Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration for everything Sanskrit."

মধুসূদনের সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রভাবকে তিনি কঠিন ভাষায় নিন্দা করেছেন, তাঁর নাটকে ইংরেজী ভাব-ভাবনার স্পর্শ আছে এমন দাবীও করেছেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃত নাট্যরীতির বাঁধা পথেই তাঁকে চলতে হয়েছে।

মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রমুখ তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটককে সংস্কৃত-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে মনে করেছেন। বহিরঙ্গের দিক থেকে সংস্কৃত-রীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আছে।

এক। সংস্কৃত নাটক কয়েকটি অঙ্কে বিভক্ত থাকে। অঙ্কগুলি গর্ভাঙ্কে বা দৃশ্যে বিভক্ত থাকে না; মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক পাঁচটি অঙ্কে এবং সর্বসমেত তেরটি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। এটি ইংরেজী নাটকের গঠনরীতিসম্মত।

দুই। সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভে নান্দী এবং নটী, সূত্রধরের অভিনয় থাকে। মধুসূদন তা পরিত্যাগ করেছিলেন।

তিন। সংস্কৃত নাটকে দুটি অঙ্কের মধ্যভাগে বিষ্কম্ভক, প্রবেশক প্রভৃতি অন্তর্দৃশ্যের আয়োজন করার বিধি আছে। নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী যে সব পরিস্থিতি রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখানো নিষিদ্ধ তার বিবরণ দানের উদ্দেশ্যে এরূপ অন্তর্দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়। A B. Keith তাঁর গ্রন্থে বলেছেন,—

> "To reveal to the audience the events during such intervals, the theory permits a choice of five forms of introduction (অর্থোপক্ষেপক), which serve also to narrate things, whose performance on the stage is forbidden by the etiquette of the drama. Two of these are the viskambha or viskambhaka and the pravesaka, which are both explanatory scenes……"
>
> —[The Sanskrit Drama.]

এ জাতীয় কোন দৃশ্য-পরিকল্পনা মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকে নেই।

চার। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ মধুসূদনের রচনায় 'দুঃশ্রবত্ব', 'চ্যুত-সংস্কারত্ব', 'নিহিতার্থত্ব' এবং 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' প্রভৃতি নানাবিধ অলংকারশাস্ত্রোক্ত দোষ নির্দেশ করলেন।[৪]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শর্মিষ্ঠায় মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব কতটা অতিক্রম করতে পেরেছেন তা ভাববার মত। মধুসূদনের জীবনীকার শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটক রচনার কালকে প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাবকাল বলে বর্ণনা

করেছেন। যতই তিনি ইংরেজী নাট্যরস পরিবেশনের কথা বলুন তাঁর চিঠিপত্রে, যতই তিনি নিন্দা করুন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের, তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটকে সংস্কৃতরীতির প্রভাবের মধ্যেই তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেছিলেন, ইংরেজী নাট্যকলার সুখস্বপ্ন দেখছিলেন মাত্র।

শর্মিষ্ঠা নাটকে রত্নাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব নানা দিক থেকে। সে বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন,

"বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্যই শর্মিষ্ঠার উৎপত্তি। সেই একই রঙ্গমঞ্চ, সেই সকল অভিনেতা, সেই সমস্ত বেশভূষা। সুতরাং মধুসূদনকে স্বতঃই সে সকলের উপযোগী একখানি নাটক রচনার বিষয় চিন্তা করিতে হইয়াছিল। ইহার উপর বারম্বার রত্নাবলীর অভিনয় দর্শন করাতে তাহার ভাব তাঁহার হৃদয়ে এরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল [illegible]তেই তিনি তাহা অপসারিত করিতে পারেন নাই। কোন একখানি গ্রন্থ জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে পরবর্তীর লেখকদিগকে প্রায়ই তাহা আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হয়। রত্নাবলী সাধারণের নিকট বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়াছিল। নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপর মধুসূদন তখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে, কিয়ৎপরিমাণে রত্নাবলীকেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থে, সেইজন্য, ভাবগত এবং কোন কোন স্থলে ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। উভয় গ্রন্থেই দুই জন নায়িকা; জ্যেষ্ঠা-অভিমানিনী ও কোপনা, কনিষ্ঠা অভিমানশূন্যা ও মুগ্ধস্বভাবা; রূপগুণে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার নিকট পরাভূতা। উভয় গ্রন্থেই কনিষ্ঠা কিছু দিনের জন্য জ্যেষ্ঠার দাসী; কিন্তু পরিণামে কনিষ্ঠারই জয়। উভয় গ্রন্থেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজার রূপে উভয় গ্রন্থের নায়িকাই সমান মুগ্ধা। যতদিন কনিষ্ঠাকে না দেখিয়াছিলেন ততদিন উভয় গ্রন্থের নায়কই জ্যেষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত; কিন্তু কনিষ্ঠাকে দেখিবামাত্র উভয়েরই প্রেম শরতের মেঘের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।"

মধুসূদন যখন রত্নাবলী অনুবাদ করছিলেন তখন একাধিক পত্রে তিনি নাটকটির অকিঞ্চিৎকরতার কথা বলেছেন। গৌরদাসের সঙ্গে আলোচনা কালেও তিনি এই নাটকটি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যথেষ্ট স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে বলেছিলেন। পূর্বেই সে কথার উল্লেখ করেছি। রত্নাবলীর অনুকরণে অপর

একখানি নাটক রচনার বাসনা তাঁর কিছুমাত্র ছিল না এরূপ বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তবুও রত্নাবলীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার যে সাদৃশ্য আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। অপর আদর্শের অভাবে রত্নাবলী আদর্শরূপে গ্রহণ করাই এর কারণ বলে যোগীন্দ্রনাথ বসু মনে করেছেন। কিন্তু মধুসূদনের মনের সমকালীন গতির বিষয়ে খেয়াল রাখলে অন্য কারণের অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে।

প্রথমত, শুধুমাত্র রত্নাবলীর নয়, অন্তত চারখানি খ্যাতনামা সংস্কৃত নাটকের কাহিনীভঙ্গি একেবারে একরূপ—শর্মিষ্ঠার পূর্বসূরী হিসেবে তাদের যে কোনটিকে ধরে নিলে আপত্তি করা কঠিন হবে। স্বয়ং কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' এবং 'বিক্রমোর্বশী' নাটক দুটি বিবাহিত নৃপতির অপর রমণীর প্রতি প্রেম এবং তার ফলে জাত ত্রিভুজ প্রণয়সমস্যা নিয়ে রচিত। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' ছাড়াও 'প্রিয়দর্শিকা' ঐ একই জাতীয় কাহিনী অনুসরণ করেছে। কালিদাসের নাট্যরচনার প্রতি কবির শ্রদ্ধা ছিল। রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন কালিদাসের গ্রন্থাদি পড়বার মত সংস্কৃত তিনি জানেন, এবং তাই-ই যথেষ্ট মনে করেন। ক্লাসিকাল যুগের অন্যান্য কবি ও নাট্যকারদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা উচ্চ ছিল না। গৌরদাসের সঙ্গে আলোচনার পরে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তিনি যে সব সংস্কৃত নাটক আনিয়েছিলেন তার মধ্যে কালিদাসের নাটক তিনখানা অবশ্যই ছিল। তাই রত্নাবলীকে তিনি আদর্শ ধরে এগিয়েছিলেন এ কথা মেনে নেবার কারণ নেই। এই জাতীয় ত্রিভুজ প্রেমসমস্যা, প্রণয় ব্যাপারে নায়কের অস্থিরচিত্ততা, দুই নায়িকার চরিত্রদ্বৈধ প্রভৃতি তিনি বিশেষভাবে রত্নাবলী থেকে গ্রহণ করেন নি, ঐ বিশেষ ধারার নাট্যাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রহণ করেছেন। কালিদাসের পূর্বোক্ত নাটকদ্বয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব কাহিনী-কল্পনার উপরে পড়েছে এরূপ বিশ্বাস করাই সঙ্গত।

দ্বিতীয়ত, রত্নাবলীকে আদর্শরূপে গ্রহণ না করলেও কবি তাকে এড়াতে পারেন নি। রত্নাবলীকে তিনি অস্বীকার করলেও অচেতন ভাবেই (বারংবার পাঠ এবং অভিনয় দর্শনের ফলে) এই নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এরূপ সিদ্ধান্তও করব না। তিনি সচেতন ভাবেই রত্নাবলীকে এড়িয়ে চলতে পারেন নি। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্যের প্রথম দিকে যা বলা হয়েছে তা খুবই তাৎপর্যবহ। রত্নাবলী নাটক হিসেবে তুচ্ছ হলেও বিপুল মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল। সেই সাফল্যের অন্যতম সাক্ষী ছিলেন কবি

নিজে। অনুরূপ সাফল্যের লোভ কবিকে আকর্ষণ করে থাকবে। তা ছাড়া বেলগাছিয়া নাট্যালয়ের অভিনেতৃবর্গ যে যে ধরনের চরিত্রাভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন রত্নাবলীতে, নূতন নাটকে তাঁদের জন্য প্রায় অনুরূপ সুযোগ দানের কথা কবিকে মনে রাখতে হয়েছে। উভয় নাটকের ভূমিকালিপির প্রধান অংশের তুলনা করলেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে। রত্নাবলীতে নায়ক রাজা উদয়নের ভূমিকাভিনয় করেছিলেন প্রিয়নাথ দত্ত, শর্মিষ্ঠায় নায়ক রাজা যযাতির ভূমিকায়ও তাঁকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। কেশব গঙ্গোপাধ্যায় উভয় নাটকেই বিদূষকের অংশ অভিনয় করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ উভয় ক্ষেত্রেই সেনাপতির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে সাগরিকার ভূমিকাভিনয় করেছিলেন হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাঁকে শর্মিষ্ঠার ভূমিকা দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অধিকতর কোমলতা ও লালিত্যের অধিকারী নূতন এক অভিনেতাকে (কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়[৫]) পেয়ে শর্মিষ্ঠার চরিত্রটি তাঁকে দেওয়া হল, হেমচন্দ্র দেবযানীর ভূমিকাটি নিলেন। সেকালের নাটকের পক্ষে নাট্যাভিনয়ের উপযুক্ত সুযোগ লাভ একপ্রকার অসম্ভব ছিল। মঞ্চাভিনয় ভিন্ন মাত্র মুদ্রণ নাটকের লক্ষ্য হতে পারে না বলে মধুসূদন দৃঢ় মত পোষণ করতেন; আপন নাট্যরচনাগুলিকে মঞ্চস্থ দেখবার বাসনা তাঁর অতি প্রবল ছিল, (উল্লেখযোগ্য বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য পরবর্তী কালে আরও নাটক এবং দুখানি প্রহসন রচনা করলেও তার একটিও অভিনয়ের সুযোগ পায় নি) তাঁর পক্ষে রত্নাবলী অভিনয়কারীদের মানস প্রস্তুতিকে বিচলিত করার সাহস অপ্রত্যাশিত ছিল। রঙ্গমঞ্চের জালে বন্দী মধুসূদন যে রত্নাবলীকে তুচ্ছ বলে নিন্দা করেছেন তাকেই স্থানে স্থানে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভবে কবি বিদ্রোহ করেছেন, অপরিণত সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার অভাব সম্পূর্ণ সাফল্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত রেখেছে। প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠায় কবি বিদ্রোহ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সাহসী হন নি; মাথা নুইয়ে সন্ধি করে চলতে হয় যে পথে তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট স্বরূপ সেখানে আদৌ স্ফূর্তি পেতে পারে না; তার ক্লিষ্টতা তাই ঘোচে নি শর্মিষ্ঠায়।

•

পূর্বোক্ত কারণেই কবি সংস্কৃতরীতির অন্যথা করতে সর্বত্র সাহসী হন নি, প্রস্তাবনায় সঙ্গীত দিয়ে নাটকের সূত্রপাত করেছেন,—

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।

শুন গো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাও তুমি
আর নিদ্রা উচিত না নয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগ মাগো, বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয়নিচয়॥

উপসংহার গীতিটি সংস্কৃতরীতি অনুসারেই সংযোজিত—

শুন হে সভাজন!
আমি অভাজন,
দীন ক্ষীণ জ্ঞানগুণে,
ভয় হয় দেখে শুনে
পাছে কপাল বিগুণে
হারাই পূর্ব মূলধন!
যদি অনুরাগ পাই,
আনন্দের সীমা নাই,
এ কাজেতে এ কথাই
দিব দরশন।

অথচ ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার ভদ্রার্জুনে প্রস্তাবনা ও উপসংহার গীতি বর্জন করেছেন. সচেতনভাবে ভূমিকায় সে বিষয়ের উল্লেখও করেছেন। এবং ইংরেজী নাট্যরীতির বোধ বা সেদিকে আকর্ষণ—কোন বিষয়েই মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর তুলনামাত্র চলে না। তারাচরণ যা পেরেছিলেন, মধুসূদন তা কেন পারলেন না? রত্নাবলীর সফল অভিনয়ে উল্লসিত রঙ্গমঞ্চের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল তাঁকে। সর্বত্র সংস্কৃতরীতি বর্জন তাই সম্ভব ছিল না। পরবর্তী সংস্করণে অবশ্য এই গান দুটি পরিত্যক্ত হয়।

মধুসূদন নাট্যকাহিনীতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষকে এবং ঘটনাগত উত্তালতাকে

প্রায়ই পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। ঘটনা পূর্বে ঘটে গিয়েছে, পাঠক-দর্শককে তার নিস্তরঙ্গ বিবরণেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, পূর্ববর্তী ঘটনার মানস-প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ উচ্ছ্বাসই নাট্যদেহ জুড়ে অবস্থান করেছে। উপস্থাপনার এই নিস্তরঙ্গ ভঙ্গিটি নাটকের গতিকে একান্ত মন্থর করে দিয়েছে। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য থেকে কবি এই মন্থরতা, তরঙ্গহীনতা, সংঘর্ষ ও ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে যাবার মনোভাবটি গ্রহণ করেছেন।[৬]

বিদূষক চরিত্রও অপরিহার্যভাবে প্রতি সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকত। রাজার বয়স্য এই ব্রাহ্মণ নিজের ভোজনলোলুপতা নিয়ে কিছু স্থূল হাস্যরস বিতরণ করত; রাজার গুপ্ত প্রণয় বিষয়েও এরাই থাকত একমাত্র সাক্ষ্য, তবে মূল নাট্যকাহিনীর বিবর্তনে, সমস্যার জটিলতাবিধান বা সমাধানে কোন সক্রিয় ভূমিকা এদের থাকত না। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকে বিদূষকের ভূমিকাটি একান্তভাবেই সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ। সম্পূর্ণত সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে এই চরিত্রটির পরিকল্পনা কবি করেছেন; এমন কি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বিদূষকের নামে এর নাম রেখেছেন মাধব্য।

শর্মিষ্ঠার সংলাপরীতিতেও সংস্কৃত নাটকের প্রবল প্রভাব পড়েছে। ভাষা-রীতির সংস্কৃতানুকারীতা ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্যধর্ম ও উপমাদির অতিচাপ, অকারণ দৈর্ঘ্য, দীর্ঘ স্বগতোক্তির বাহুল্যে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। একটি ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃতরীতিতে গদ্য-পদ্য সংলাপও ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অপরিচিতা শর্মিষ্ঠার প্রতি আপন চিত্তের আকর্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে যযাতি গদ্য সংলাপের মধ্যে হঠাৎ একটি শ্লোক আবৃত্তি করেছেন—

> সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জন কাননে;
> গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে;
> হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
> সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
> পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
> হায় বিধি এ কুবিধি কিসের লাগিয়া,

সংস্কৃত নাটকে গদ্য সংলাপের মধ্যে মধ্যে বহু শ্লোক সন্নিবিষ্ট থাকে। এই একটি মাত্র স্থান ছাড়া এই বিশেষ ভঙ্গিটি কবি পরিহার করে চলেছেন, এক্ষেত্রেও তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে কবিতাটি সন্নিবেশিত করে স্বস্তিবোধ করেন নি। বিদূষকের রসিকতায় নৃপতির এই আকস্মিক কবিত্ব বিদ্ধ হয়েছে।

কালিদাসের শকুন্তলা নাটক কবিকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে প্রত্যক্ষভাবে সে নাটকের বহু বাক্য এবং পরিস্থিতি শর্মিষ্ঠায় অনুসৃত হয়েছে। কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লিখিত হল।

এক। প্রথম অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যযাতির রাজধানীতে প্রবেশ করে শুক্র-শিষ্য কপিল বলেছেন, "আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কতদূর পরিবর্তন হয় তা অনুমান করা যায় না।" অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দুষ্মন্তের রাজসভায় প্রবেশ করে শার্ঙ্গরব-শারদ্বত ও আরণ্য ঋষিদের রাজভবন ও নগর দর্শনের প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন।

"শার্ঙ্গরব। শারদ্বত,

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব॥

শারদ্বতঃ। স্থানে ভবান্ পুরপ্রবেশাদিত্থংভূতঃ সংবৃত্তঃ। অহমপি
অভ্যক্তমিব স্নাতঃশুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি॥"

মধুসূদন কালিদাসের প্রভাবেই কপিলের মুখে এই বাক্যটি বসিয়েছেন। কিন্তু কপিল ও শার্ঙ্গরব-শারদ্বতের মনোভাবেব পার্থক্যটি চাপা থাকে নি। মধুসূদনের বৈভবের প্রতি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কালিদাস নাগরসম্পদের প্রতি সম্ভবত বিমুখ ছিলেন না, কিন্তু মধুসূদনের মত তীব্র প্রীতি তাঁর ছিল না, যাতে তপোবনবাসী তপস্বীদের স্বাভাবিক বিরূপতা আচ্ছন্ন করে নিজ মনোভাব সেখানে আরোপিত হয়।

দুই। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দরিদ্র ব্রাহ্মণের রাজদ্বারে ক্রন্দন এবং যযাতির অস্ত্রাদি গ্রহণ ও উত্তেজনা প্রকাশ অনেকটা শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে নেপথ্য থেকে প্রহৃত মাধব্যের সাহায্যার্থে ক্রন্দন এবং রাজার অস্ত্র গ্রহণের সঙ্গে তুলনীয়। সম্ভবত আদ্যন্ত আদিরসের অতিবিস্তারের কোমলতার মধ্যে অনুরূপ ঘটনার সংযোজনের সাহায্যে বীর্যের স্পর্শ দিতে চেয়েছেন মধুসূদন। কালিদাসের পরিকল্পনার কাছ থেকে সেই উদ্দেশ্যেই ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যযাতি দেবযানীর সঙ্গে প্রণয়ালাপে

বলেছেন, "স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শর যোজনা করলেম, কিন্তু সন্ধানকালেই কুরঙ্গিনী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্যেম না।" দুষ্যন্তের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে—

> ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো
> ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
> সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ
> কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ॥

চার। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে যযাতি বলেছে "এ কি? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগল কেন? এ স্থলে মাদৃশজনের কি ফললাভ হতে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রেই মুক্ত রয়েছে।" কালিদাসের নাটকেও কথাশ্রমে প্রবেশ করে শকুন্তলার সঙ্গে দেখা হবার আগে দুষ্যন্ত বলেছে—

> "শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য। অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।"

এরূপ আরও কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করা সম্ভব।

তাছাড়া এই নাটকের চরিত্রপরিকল্পনায়ও কালিদাসের শকুন্তলার প্রভাব লক্ষিত হয়। বিশেষ করে যযাতি চরিত্রে দুষ্যন্তের এবং শর্মিষ্ঠায় শকুন্তলার ছায়াপাত সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পডবেই। অবশ্য এ প্রভাবের পরিমাণ কতটা তা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। পরে সে আলোচনা করা হবে।

সামগ্রিকভাবে এই সিদ্ধান্তই করব শর্মিষ্ঠায় প্রবল সংস্কৃত প্রভাবের মধ্যেই কবি আবর্তিত হয়েছেন, নব পথের প্রয়োজন উপলব্ধি করলেও সে পথে পা বাড়াতে পারেন নি, পুরোপুরি চানও নি।

॥ তিন ॥

বাংলাদেশে পৌরাণিক নাটকের বহুল জনপ্রিয়তা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মত পৌরাণিক নাটকও বাংলাদেশে নাট্যরীতির একটা বিশিষ্ট শ্রেণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে। য়ুরোপে গ্রীক বা রোমক

পুরাণকথা নাট্যাদির উপকরণ যোগায় নি এমন নয়, কিন্তু রসের আস্বাদে কোন নবীনতা ও বিশিষ্টতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কিম্বা জনমানসে গভীর এবং ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টির ফলে Mythological drama সে দেশের নাটকে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীরূপে স্বীকৃত হয় নি। কাজেই এই জাতের নাটকের নিজস্ব রস ও রূপ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের নিকট থেকে কোন নির্দেশ পাবার সুযোগ নেই। বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাস এবং সাধারণ সাহিত্য-জিজ্ঞাসার সহায়তায় পৌরাণিক নাটকের একটি আদর্শ স্থির করা প্রয়োজন।

গিরিশচন্দ্রের প্রভাব বাংলা রঙ্গমঞ্চে এবং নাট্যসাহিত্যেও সুগভীর। বাংলা পৌরাণিক নাটকের যে রূপ ও রসাবেদন তাঁর রচনাগুলির মধ্যে বিদ্যমান তাকেই ঐ জাতের নাটকের আদর্শ বলে গ্রহণ করার একটা প্রবণতা কোন কোন সমালোচক মহলে প্রচলিত। এ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।

প্রসঙ্গত 'পুরাণ' কথাটির অর্থ পরিষ্কার করে নেওয়া সঙ্গত। কারণ পুরাণ বলতে আমরা ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণাদি অষ্টাদশ পুরাণ গ্রন্থকে বুঝলেও বাংলা পৌরাণিক নাটকের কাহিনী প্রধানত রামায়ণ মহাভারত থেকেই গৃহীত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত আকারে কিম্বা প্রকারে নিশ্চয়ই পুরাণ গ্রন্থগুলির সমগোত্রীয় নয়। তবুও ব্যাপক অর্থে পৌরাণিক নাটক, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রভৃতি কথায় অষ্টাদশ পুরাণ এবং নানা উপপুরাণ সহ রামায়ণ-মহাভারতকেও 'পুরাণ' বলেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বাংলা পৌরাণিক নাটকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীরই প্রাধান্য, অন্যান্য পুরাণ কাহিনীর সামান্য অনুসরণ আছে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। আবার মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্য-কাহিনী আশ্রয় করে রচিত নাটকগুলিকেও এই শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণত নির্বাসিত করা যায় না।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রারম্ভকাল থেকেই পুরাণকাহিনী আশ্রয় করে মৌলিক নাটক রচিত হয়েছে। তারাচরণের 'ভদ্রার্জুনে'র কথাই প্রথমে মনে পড়বে। তা ছাড়া রামনারায়ণ, কালীপ্রসন্ন কিম্বা মধুসূদনের কোন কোন নাটকে পুরাণ-কাহিনী অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু রামনারায়ণ যে ভঙ্গিতে 'রত্নাবলী'র অনুবাদ করেছেন সেই একই রীতিতে 'রুক্মিণীহরণ' কাহিনী নিয়ে মৌলিক নাটক রচনা করেছেন। প্রথম পর্বের পুরাণ-আশ্রিত নাটকগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা চলে—
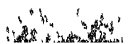
এক। পুরাণ-কাহিনী অন্য পাঁচটি উপকরণ উৎসের মতই বাঙালি নাট্যকারদের উদ্বুদ্ধ করেছে; কোন স্বতন্ত্র আবেদন এই বিষয়বস্তুর মধ্যে তাঁরা খুঁজে পান নি।

দুই। সংস্কৃতসাহিত্যে কালিদাস পুরাণকাহিনীর বীজ অবলম্বন করে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক রচনা করেছেন, ভবভূতি লিখেছেন 'উত্তর রামচরিত'। এরূপ আরও পুরাণাশ্রিত নাটক সংস্কৃতে রচিত হয়েছে। এদের বিষয়বস্তু রামায়ণ-মহাভারত থেকে সঙ্কলিত বলে বিশেষ কোন সুরের চর্চা এখানে তাঁরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। য়ুরোপীয় নাট্যকারেরাও গ্রীক-রোমান পুরাণকথাকে এই দৃষ্টিতেই গ্রহণ করতেন। বাংলা নাটকের প্রথম যুগের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল এদেরই অনুরূপ।

তিন। সাধারণভাবে সংস্কৃত নাটককে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা 'রোমান্টিক কমেডি' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম যুগের বাঙালি নাট্যকারেরা সেই রোমান্টিক কমেডির অনুবাদে হাত পাকিয়েছেন; আর মহাভারতাদির কাহিনী নিয়ে মৌলিক নাট্যরচনার কালেও ঐ একই সুরের অনুশীলন করেছেন।

চার। মূল কাহিনীকে বিস্তারিত করে, চরিত্রাদির প্রয়োজন মত বিকাশ ঘটিয়ে, দু-চারটি পাত্রপাত্রীর উপস্থাপনায় এঁরা কিছুটা স্বাধীনতা দেখালেও, পুরাণপ্রদত্ত কাহিনীর কোন উল্লেখ্য পরিবর্তন নাট্যমধ্যে তাঁরা ঘটান নি।

মনোমোহন বসু থেকে শুরু হল পৌরাণিক নাটকের রূপ ও রসের পরিবর্তন। রাজকৃষ্ণ রায়ের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রে গিয়ে তা চরমে উঠল। একে ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাংলা পৌরাণিক নাটকের দ্বিতীয় পর্ব বলে অভিহিত করা উচিত। এই পর্বের সাধারণ লক্ষণগুলি নিম্নরূপ;

এক। লোকপ্রচলিত যাত্রাগানের প্রভাব এই নূতন রূপরীতির ভিত্তি রচনা করল। যাত্রাপালায় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীই গৃহীত হত। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যে ভক্তি-তরল রূপ বঙ্গানুবাদের মধ্য দিয়ে এদেশবাসী জনসাধারণকে দীর্ঘকাল তৃপ্ত করেছে, যাত্রায় তার অনুসরণই লক্ষ্য। দুর্ধর্ষ জীবনের যে বলিষ্ঠ বর্বরতা মহাকাব্যের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত, যে বিপুল উদারতা ও ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা এই সৃষ্টি দুটির অন্তরলোকে সমন্বিত, কৃত্তিবাস-কাশীরামদাস ভক্তির অশ্রুবর্ষণে তাকে পেলব ও ললিত করে তুলেছেন। বাঙালি পাঠক দীর্ঘকাল ভক্তিআপ্লুত চিত্তে ভগবান রামচন্দ্র এবং নারায়ণ কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করে এসেছে। মধ্যযুগের সেই ভক্তি-ভাবনাকে

যাত্রাপালা আরও উদ্বেল করে তুলেছে। নাটকের রাজ্যে এবার তার অনুপ্রবেশ ঘটল। পৌরাণিক নাটক পুরাণ-কাহিনীকে অনুসরণ করল, কিন্তু প্রাচীন মহাকাব্যিক ভারত অপেক্ষা মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের বাঙলাদেশের প্রতিই তার আনুগত্য প্রধানত প্রকাশ করল। ভক্তিবাদের সুর বাংলা পৌরাণিক নাটকের মুখ্য আবেদন হয়ে দাঁড়াল।

দুই। ভক্তি প্রকাশের মূল লক্ষ্যকে সার্থক করার জন্যই এ জাতীয় নাটকে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হয়। এবং ভক্তিভাব মূলত একটা আবেগ বলেই প্রচুর সঙ্গীত-সংস্থান মাধ্যমে দর্শক-চিত্তকে সহজে তরঙ্গিত করে তোলার চেষ্টা হয়।

তিন। হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ ভাবকে বাহিরে দয়া, ধর্ম, বিবেক প্রভৃতি ব্যক্তিরূপে উপস্থিত করা এবং নৈসর্গিক বিপুল ও অপ্রতিবোধ্য শক্তিকে নিয়তি নাম্নী নারীর মধ্যে অনুভব করা এই পর্বের পৌরাণিক নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এদের শিল্পোৎকর্ষের পরিমাণ যাই হোক না কেন, বাংলা পৌরাণিক নাটক একটা বিশিষ্ট শ্রেণী হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে এই পর্বের নাট্যকারদের চেষ্টায়। পৌরাণিক নাটক এইভাবে যে নূতন চেহারা নিল তার জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর বিপুলতা পেয়েছিল। এমন কি সাম্প্রতিক কালেও বাংলার গ্রাম্য যাত্রার আসরে এই শ্রেণীর পৌরাণিক নাটকের একটি ভগ্নরূপের প্রচলন জনমনে এদের প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

গিরিশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হতে অস্বীকার করেছিলেন এমন একজন নাট্যকারের রচনায় পুরাণাশ্রিত নাটকের একটি ভিন্ন রূপ সূচিত হল। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মধুসূদনাদি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কাব্য সাহিত্যের নবজন্মের শুরুতে যেভাবে আধুনিকদৃষ্টিতে পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাখ্যা করেছিলেন, নাট্যসাহিত্যে তারই প্রচলনে প্রয়াসী হন দ্বিজেন্দ্রলাল। 'সীতা' নাটকে তিনি রামচন্দ্রের মধ্যে কঠিন কর্তব্যবোধ এবং প্রেমদৌর্বল্যের সংঘাত দেখাতে চেয়েছিলেন, 'পাষাণী' নাটকে অহল্যার অবৈধ প্রেম-তৃষ্ণায় আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন, 'ভীষ্ম' নাটকে তিনি চির কৌমার্যব্রতের সঙ্গে সহজ মানবিক চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকগুলি সাহিত্যিক উৎকর্ষে পৌঁছাতে না পারলেও ধর্মপ্রচার এবং ভক্তিরসের প্রভাব থেকে পৌরাণিক নাটককে মুক্ত করার চেষ্টায় এদের কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের সাহায্যে তার কোন আদর্শ রূপলক্ষণের ধারণা করা সম্ভব নয়। ভক্তিরস প্রচারকে এর অন্তর-লক্ষণ বলে গ্রহণ করা যায় না। গিরিশচন্দ্র পুরাণ-কাহিনীর সাহায্য না নিয়েই বহু নাটকে ভক্তিরস-সৃষ্টিতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছেন। 'বিল্বমঙ্গল' কিংবা 'বুদ্ধদেব চরিতে'র নাম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা চলে। তাই ভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রাণরসের অনুসন্ধান করা কর্তব্য। ঐতিহাসিক নাটকের অনুসরণে পৌরাণিক নাটকের আদর্শ লক্ষণের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের তথ্য অবশ্য অবলম্বনীয় হলেও তথ্যের যাথার্থ্যই তার লক্ষ্য নয়, এর মধ্য থেকে একটি বিশিষ্ট রসের আস্বাদ জাগিয়ে তোলাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছেন 'ঐতিহাসিক রস'। একটা সমগ্র জাতির জীবনের ছন্দ, তার ক্রান্তিকালীন উল্লাস ও বেদনার সুর যদি নাটকে ধ্বনিত হয় তবেই ইতিহাসের ঘটনা রসের আবেদনে সার্থক হয়। পৌবাণিক নাটকেও অবলম্বন রামায়ণ-মহাভারতের বা অন্যান্য পুবাণের কোন কাহিনী এবং পাত্রপাত্রী। এবং এটি প্রথম সর্ত, চরম লক্ষণ পৌরাণিক রসসৃজনে সার্থকতা লাভ। পৌরাণিক রস কি বস্তু সে প্রশ্ন উঠতে পারে। অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থে এ রসের সন্ধান মিলবে না। ঐতিহাসিক রসের ন্যায় এ একটি অতি জটিল আস্বাদ। নামটি পৌরাণিক রস হলেও অষ্টাদশ পুবাণের তুলনায় রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গেই এর সম্পর্ক নিকটতর।

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে জীবনের যে মহান, গম্ভীর ও উদাত্ত সুর সমুদ্রতরঙ্গের মত প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত, যে বিপুল প্রসার, যে বর্বর বীরত্ব সূক্ষ্ম বুদ্ধি-যুক্তি-রোমান্টিক জিজ্ঞাসা-নিরপেক্ষ এক উল্লাস ও আর্তনাদ-সঙ্কুল ছন্দে নিত্য তরঙ্গিত তার জটিল আস্বাদকে পৌরাণিক রস নামে অভিহিত করা যায়। পৌরাণিক নাটক পুরাণ-কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই জাতীয় কোন রসের সাধনা করলে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হতে পারে।

বাঙ্গলাদেশের পৌরাণিক নাটক এ আদর্শে কোনকালেই পৌঁছুতে পারে নি। কখনও প্রাণহীন ঘটনার আবর্তন চলেছে, কখনও তরল ভক্তিরসে, কখনও একালীন জীবনজিজ্ঞাসার স্পর্শে পৌরাণিক নাটক তার অভীষ্ট রসলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে; একটি বিশিষ্ট পর্বের বাংলা পৌরাণিক নাটক জনপ্রিয়তার স্বর্গে আসীন হলেও নাট্যজগতের কোন বিশিষ্ট রসলোক নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছে।

মধুসূদন স্বয়ং শর্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতী উভয় নাটককে ক্লাসিকরীতির নাট্য-রচনা বলে অভিহিত করেছেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর সমালোচনামূলক পত্রে এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর অভিনন্দন জ্ঞাপক চিঠিতে 'ক্লাসিক' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। পৌরাণিক নাটক বা mythological drama কথাটির প্রয়োগ কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু শর্মিষ্ঠার কাহিনী মহাভারত থেকে গৃহীত। প্রথম যুগের পুরাণাশ্রিত নাটকরূপে এর রসাবেদনে কোন বিশিষ্টতা আছে কিনা লক্ষ্য করবার মত।

উনবিংশ শতাব্দীর কবি ও চিন্তাবিদেরা পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাসের নব ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন তাঁদের রচনায়। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' উপাখ্যান কাব্য হিসেবে ব্যর্থ হলেও সেখানে একালীন স্বাধীনতার স্বপ্নের কিঞ্চিৎ প্রতিফলন সেকালীন ইতিহাস-কাহিনীর উপরে ছায়া বিস্তার করেছে। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে' পৌরাণিক কাহিনীর উপরে এ-যুগসুলভ স্বাধীনতা-চেতনার (অস্বচ্ছ হলেও) প্রভাব পড়েছে। 'দশমহাবিদ্যা'য় আদ্যাদেবীর পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত দশরূপে কবির যুক্তিবাদী মন ক্রমবিকশমান সভ্যতার দশটি স্তরের সন্ধান পেয়েছিলেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয়ীতে 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' রচনার চেষ্টা হয়েছে। গদ্যসাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' যুক্তিবাদ ও নব্যমানব চেতনার আলোতে মহাভারত ও পুরাণ কথিত কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এ ধারায় সবচেয়ে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন মধুসূদন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনচ্ছলে আধুনিক শিল্পীর সৌন্দর্যব্যাকুলতা স্বল্পত প্রকাশিত। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদন পুরাণ-কাহিনীকে গ্রহণ করলেও নব্য মানবচিন্তার বিদ্রোহী বাণীতে পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করতে দ্বিধামাত্র করেন নি। পাপী, পরস্ত্রী-অপহরণকারী রাবণ দাঁড়াল ট্রাজেডির মহান নায়ক হয়ে। অসতী তারার প্রেমে মুক্ত-প্রেমের মাধুর্য দেখে কবি মুগ্ধ হলেন।

কিন্তু নাট্যক্ষেত্রে মধুসূদনের সেই নব্য মানব-চেতনা ও বিদ্রোহী কবি-ব্যক্তিত্ব মৌলিকতা-সৃষ্টির ব্যাপারে এত সঙ্কুচিত হয়ে রইল কেন? এর সম্ভাব্য কারণ হল—

এক। শর্মিষ্ঠা নাটক লিখে বাংলা ভাষায় রচনায় তাঁর হাতেখড়ি হল। নিজের পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কবির মনে সংশয় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে মধুসূদন এর পূর্বে সম্ভবত এক পংক্তিও বাংলা

লেখেন নি। মৌলিক কিছু করবার যত তীব্র বাসনাই তাঁর থাক না কেন, কার্যত প্রচলিত ধারার বাহিরে পদার্পণ তাই সম্ভব হয় নি।

দুই। নাটক অভিনয়-নির্ভর। মধুসূদনের এ-বিষয়ে তীক্ষ্ণ সচেতনতা ছিল। 'রত্নাবলী'র রসে পুষ্ট বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের কথা মনে রেখে শর্মিষ্ঠা রচিত। সমকালীন অভিনয়যোগ্যতা এবং দর্শকরুচির কথা নাট্যকারের রচনাকে প্রভাবিত করবেই; কবির সামনে প্রত্যক্ষ সাফল্যের এরূপ সমস্যা থাকে না। পাইকপাড়ার ছোটরাজা নাটকটির সাহিত্যগুণের উচ্চ প্রশংসা করলেও অভিনয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রত্নাবলীর মত এটি মঞ্চসাফল্য পাবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন নি। এক পত্রে গৌরদাসকে তিনি লিখছেন,

> "No one knows what effect such a thing as the 'sharmista' will have on the stage. It is still a matter of doubt whether it will be as popular as Ratnabali. I will give no opinion concerning it unless it has passed the ordeal of public criticism."

এই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহই সাহিত্যিক মধুসূদনের প্রথম পৃষ্ঠপোষক। বাঙ্গলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে। কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় নিত্য অভাবী লোকের পক্ষে গ্রন্থমুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করা একরূপ অসম্ভব ছিল। তাঁকে তাই পৃষ্ঠপোষকের উপরে প্রধানত নির্ভর করতে হয়েছে, কারণ একালের ন্যায় প্রকাশন ব্যবসায় তখন কিছুমাত্র বিকশিত হয় নি। এই অবস্থার কথা মনে রাখলে বলতে হয় মধুসূদন আপন বাসনাকে বাধাহীন প্রকাশ দিতে পারেন নি শর্মিষ্ঠা নাটকে। এ বন্ধন তাঁকে অন্তরে ক্লিষ্ট করেছে, কিন্তু এ থেকে তিনি মুক্তি চাইতে পারেন নি। কাজেই শর্মিষ্ঠার পুরাতন কাহিনীতে নব্য ভাবনার সঞ্চার করতে তিনি সাহসী হন নি।

শর্মিষ্ঠা নাটক পুরাণের কাহিনীটির অনুসরণ করেছে। এ অনুসরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করা যাবে; মোটামুটিভাবে বলা যায় পুরাণ-কাহিনী অনুসরণে আনুগত্য আছে। কিন্তু যে রীতিতে পুরাণকাহিনী গ্রহণ করে সংস্কৃত নাটকের রচয়িতারা নাটক লিখতেন সেই রীতিতেই পুরাণ-কাহিনীকে নাট্যরূপ দান করেছেন কবি। সংস্কৃতে পুরাণ কাহিনী নিয়ে নাটক লিখবার প্রথা ছিল। যেমন 'উত্তর রামচরিত'। আবার কাল্পনিক কাহিনীকে কেন্দ্র করেও নাটক লেখা হত যেমন,

'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা'। কিন্তু রসাবেদনগত (নাটকীয় উৎকর্ষ নিরপেক্ষ ভাবে) ঐক্য এদের মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যাবে। কল্পনার আমন্ত্রণে সেখানে বাধা ছিল না, কিন্তু মাধ্যমগত পার্থক্যের জন্য যতটুকু কল্পনার প্রয়োজন কিংবা ঘটনা বা চরিত্রের ফাঁক পূরণের জন্য যেটুকু দরকার তার অধিক অগ্রসর হতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের পৌরাণিক লক্ষণ এই পর্যন্তই।

মধুসূদন মেঘনাদবধের মহাকাব্যিক রসসৃজনের সময় তো বটেই, এমন কি তিলোত্তমাসম্ভবে বা বীরাঙ্গনা কাব্যের খণ্ড খণ্ড কবিতায়ও পৌরাণিক জীবন পরিবেশের বর্ণাঢ্য বিপুলতা এবং বর্তমানের সামান্যতামুক্ত ঘনীভূত গভীরতায় Third dimensional effect সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। চিত্রকল্পের উন্নত মহিমা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাম্ভীর্য, চরিত্রচিত্রণে ভাস্বরোচিত পৌরুষ তথা দেবতা ও দানবসদৃশ ব্যাক্তত্ব পৌরাণিক রসের বিশিষ্ট আস্বাদ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠা নাটকে সে-জাতীয় কোন আবেদন সৃষ্টির চেষ্টামাত্র কবি করেন নি। অথচ মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্ব যে বর্তমানকে পিছনে ফেলে বারবার অতীতাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে তার মধ্যে সেকালীন বর্ণবহুলতার প্রতি আকর্ষণ, মহিমা, গাম্ভীয ও বিপুলতার প্রতি প্রবণতা আছে বলে মনে হয়।[৭] শর্মিষ্ঠা নাটকেও কবি পুরাণাশ্রয়ী। কিন্তু কবির প্রাণ এখানে জাগরিত নয়; পুরাণের সেই বিশিষ্ট গম্ভীর বীর্য ও রূঢ় দেহধর্মী প্রেম-চেতনার রাজ্য এখানে অনুপস্থিত। যযাতি, দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা চরিত্রের যে পরিচয় মহাভারতে আছে তার মধ্যে এই বীর্য প্রকাশের সুপ্রচুর সুযোগ ছিল। কিন্তু কোমলতাটুকু ছেঁকে নিয়ে কবি তৃপ্ত থেকেছেন। এ ব্যাপারেও সংস্কৃত নাটকের আদর্শই তাঁকে প্রভাবিত করেছে বলা চলে।

॥ চার ॥

মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতের আদিপর্বের পঞ্চসপ্ততিতম, ষট্‌সপ্ততিতম, সপ্তসপ্ততিতম, অষ্টসপ্ততিতম, একোনঅশীতিতম, অশীতিতম, একাশীতিতম, দ্ব্যশীতিতম, ত্র্যশীতিতম, চতুরশীতিতম, পঞ্চাশীতিতম, ষড়শীতিতম, সপ্তাশীতিতম, অষ্টাশীতিতম, নবতিতম, একনবতিতম, দ্বিনবতিতম, ত্রিনবতিতম অধ্যায় জুড়ে যযাতি-দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় কাহিনীর ভূমিকা মাত্র। অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় যযাতি-চরিতকথার সার সেখানে কথিত হয়েছে। আসল কাহিনীর সূত্রপাত

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় থেকে। ষট্‌সপ্ততিতম ও সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় জুড়ে কচ ও দেবযানীর আখ্যান স্থান পেয়েছে। এ কাহিনীর সঙ্গে আমাদের সমালোচনার কোন সম্পর্ক নেই। অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় থেকে চতুরশীতিতম অধ্যায় পর্যন্ত শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যযাতির পরবর্তী জীবন—স্বর্গলাভ, প্রজ্ঞা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সঙ্গে সেই উত্তরাংশের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রথমে শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর কলহের বিবরণ দান করেছেন মহাভারতকার। দেবরাজ ইন্দ্রের চক্রান্তে সখীসহ জলক্রীড়ারত শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর বস্ত্র মিশে যায়। শর্মিষ্ঠা ভুল করে গুরুকন্যা দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায় দেবযানী তাকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করে। শর্মিষ্ঠাও কঠোর প্রত্যুত্তর দেয়।

"শর্মিষ্ঠার, এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বলপূর্বক আপনার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শর্মিষ্ঠা কোপাক্রান্তা ও কম্পিত কলেবর হইয়া দেবযানীকে সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন। দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া শর্মিষ্ঠা স্বভবনে গমন করিলেন। মৃগয়াবিহারী নহুষাত্মজ যযাতি রাজা অশ্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সন্নিহিত হইলেন। রাজা জল প্রার্থনায় কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর হইয়া অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সেই রমণীকে অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কেনই বা এত শোকাকুলা হইয়াছ? আর কিরূপেই বা অন্ধকার কূপে পতিত হইয়াছ? দেবযানী কহিলেন, দানবেরা দেবগণ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে যিনি সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রাচার্যের কন্যা। আমি যে এই বনমধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ আপনি মহাবংশপ্রসূত, অসামান্য যশস্বী ও শান্তপ্রকৃতি; অতএব আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। রাজা যযাতি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণীবোধে দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্বক কূপ হইতে

উদ্ধৃত করিলেন এবং সাদরসম্ভাষণপূর্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।"

—[কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত]

এই ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হল দ্বিমুখী। প্রথমত, দেবযানীর ক্রোধ নিবারণের জন্য শুক্রাচার্যের আদেশে দৈত্যরাজকন্যার তার দাসীত্বে নিয়োগ; দ্বিতীয়ত, যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ। যযাতি কূপমধ্য হতে দেবযানীকে দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে উদ্ধার করেছিলেন। এই যুক্তি দেখিয়ে দেবযানী যযাতিকে একরূপ বাধ্য করল তাকে বিবাহ করতে। কূপপতন-ঘটনাটি এদের তিনজনের জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। যযাতি-দেবযানীর দাম্পত্যজীবন সুখে কাটছিল। শর্মিষ্ঠার বঞ্চিত যৌবন-কামনা প্রবল হয়ে উঠল। তখন একদিন,

"সুচারুহাসিনী শর্মিষ্ঠা রাজাকে নির্জনে পাইয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে কিংবা আপনার অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে তাহাদিগকে কেহই নয়নগোচব করিতে পান না। হে রাজন্! আমার কুল, শীল, রূপ, যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বিনয়পূর্বক প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঋতুরক্ষা করুন। যযাতি কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি অতি সুশীলা, সৎকুলোদ্ভবা এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহে, কিন্তু দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে শুক্র আমাকে কহিয়াছেন, এই বৃষপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচ শয্যায় আহ্বান করিও না। শর্মিষ্ঠা কহিলেন, মহারাজ! পরিহাসপ্রসঙ্গে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কটে, ও সর্বস্বনাশকালে মিথ্যা ব্যবহার কদাচ পাপাবহ নহে।···অনন্তর ধর্ম-পরায়ণ রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার ঋতুরক্ষা করত পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৃষপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠা রাজার সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন।"

—[ঐ]

কিছুকাল পর্যন্ত এই ঘটনা গোপন ছিল। এর মধ্যে দেবযানীর দুই এবং শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করল। শর্মিষ্ঠা তার পুত্রদের পিতৃপরিচয় দান প্রসঙ্গে গিয়ে দেবযানীর কাছে মিথ্যা কথা বলল। কিন্তু কিছুকাল পরে

ঘটনাচক্রে সব কিছুই প্রকাশ হয়ে পড়ায় ক্রুদ্ধা দেবযানী পিতৃগৃহে গমন করল। যযাতিও ভীতভাবে সঙ্গে গেল। সব শ্রবণ করে শুক্র যযাতিকে অভিশাপ দিল। যযাতি জরাগ্রস্ত হল। শুক্র অবশ্য এই শাপমোচনের উপায়ও বলে দিল।

"তৎপরে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে কহিলেন, বৎস! শুক্রের শাপপ্রভাবে এই মহাঘোর জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমি বিষয়ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করি। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। যদু কহিলেন, মহারাজ! জরার অনেক দোষ, তাহাতে পানভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে, শ্মশ্রুজাল শুক্ল এবং মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট, নিরানন্দ ও সর্বকার্যে নিরুৎসাহ হয়। আত্মীয় ব্যক্তিরা জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে; অতএব আমি জরা গ্রহণে সম্মত নহি।"

—[ঐ]

রাজা যদুকে অভিশপ্ত করলেন। তারপর তিনি একে একে তুর্বসু, দ্রুহ্যু ও অনুকে তাঁর জরা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তারা কেউই সম্মত হল না এবং পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত ও পরিত্যক্ত হল।

"সর্বশেষে পুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস পুরো! আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি, আমার কেশ পলিত ও মাংস লোলিত হইয়াছে; কিন্তু আমি যৌবনসুখ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয়ভোগ করি।...পুরু এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, যে আজ্ঞা, মহারাজ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব। আমি পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিব।"

—[ঐ]

প্রতিটি সাহিত্যরূপের নিজস্ব কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। কাহিনী উপস্থাপন এবং চরিত্রচিত্রণে এইরূপ বিশিষ্টতার জন্য কিছু পরিবর্তন ঘটবেই

মহাভারতের মহাকাব্যিক কথনভঙ্গির যথাযথ প্রতিফলন শর্মিষ্ঠার নাট্যরীতিতে মিলবে না ঠিকই। কিন্তু মহাভারতের কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন কবি আনেন নি। মহাভারতের কাহিনীকে তিনি প্রয়োজনমত সংক্ষিপ্ত করে গ্রহণ করেছেন। এই সংক্ষিপ্তকরণের পিছনে নাট্যকারের কাহিনী-গঠনগত একাগ্র বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতে যযাতি-কাহিনী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যযাতির জীবনে এক বিশেষ পর্যায়ে বিশিষ্ট এক সমস্যা দেখা দিয়েছে ; সেই সমস্যার জট বাঁধবার পূর্ব থেকেই সেখানে কাহিনী চলে আসছে, সমস্যার সমাধান হবার পরেও কাহিনী সমাপ্ত হয় নি। উক্ত সমস্যাটিকেই দেবযানী বা যযাতির জীবনে একক করে তুলতে চান নি মহাভারতকার। কিন্তু নাট্য-কাহিনীতে গল্পটি একাগ্র ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। দেবযানীর পূর্বজীবন অর্থাৎ কচের প্রতি তার উজ্জ্বল প্রেমের যে উপাখ্যান মহাভারতে আছে তাকে মধুসূদন একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন। দেবযানীর পূর্ব-কথার সঙ্গে বর্তমান কাহিনীর কোন যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ নেই। দ্বিতীয়ত, যযাতির উত্তর জীবনের যে কাহিনী মহাভাবতে বিবৃত হয়েছে তাতে যযাতি-চরিত্রে অনুদ্ঘাটিতপূর্ব প্রজ্ঞার পরিচয় আছে। কিন্তু বর্তমান নাটকের সঙ্গে সে-অংশেরও সংযোগ নেই। মধুসূদন সতর্কতার সঙ্গে যযাতি-জীবনের উত্তরাংশও পরিত্যাগ করেছেন। শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর সংঘর্ষ নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। যে সমস্যাটি নাটকের কেন্দ্রে তার ভিত্তি এই সংঘর্ষে। শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানী এই তিনটি নরনারীর জীবন জড়িয়ে যে সমস্যার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি বর্তমান নাটকের তাই-ই কাহিনী। প্লটগঠনে নাটকোচিত ঐক্য তথা নাট্যকারের নিজস্ব কাহিনী-গঠন সম্পর্কিত রুচিবোধের (শুধুমাত্র নাটকে নয়, কাব্যকাহিনীগুলিতেও এই ঐক্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে) ফলেই তিনি মহাভারতের আদি ও অন্ত উন্মুক্ত কাহিনীটিকে বৃত্তাকার পূর্ণতা দান করেছেন।

কাহিনী-অংশে এমন কোন পরিবর্তন ঘটান নি নাট্যকার যাতে পুরাণ-কাহিনীর উপরে নব্যভাবনার আলোকপাত-চেষ্টা লক্ষ্য করা যেতে পারে। তবে দুটি ক্ষেত্রে সামান্য যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তার কিছু তাৎপর্য আছে।

এক। দেবযানীর যযাতির প্রতি আকর্ষণের তথা যযাতির দেবযানীর প্রতি নবজাত ভালবাসার রোমান্টিক মধুর চিত্র মধুসূদন আঁকতে চেয়েছেন। শর্মিষ্ঠা-যযাতির প্রেমের ক্ষেত্রেও এই মাধুর্য প্রকট। কিন্তু মহাভারতে

দেহভোগবাসনা প্রবলতর। দুর্বলচিত্ত ভোগলোলুপ যযাতিকে উভয় ক্ষেত্রেই সুন্দরী নারীর উপরোধে স্বীকৃতি জানাতে হয়েছে। মহাভারত-কাহিনীতে প্রেমের যে রূঢ় দেহভাবনা-প্রধান চিত্র স্থান পেয়েছে, তাকে যথেষ্ট যুগোপযোগী বলে কবির মনে হয় নি। তাকে হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত করে নবরূপ দানের বাসনা থেকেই উপরোক্ত পরিবর্তনের জন্ম।

দুই। দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে পিতৃগৃহে গমন করেছিল, যযাতি ভীতভাবে তার সঙ্গ নিয়েছিল। সেখানেই শুক্রাচার্য যযাতিকে অভিশপ্ত করেন। মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটকে সংঘাতসঙ্কুল ঘটনাসন্ধিগুলির তীব্রতাকে এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতে প্রশান্ত করে তোলেন। এই বিশিষ্টতা শুধুই নাট্যবোধের অভাবজনিত নয়, মধুসূদন সম্ভবত ঘটনার প্রত্যক্ষতা অপেক্ষা তার প্রতিক্রিয়ার আবেগোচ্ছ্বাস বর্ণনায় অধিকতর প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকে যযাতি দেবযানীর অনুগমন করেন নি। প্রতিষ্ঠানপুরেই অবস্থান করেছেন। শুক্রের অভিশাপ দূর থেকে তাকে আহত করেছে।

চরিত্রসৃষ্টিতে মহাভারতীয় কল্পনার সঙ্গে মধুসূদনের ভাবনার গুরুতর পার্থক্য আছে। সে সব পার্থক্যে মধুসূদনের মৌলিকতা ততটা সক্রিয় নয়, সংস্কৃত পুরাণাশ্রিত নাটক তথা 'রোমান্টিক কমেডি'র অনুসৃতিই এখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শর্মিষ্ঠা নাটকের চরিত্র-বিচার প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

॥ পাঁচ ॥

শর্মিষ্ঠার গঠনকৌশল কিছু প্রশংসার দাবী রাখে। সমকালীন বাংলা নাটকে এ-জাতীয় গঠনসৌষ্ঠব দুর্লক্ষ্য ছিল। সংস্কৃত নাটকে উপস্থাপনভঙ্গি যতই মন্থর হোক না কেন কাহিনীগত ঐক্য রক্ষিত হতে দেখা যায়। নাটকের চিরকালীন আদর্শের দিক থেকেও শর্মিষ্ঠার এই সংহত একমুখীতা মোটামুটি ভাবে নিন্দার অপেক্ষা রাখে না। কিছু কিছু বিচ্যুতি সত্ত্বেও নাটকে আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর অপরিহার্যতা বিষয়ে মধুসূদন সচেতন ছিলেন। মহাভারতের মূল কাহিনী থেকে নির্বাচনকালে সেই সচেতনতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এ-বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রশংসাবাক্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে ;

"নাটকরচনার এক প্রধান নিয়ম এই যে তাহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয় তৎসমুদায়কে এক উদ্দেশ্যের অনুকূল হওয়া কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্য

বর্ণনীয় বিষয়ের মুখ্য ঘটনা। প্রত্যেক গর্ভাঙ্কে সেই মুখ্য ঘটনার উপায় ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে থাকে তাহা হইলেই অসংলগ্নত্ব দোষের সম্ভাবনা হয় না। উক্ত নাটকে ভয়ানক বর্ণিতব্য হইলেও মধ্যে মধ্যে রহস্যজনক ব্যাপারেরও বর্ণন থাকে, কিন্তু সদ্‌গ্রন্থকারেরা এতাদৃশ কৌশলে তাহার বিনিয়োগ করেন যে তাহাতে রসের অপলাপ হয় না। দত্তজ এ বিষয়ে পরিমণ্ডিত। তিনি অনেকগুলি অনাবশ্যক কৌতুকবাক্য এমন চতুরতার সহিত প্রস্তাবিত নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে তাহা কোনোমতে অসংলগ্ন বোধ হয় না।"

—['বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকা]

শর্মিষ্ঠা নাটকের মূল সমস্যা একটি ত্রিভুজপ্রেমের সমস্যা। এ-জাতীয় সমস্যা নিয়ে বহু সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছিল। বিশেষ করে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' এবং 'বিক্রমোর্বশী'র নাম প্রথমেই মনে আসে। সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে কালিদাসেব সঙ্গেই মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তা ছাডা যে 'রত্নাবলী' তাঁকে নাট্যরচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল তার এবং ঐ একই নাট্যকার শ্রীহর্ষ রচিত 'প্রিয়দর্শিকা'র সমস্যাও ত্রিভুজপ্রেমের সমস্যা। এ বিষয়ে পূর্বেই কিছু আলোচনা কবা হয়েছে। নৃপতি যযাতি পত্নী দেবযানীর দাসী রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে গোপনে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় এই সমস্যা তীব্র হয়ে উঠল। ফলে দেবযানীর ক্রোধ, পিতা শুক্রের কঠিন অভিশাপ, জরাগ্রস্ত যযাতির জরা পুত্র পুরু কর্তৃক গ্রহণ, শুক্রের ক্রোধোপশম এবং যযাতির সঙ্গে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার নির্দ্বন্দ্ব মিলন;— আলোচ্য নাটকের ত্রিভুজপ্রেমের কাহিনীটি এইরূপ। রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার দাসীত্ব এই কাহিনীকে জটিল করে তুলেছে। প্রকৃত পক্ষে শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর দ্বন্দ্বের মধ্যে এই নাট্যকাহিনীর আরম্ভ। কিন্তু শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর দ্বন্দ্ব, যযাতির শর্মিষ্ঠার প্রতি প্রেম এবং দেবযানীর সহিত বিরোধিতা থেকে স্বতন্ত্র একটি সমস্যা হয়ে ওঠে নি। নাট্যকার প্রথমোক্ত দ্বন্দ্বকে দ্বিতীয় সংঘাতের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়েছেন। ফলে নাটকীয় ঐক্য কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। কিন্তু দেবযানী ও যযাতির চিত্তে প্রেমানুভূতির জন্ম এবং তাদের বিবাহ নাটকের প্রারম্ভে অনেকখানি স্থান জুড়ে বসেছে। এই অংশে নাট্যদ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে স্থগিত থেকেছে। নাটকীয় গঠনভঙ্গির উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হিসেবে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

শর্মিষ্ঠা নাটকের গঠনগত এই বিশিষ্টতা কিছু বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর কলহ, শর্মিষ্ঠা কর্তৃক দেবযানীকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ, সংবাদ পেয়ে শুক্রের ক্রোধ ও পরিশেষে শর্মিষ্ঠার দাসীত্ব প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে যযাতির প্রতি দেবযানীর প্রেম এবং শুক্রকর্তৃক তাদের বিবাহে সম্মতি দানের কথা বলা হয়েছে। একটি উৎস থেকেই ঘটনার এই দ্বিমুখী প্রবাহের সূত্রপাত। শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করল। এই কূপ থেকে তাকে উদ্ধার করল যযাতি। এই একটি ঘটনার ফলেই শর্মিষ্ঠার দাসীত্ব এবং দেবযানী-যযাতির বিবাহ সম্ভাবিত হল। নাট্যকার প্রথম অঙ্কের দুটি দৃশ্যে দুদিক থেকে নাট্যবীজ বপন করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রেমার্ত যযাতির অস্থৈর্যের সংবাদ পাওয়া গেল, শুক্রশিষ্য কপিলেরও আগমন ঘটল দেবযানী-যযাতির বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। দ্বিতীয় দৃশ্যে যযাতি-বিদূষক সংবাদে দেবযানীর প্রেমে ব্যাকুলচিত্ত নৃপতিব হৃদয়াকুতি প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে দেবযানী-যযাতির বিবাহের সংবাদ মিলল। দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই। দাসীত্বে বন্দিনী রাজকুমারীর কাহিনী কথনই যদি নাট্যকারের লক্ষ্য হয় তা হলে এই অঙ্কের তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন। দেবযানী-যযাতির বিবাহ এ নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা নয়। এই ঘটনার প্রতি পাঠকহৃদয়কে কিছু অধিক আকৃষ্ট করলে নাটকীয় ঐক্য ব্যাহত হতে বাধ্য। ঘটনাগত যোগসূত্র হিসেবে যযাতি-দেবযানীব বিবাহ-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সংবাদ অবশ্য অপরিহার্য। কিন্তু প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্য জুড়েই এর উপস্থিতি কেন্দ্রচ্যুতি ঘটিয়েছে। কাহিনী অগ্রসর হয়েছে ঠিকই। কিন্তু প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত হয়েছিল তার আর কিছুমাত্র বিকাশ ঘটল না। যযাতি-দেবযানীর বিবাহ-সম্ভাবনা প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত সমানে অগ্রসর হয়ে চরিতার্থতা লাভ করল। এবং সে-কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। এ প্রেম ও বিবাহে কোন দিক থেকেই প্রকৃত বাধা আসে নি, তাই সংঘাতজাত নাটকীয় রসের স্ফূর্তি হয় নি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বর্ণস্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ ভোজবাজীর মত ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হয়েই বিলীন হয়ে গেল।

প্রকৃত নাট্যদ্বন্দ্বের পুনরাবির্ভাব ঘটল তৃতীয় অঙ্কে। প্রথম দৃশ্য কিছু

সংবাদ এবং বিদূষকের কিছু রসিকতা দিয়ে পূর্ণ। দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার যথার্থ নাট্যকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। দৃশ্যের প্রথম অংশে দেবযানী ও যযাতির নর্মলীলা প্রকাশ পেল। ঐ একই দৃশ্যের পরবর্তী অংশে শর্মিষ্ঠার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যেই রয়েছে দ্বন্দ্বের বীজ। যযাতির চরিত্রের অস্থির ইন্দ্রিয়দুর্বলতা এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেই চরিত্রভিত্তিই সংঘাতকে তীব্র করে তুলেছে। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর যে কলহে নাটকের সূত্রপাত এখানে তা নূতন রূপ ধরে দেখা দিল। স্বামী নিয়ে প্রকাশ্যে কলহ তারা করে নি, কিন্তু স্বামীর উপরে একক অধিকার বিস্তার করতে চেয়েছে দেবযানী, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যযাতির বিবাহে সে অধিকারে আঘাত লেগেছে। তার যযাতির প্রতি ক্রোধ, পিতাকে অনুরোধ করে যযাতিকে অভিশাপ দান সবই শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তার কলহের সঙ্গে যুক্ত। যা ছিল শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কলহ তা-ই হয়ে দাঁড়াল যযাতির সঙ্গে সংঘর্ষ। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে শর্মিষ্ঠা-যযাতির পারস্পরিক আত্মসমর্পণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে নাট্যদ্বন্দ্ব ক্রমে তীব্র হয়ে উঠেছে বলা যেতে পারে।

এই দ্বন্দ্ব ক্লাইম্যাক্সের চরমতা পেল চতুর্থ অঙ্কে। প্রথম দৃশ্যে ক্রুদ্ধা দেবযানীর গৃহত্যাগে রাজার দুশ্চিন্তা, দ্বিতীয় দৃশ্যে দেবযানীর অনুরোধে শুক্রকর্তৃক রাজাকে অভিশাপ প্রদান, তৃতীয় দৃশ্যে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে নর্মলীলারত যযাতির জরাগ্রস্ততা বর্ণিত হয়েছে। নাট্যসংঘাত এই অঙ্কে তীব্রতম হয়েছে, গুরুতর বিপদ যযাতির উপরে ঘনিয়ে এসেছে, এবং সেই বিপদের উৎস দেবযানীর ক্রোধ।

পঞ্চমাঙ্কে বিপন্মুক্তির কাহিনী স্থান পেয়েছে। প্রথম দৃশ্যে রাজার জরামুক্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জরামুক্তিতে মূল সমস্যার সমাধান ঘটে নি। দ্বিতীয় দৃশ্যে সেই সমাধান এসেছে। শর্মিষ্ঠার দাসীত্বের অবসান ঘটেছে। দেবযানী-শর্মিষ্ঠার তথা দেবযানী-যযাতির মিলন হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে গুরুতর বিপদের আঘাতে দেবযানীর চরিত্রের পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছিল। এই সর্বব্যাপী মিলন তার ফলেই সম্ভব হল।

নাট্যশাস্ত্রের ভাষায় বলা যেতে পারে অঙ্কসজ্জার মধ্য দিয়ে কাহিনী-গঠন কিরূপ পূর্ণতা পেয়েছে; প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাট্যদ্বন্দ্বের উপস্থাপন বা Exposition; তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত দ্বন্দ্বের ক্রমবর্ধমান তীব্রতার চিত্র বা Growth of Action; চতুর্থ অঙ্কে দ্বন্দ্বের চরমতা বা climax এবং পঞ্চম অঙ্কে সমাধান বা যুগপৎ fall of action এবং catastrophe। সমস্যা

চরমে ওঠার পরেই দ্রুত সমাধানের যবনিকা টেনেছেন নাট্যকার। অর্থাৎ নাটকের climax টি স্থাপিত করেছেন সমাপ্তির মুখে। আর প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত চারটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যে কবি নাট্যদ্বন্দ্বকে স্থগিত রেখে যযাতি-দেবযানীর বিবাহ-কাহিনী কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এত বিস্তৃতির কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সংক্ষিপ্তভাবে এ কাহিনীটুকু বিবৃত করলেই যথেষ্ট হত। একদিন যার তীব্র ভালোবাসায় দেবযানী স্বর্গসুখ লাভ করেছিল সেই যযাতির অবহেলা তাকে কতটা উত্তেজিত করতে পারে তা বোঝাবার জন্য প্রয়োজন ছিল এই কাহিনীর। এই কাহিনী অকথিত থাকলে ঘটনা বিকাশে যে ফাঁক থেকে যায়, তা স্বীকার্য। কিন্তু যেখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপরিহার্য সেখানে বিস্তৃতি ত্রুটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন নাটকীয়তা সৃষ্টিতে কতটা সার্থক হয়েছেন তা ভাববার মত। আমরা পূর্বেই বলেছি মধুসূদন চিরকালই কবিস্বভাব ব্যক্তি। আবাল্য কবি হিসেবে সাফল্য অর্জনের স্বপ্নই তিনি দেখেছেন। মাদ্রাজ প্রবাসকালে তিনি কবিতা রচনায়ই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যদিও সে কবিতার ভাষা ইংরেজী। নাটক রচনার বিশেষ কোন চেষ্টা তিনি পূর্বে করেন নি। মাদ্রাজ প্রবাসকালে Rizia : the Empress of Ind. নামক কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন, নাটক নয়। সেকস্‌পীয়রের নাটকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। গ্রীক নাট্যকারদের রচনাও তিনি পাঠ করে থাকবেন। কিন্তু নিজের প্রথম নাটকে নাট্যসাহিত্যের প্রধানতম লক্ষণ যে প্রত্যক্ষ কর্ম-চাঞ্চল্য (direct action), তার অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। সংস্কৃত নাটকের বর্ণনার আধিক্য এ বিষয়ে কবিকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভার বিশিষ্টতার মধ্যেই রয়েছে এর বীজ লুকানো। বিশেষ করে শর্মিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথম প্রচেষ্টাজনিত দিশাহারা ভাব কবিকে ঘটনার তুলনায় প্রায় সম্পূর্ণত বিবরণের রাজ্যে ঠেলে দিয়েছে।

শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর যে কলহে নাট্য-ঘটনার [illegible]পাত বকাসুর ও অপর দৈত্যের কথোপকথনে ব্যক্ত হয়ে তা সর্বচাঞ্চল্যচ্যুত হয়েছে। শুক্রের ক্রোধ, শর্মিষ্ঠার দাসীত্ব সব কিছুই সংবাদরূপে পরিবেশিত হয়েছে, ঘটনারূপে দেখান হয় নি। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পরিকল্পনাই করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে। দ্বন্দ্বজাত যে নাট্যসম্ভাবনা ঘটনাগুলির মধ্যে সুপ্ত ছিল তা এইভাবে সম্পূর্ণত

বিসর্জিত হয়েছে। যযাতিকর্তৃক কূপ থেকে দেবযানীকে উদ্ধার এবং উভয়ের চিত্তে তার প্রতিক্রিয়া একটি ঘটনাসমৃদ্ধ দৃশ্যে নাটকীয় সংলাপে ধরে রাখার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু কবি ঘটনাংশটি বাদ দিয়েছেন এবং দুটি দৃশ্যে দেবযানী তথা যযাতির মনে উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যে ভাবাবেগের সঞ্চার হল তার গীতিকাব্যোচিত বর্ণনা দিয়েছেন। যযাতি-শর্মিষ্ঠার গোপন মিলনের ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়ায় দেবযানীর ক্রোধ প্রত্যক্ষত চিত্রিত হলে নাট্যাবেদন সৃষ্টি করতে পারত, চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যযাতি-বিদূষকের সংলাপে সে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। ক্রুদ্ধ শুক্রকে যযাতির সম্মুখীন হতে দেন নি নাট্যকার। দূর থেকে তাঁর অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হয়েছে। পুত্রদের প্রতি যযাতির আপন জরা গ্রহণের আবেদন, পুত্রদের প্রত্যাখ্যান অবশেষে পুরুকর্তৃক পিতৃআজ্ঞা পালন প্রভৃতি ঘটনা মন্ত্রী, বিদূষক ও নাগরিকদের আলাপ-আলোচনায় পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রকাশ পেয়েছে, বিপরীত ভাব-ভাবনার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যকার তীব্র প্রত্যক্ষ সংঘাত হিসেবে উপস্থিত হয় নি। ফলে শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রধান অংশ বিরক্তিকর ঘটনা বিবৃতিতে পরিণত হয়েছে, প্রত্যক্ষ কর্মচাঞ্চল্যের তরঙ্গিত দ্বন্দ্বসংঘাতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয় নি। কাহিনী-কল্পনায় যে দ্বন্দ্বপ্রাণ পূর্ণতা লক্ষণীয়, রচনাভঙ্গিতে তা আদৌ সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয় নি।

মাত্র দু-একটি স্থানে প্রত্যক্ষতাকে নাট্যমধ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে নাটকীয় রসসৃজনে সাফল্য দেখাতে পেরেছেন মধুসূদন। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের কথা। দেবযানী ও শুক্রের মধ্যে স্বল্পস্থায়ী ভাব-সংঘর্ষের চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার। সংলাপের ভাষার দুর্বলতা না থাকলে এটি একটি নাট্যরসঘন চিত্ররূপে সমাদর দাবী করত,—

"শুক্র। তুমি রাজগৃহিনী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এ স্থানে এ অবস্থায় কি নিমিত্ত?

দেব। হে পিতঃ, আপনার হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুলমান আছে।

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোঽস্মি। এ কি দুর্দৈব! (প্রকাশ্যে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন, আপনি দেব-দানবপূজিত মহর্ষি। আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিলি?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ। আপনি আমাকে দুর্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল ; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণই রাখবো না।

শুক্র। (বিষণ্ণবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কি বল না!

দেব। (নিরুত্তরে রোদন)।"

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে নর্মরত যযাতি যখন অদৃশ্য ও অজ্ঞাত সূত্র থেকে আগত অভিশাপে আকস্মিক ভাবে জরাগ্রস্ত হল তখনও মধুসূদন কতকটা নাট্যরস স্বষ্টিতে সার্থক হয়েছেন।—

"শর্মি। আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্বনাশ কত্তে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তোমা অপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো? বুঝি আমার—(স্তব্ধ)।

শর্মি। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন! কেন, কেন, কি হলো?

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একেবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেই রূপ—(ভূমিতলে অচেতন হইয়া পতন)।

শর্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ, হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর!"

আকস্মিক গুরুতর বিপদ্‌পাতে শর্মিষ্ঠার চিত্তের তরঙ্গিত চাঞ্চল্য নিঃসন্দেহে নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত। অবশ্য দেবযানীর উপস্থিতিতে এরূপ ঘটলে এর নাট্যরসে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে বেধ সংযুক্ত হত, ঘনত্ব (Three dimensional effect) লাভ করত।

অপর দু একটি ক্ষেত্রে মূল নাট্যকাহিনীর সঙ্গে অসম্পৃক্ত কিছু চাঞ্চল্য স্বষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন মধুসূদন। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শর্মিষ্ঠার দাসীত্বের দীর্ঘ বিবরণ দেবার পরে কর্মহীন মন্থরতা ঘোচাবার উদ্দেশ্যেই কিছু উত্তেজনা সঞ্চার করা হয়েছে :—

"(নেপথ্যে রণবাদ্য, শঙ্খশব্দ ও হুহুঙ্কার ধ্বনি)

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন শত বজ্রশব্দের ন্যায় দুর্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্যে। উঃ কি ভয়ানক শব্দ?

বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হলো নাকি?

নেপথ্য। দৈত্যকুল সংহার কর। দৈত্যদেশ সংহার কর।

দৈত্য। অহো! একি প্রলয়কাল উপস্থিত, যেন সপ্তসমুদ্র ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচ্যে ?"

আবার তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যযাতি বিদূষকের কাছে গীতি-কবিতার ভাষায় শর্মিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রণয়াকূতি বিবৃত করার পরে দস্যু-নিগৃহীত এক ব্রাহ্মণের আগমনে দৃশ্যটির সমাপ্তি অংশ কিছু কর্মমুখর হয়ে উঠেছে—

"ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার সর্বনাশ হলো।

রাজা। কেন, কেন ? বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি ?

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার! কয়েকজন দুর্দ্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্যে। হায়! কি সর্ব্বনাশ! হে নরেশ্বর আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। (সরোষে) সে কি ? এ রাজ্যে এমন নির্দয় পাষণ্ড লোক কে আছে যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে ? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্তে সেই দুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ডবিধান করবো। (বিদূষকের প্রতি) সখে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বান ও অসিচর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি ?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর ?

বিদূ। (সত্রাসে) সে কি, মহারাজ ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি !"

কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হওয়ায় এই সব কৌশল নাট্য-সাফল্য লাভ করে নি।

শর্মিষ্ঠায় দু-একটি স্থানে সামান্যত হলেও নাট্যকৌশলের সহায়তায় কিছু নাটকীয় রস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন মধুসূদন। সংলাপাদি ব্যবহারে দুর্বলতার জন্য সাধারণত এই রসাবেদন আস্বাদ্য হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সতর্ক দৃষ্টিতে এদের সচেতন নাট্যকৌশলজাত বলে চেনা যাবে।

এক। যে দৃশ্যে (৩।২) যযাতি দেবযানীর প্রতি প্রণয়মূলক অনেক স্তুতিবাক্য বর্ষণ করেছে সেই একই দৃশ্যে, দেবযানীর প্রস্থানের অব্যবহিত পরে রাজ্ঞীর অজ্ঞাতনাম্নী পরিচারিকার রূপধ্যানে রাজা বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

রাজার ভ্রমরবৃত্তি একই দৃশ্যে অল্পকাল ব্যবধানে উল্লিখিত হওয়ায় কিছু নাট্যবক্রতার আস্বাদ এনেছে।

দুই। যে দৃশ্যে (৪।২) শুক্রাচার্য যযাতির শক্তি ও সম্পদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন, "আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্মই হয়েছে।" সেই দৃশ্যেই যযাতির নিষ্ঠুর আচরণে তাঁর সেই প্রাণাধিক কন্যাকে আমরা গৃহত্যাগিনী রূপে দেখতে পাই, সেই বহুপ্রশংসাধন্য নৃপতির প্রতি ঐ দৃশ্যেই শুক্রাচার্যকে কঠিন অভিপাশ বাণী উচ্চারণ করতে হয়।

তিন। পূর্বোক্ত দৃশ্যে (৪।২) ছদ্মবেশহেতু দেবযানীকে শুক্রাচার্যের প্রথমে চিনতে না পারা এবং মানসিক অস্থিরতার জন্য শুক্রাচার্যকে দেবযানীর চিনতে বিলম্ব হওয়া নাট্যদ্যোতনার সৃষ্টি করেছে (ছদ্মবেশহেতু পূর্ণিকাকে শুক্র চিনতে পারেন নি, কিন্তু পূর্ণিকা শুক্রাচার্যকে কেন চিনতে পারল না বোঝা কঠিন)।

তবে এ-জাতীয় কৌশলপূর্ণ নাট্য-মুহূর্তের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় সমগ্র রচনাটি নাট্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি।

প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের বিশিষ্ট নাট্যঅবদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এরিস্তোতল বলেছিলেন, তিনি "increased the number of actors to three."। নাট্যদৃশ্যে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এর ফলে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে বিচিত্রতা সৃষ্টির সুযোগ এল। দুইজনের মধ্যেকার কার্যসম্পাদন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে, দ্রুততা লাভ করতে পারে বা ভিন্নতর পথে পরিচালিত হতে পারে। আবার তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনীত সংবাদ অপর দুজনের মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিতে পারে, প্রতারণা উদ্ঘাটন করতে পারে। কিন্তু তৃতীয় চরিত্রের উদ্ভাবনের গভীরতর নাট্যতাৎপর্যের প্রতি E. F. Watling দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন;

> "But the matter goes deeper than a mere improvement in scene-construction. The essence of the three-actor scene is that the turn of events will depend on whether A will side with B or with C; whether the combined efforts of B and C will change A's purpose and so on.

A choice is to be made, and the choice will be determined by the nature, as well as the situation, of the person making it ; character, not predestined event, is now the focus of the drama. Thus, in the hands of Sophocles, drama became not only triangular, but three-dimensional ; to the length and breadth of mythical narrative he added the depth of human character as he observed it in his fellow mortals. What had hitherto been a frieze of more or less static figures confronting one another in profile became a perspective of living human beings reacting on one another and shaping their own destinies by the interplay of their contrasted characters."

মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকে তিন বা ততোধিক চরিত্র সমন্বিত দৃশ্যের অভাব লক্ষণীয়। প্রথম গর্ভাঙ্কে দুই ব্যক্তির কথোপকথন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথমাংশে দেবিকা ও শর্মিষ্ঠার আলাপ ; এদের প্রস্থানের পরে দেবযানী ও পূর্ণিকার কথোপকথন, শুক্রের আগমনের পূর্বেই দেবযানীর প্রস্থান, শুক্র-পূর্ণিকার আলাপ দেবযানীর প্রসঙ্গ নিয়ে দেবযানীর অনুপস্থিতিতে। ভিন্নবর্ণে তার বিবাহ দানে পিতা সম্মত হবেন কিনা সে বিষয়ে দেবযানীর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তার সাক্ষাতে এই আলোচনা নাটকীয় হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের অধিকাংশ দুইজন নাগরিকের কথোপকথনে পূর্ণ। এই দৃশ্যের শেষভাগে কপিল মুনির আগমনে চরিত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু এরা কেউ নাটকের মুখ্য পাত্র না হওয়ায় এবং নাগরিক দুজনের কোন স্বাতন্ত্র্য না থাকায় তিন অভিনেতা-সমন্বিত দৃশ্যের গভীরতা ও তাৎপর্য এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজা ও বিদূষকের আলাপ, একেবারে শেষদিকে বিদূষক রাজার মনোরঞ্জনের জন্য নটীকে নিয়ে এসেছে, দৌবারিক একটি সংবাদ নিয়ে এসেছে, কিন্তু পাত্র সংখ্যার দিক থেকে এই পরিস্থিতি কোন বিশিষ্টতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় নি। নটী বা দৌবারিক নাটকের চরিত্র হিসেবে একটি সংখ্যার বেশি কিছু নয়, এদের কোন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নাটকে প্রকাশিত নয়, প্রত্যাশিতও নয়। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে তিনজন নাগরিক এবং মন্ত্রীর সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু নাগরিকের সংখ্যা বৃদ্ধি নাট্যপ্রতিক্রিয়ার দিক থেকে তাৎপর্যহীন। তৃতীয় অঙ্কের

প্রথম গর্ভাঙ্কে মন্ত্রীর স্বগতোক্তি, প্রস্থান, তারপর বিদূষকের প্রবেশ, স্বগতোক্তি এবং প্রস্থান ঘটেছে। দুটি চরিত্রের সমাবেশও এ দৃশ্যে নেই। নাট্যদৃশ্য হিসেবে এটি তাই একান্ত মূল্যহীন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথমে যযাতি ও দেবযানীর প্রণয়ালাপ, খুব স্বল্পক্ষণের জন্য বিদূষকের উপস্থিতি পাত্রসংখ্যা দুই থেকে তিনে বাড়িয়ে তুলেছিল, কিন্তু দ্রুত দেবযানী প্রস্থান করায় নাট্যকার পাত্রসংখ্যা তিন থেকে আবার দুইয়ে নামিয়ে এনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এই দৃশ্যের পরবর্তী অংশ রাজা ও বিদূষকের আলাপ, দৃশ্য সমাপ্তির পূর্বে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ ঘটায় কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ব্রাহ্মণের সঙ্গে মূল নাট্যকাহিনীর সম্পর্ক না থাকায় এবং ব্রাহ্মণ চরিত্রটি একান্ত গৌণ, বৈশিষ্ট্যহীন ও প্রয়োজনহীন হওয়ায় এ ঘটনা সামান্য নাট্যচাঞ্চল্যের চেয়ে অধিক কোন তাৎপর্য বা গভীরতা সৃষ্টি করতে পারে নি। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বকাসুর-শর্মিষ্ঠার আলাপ, পরে শর্মিষ্ঠা-যযাতি সংবাদ, দেবিকা মুহূর্তের জন্য এসেছে মাত্র। লক্ষণীয়, নাট্যদ্বন্দ্বের উপরে দেবিকার কোন প্রভাব নেই। এমন কি বিদূষকের আগমন ঘটেছে এদের প্রস্থানের পরে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক জুড়ে রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন। দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম ভাগে শুক্রাচার্য-কপিলের আলাপ; পরে পূর্ণিকা ও দেবযানীর আলাপ, শুক্রাচার্য দৃশ্যে উপস্থিত থাকলেও ধ্যানমগ্ন থাকায় সে উপস্থিতি গণ্য হবার নয়। দেবযানী মূর্ছিত হবার পরে শুক্রের ধ্যান ভেঙ্গেছে, তখন শুক্র ও পূর্ণিকার বাক্যালাপ চলেছে অল্প সময় ধরে। পরে দেবযানীর মূর্ছা ভঙ্গে কথোপকথন হয়েছে পিতাপুত্রীর মধ্যে। লক্ষণীয়, সেই দীর্ঘ আলাপের মধ্যে পূর্ণিকা প্রায় কিছুই বলেনি, তার উপস্থিতি ব্যাপারটিকে কিছুমাত্র জটিল করতে পারে নি, নাট্যদ্বন্দ্বকে অধিকতর তরঙ্গিত করে তোলায় তার মৌন অবস্থিতি কিছুমাত্র সাহায্য করে নি। তৃতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথমে দেবিকার-প্রস্থানের পরে যযাতির প্রবেশ এবং যযাতি-শর্মিষ্ঠার প্রণয়সম্ভাষণ। জরাগ্রস্ত নৃপতি ও শর্মিষ্ঠা মঞ্চ ত্যাগ করার পরে বিদূষকের আগমন, বিদূষক-পরিচারিকা সংবাদ, পরিচারিকার প্রস্থান ও মন্ত্রীর প্রবেশ, মন্ত্রী-বিদূষকের আলাপ এবং উভয়ের প্রস্থান। তখন দেবযানী-পূর্ণিকার প্রবেশ ও কথোপকথন। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বিদূষক ও নাগরিকদের কথাবার্তা। নাগরিকদের সম্পর্কে পূর্বে যা বলেছি তাতেই প্রমাণিত নাগরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিজনিত বিচিত্র জটিলতা বা গভীরতা কিছুই সৃষ্টি করা যায় না। এই দৃশ্যে কিছু পরে মন্ত্রী প্রবেশ করেছে। মন্ত্রী, বিদূষক ও

নাগরিকদের নানামুখী কথোপকথনে জড়িয়ে পড়লে কিছুটা তরঙ্গচাঞ্চল্য সৃষ্ট হত। কিন্তু নাগরিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীই কথা বলেছে, বিদূষক মূলত নীরব থেকে জটিলতা বাড়ায় নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে প্রধান চরিত্রগুলি একত্রিত হয়েছে। সমগ্র নাটকে এই একটি মাত্র পরিস্থিতিতে এরূপ ব্যাপার ঘটেছে কিন্তু তখন সব কিছুর সমাধান হয়ে গিয়েছে, ঘটনার আর গতি নেই, সমস্যার আর অস্তিত্ব নেই, মনোবৃত্তিতে বিভিন্নমুখী তীব্রতা নেই; আশীর্বাণী উচ্চারণ, কুশলপ্রার্থনা শান্তরসের প্লাবন এনেছে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা চলে,—

এক। শেষ দৃশ্য ব্যতীত কোথাও মুখ্য পাত্রপাত্রীদের মধ্যে দুয়ের অধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ঘটে নি। প্রবৃত্তির সংঘর্ষ চলাকালীন বিপরীত প্রান্তস্থিত দুটি চরিত্রকেই মুখোমুখি দাঁড় করান নি নাট্যকার। শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর সাক্ষাৎকার একবারও হয় নি, বিবাদের পরে যযাতি দেবযানী সাক্ষাৎও ঘটেনি। এর ফলে নাট্যদ্বন্দ্ব যে কতটা দুর্বল এবং শিথিল হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। শুক্র-দেবযানী-শর্মিষ্ঠা, দেবযানী-শর্মিষ্ঠা-যযাতি, যযাতি-দেবযানী-শুক্র, যযাতি-শুক্র-শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি চরিত্র সমাবেশে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করা যেত। মধুসূদন তার কিছুমাত্র সুযোগ গ্রহণ করেন নি।

দুই। কয়েকটি ক্ষেত্রে মনে হয় কবি যেন সচেতন ভাবে এইরূপ দুয়ের অধিক চরিত্রের সমাবেশ এড়িয়ে চলেছেন। এক জোড়া চরিত্রের প্রস্থানের পরে আর এক জোড়া চরিত্র উপস্থিত করেছেন। কখনও তিনজন পাত্রপাত্রী উপস্থিত থাকলে একজনকে পরিপূর্ণ ভাবে নীরব রেখেছেন। যযাতি জরাগ্রস্ত হবার দৃশ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করেছে নাট্যরসের। দেবযানী মঞ্চে এসে শোক প্রকাশ করেছে পূর্ণিকার সামনে, জরাগ্রস্ত যযাতি তখন মঞ্চান্তরালে। যযাতি-শর্মিষ্ঠা-দেবযানীকে একত্র সন্নিবিষ্ট না করার জন্যই এইরূপ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এই প্রবণতাই নাট্যকারকে তিনজনের সাক্ষাৎকারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ উপস্থিত না করে বিবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে প্ররোচিত করেছে।

তিন। নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্রের সহগামী তিনটি চরিত্র সৃষ্ট করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে। রাজার যেমন বিদূষক, শর্মিষ্ঠার তেমনি দেবিকা এবং দেবযানীর পূর্ণিকা। নাটকের একটা বড় অংশ এই তিন জোড়া মানুষের অন্তরঙ্গ আলাপে পূর্ণ, অপর একটা বড় অংশ এদের কোন না কোন চরিত্রের স্বগতোক্তি। যে কথা মনে মনে আন্দোলিত করবার,

অত্যন্ত নিকট সুহৃদের সঙ্গে কথোপকথনে তা ধরা পড়ে, স্বগতোক্তিতে তা প্রকাশ পায়। ঐ তিনটি সহগামী চরিত্র সৃষ্টি করে মধুসূদন অনেকখানি গীতিরাজ্যের বিষয়কে নাট্যরূপ দিতে চেয়েছেন, এই নাটকের নাট্যরূপ তাই বহিরঙ্গ অতিক্রম করতে পারে নি।

॥ ছয় ॥

নাটকে নাট্যকারের আত্মপ্রতিফলন ঘটার অবকাশ কম। কিন্তু সে হল আদর্শের কথা। নাটক যেখানে সাফল্যের আদর্শ হয়ে ওঠে সেখানে নাট্যকার অন্তরালেই অবস্থান করেন, একথা মেনে নিলেও বহুক্ষেত্রে যে তার ব্যতিক্রমও ঘটে তাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে মধুসূদনের মত লেখকের (নাটক রচনা করলেও যাঁরা মূলত নাট্যস্বভাবের অধিকারী নন) নাট্যরচনায় আত্মপ্রতিবিম্বন ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শর্মিষ্ঠা নাটকের দিক থেকে, এর উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচারে এই সব অংশের এমন কিছু মূল্য নেই, কিন্তু কবির এই প্রথম রচনায় তাঁর অন্তর্দেশ কতটুকু ধরা পড়ল সে পরিচয় গ্রহণের তাৎপর্য আছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজা দেবযানীর প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা বলতে বলতে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। বিদূষক তাই নিয়ে কৌতুক করতে গিয়ে যা বলল তার মধ্য থেকে কবি-জীবনের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন ভেসে এল।—

"বিদূ। ও কি মহারাজ? যেরূপ ভাবোদয় দেখ্‌ছি, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন নাকি? (উচ্চহাস্য)

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্দেবীর কৃপাদৃষ্টি হলে দোষ কি?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) এমন কিছু নয়; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন? কেন?

বিদূ। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব?"

শর্মিষ্ঠা নাটকের পক্ষে এ আলাপ একান্তভাবেই অপ্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যহীন। কিন্তু মধুসূদনের সমগ্র জীবনসাধনা লক্ষ্মী-সরস্বতীকে একসূত্রে আবদ্ধ

করতে চেয়েছিল। সেই চাওয়া এবং না-পাওয়ার তীব্র আর্তিতে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ভারাক্রান্ত। এই কৌতুকসংলাপে সেই কবি-প্রাণকে উঁকি দিতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

কবি কপিলমুনিকে যযাতির রাজধানীতে প্রবেশ করিয়ে রাজপ্রাসাদের প্রভূত সম্পদ দর্শনে বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল করে তুলেছেন। "আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য!...কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয়বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ; নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকা-সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্যে, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।" পূর্বে দেখান হয়েছে কালিদাসের নাটকে বনবাসী তপস্বী শার্ঙ্গরব-শারদ্বত রাজধানীতে প্রবেশ করে অশুচি বোধ করেছে, তাদের ত্যাগপূত মনে ভোগমত্ততার ছায়াপাত বিরক্তি জন্মিয়েছে। কালিদাস ত্যাগমার্গ বা ভোগমার্গ কোনটিকেই অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তপস্বীদের মনোগত প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে চরিত্রনিষ্ঠ স্বাভাবিকতা সযত্নে বজায় রেখেছেন। কপিলমুনি ভোগীর দৃষ্টিতে এই ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়েছে, বঞ্চিত অরণ্যবাসীর দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ লোলুপতার স্পর্শও যেন লেগেছে। এমন কি তার গুরু শুক্রাচার্যও যযাতির ঐশ্বর্যে যথেষ্ট নির্বিকারত্ব দেখান নি (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)। আসলে মধুসূদনের মধ্যে এ ধরনের ভোগবাদ ছিল; ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ জীবনের এক আদর্শ রূপের কল্পনায় তিনি ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। এ সব ক্ষেত্রে চিত্রিত চরিত্রগুলির বিশিষ্টতার কথা ভুলে গিয়ে কবি আপন মনোভাবের রঙ্ তাদের উপর বর্ষণ করেছেন।

মধুসূদন শর্মিষ্ঠার কাহিনীটি নিয়ে মনে মনে তৃপ্তি পান নি। সংস্কৃত ক্লাসিকাল সাহিত্যের রাজ্য থেকে একে কিছুতেই জীবনের নৈকট্যদান করতে পারেন নি। পৌরাণিক কাহিনীটির মধ্যে প্রাচীন কালের মহিমাসমৃদ্ধ গাম্ভীর্যের সুরটি প্রকাশ পেলে কবি তৃপ্ত হতেন। কারণ সেই রসের রসিক ছিলেন মধুসূদন। কিন্তু আগেই দেখেছি শর্মিষ্ঠায় তা আদৌ ঘটে নি। মহাভারতের এই কাহিনীটি তাঁর হাতে ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যোচিত বিশিষ্ট রসের আয়োজন করেছে। কিন্তু সেই বিরলবীর্য, মন্থরগতি, প্রবৃত্তি-সংঘর্ষমুক্ত শুধুই সৌন্দর্য রসপানের অলসতা মধুসূদনকে স্বাচ্ছন্দ্য দিল না।

আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে এ কাহিনীকে যুক্ত করার কোনই সুযোগ তিনি পান নি, সে রকম সুযোগ সৃষ্টি করার উপযোগী মানস-পরিণতিও তিনি সে পর্যন্ত লাভ করেন নি।

যযাতি-দেবযানীর বিবাহ প্রসঙ্গে বর্ণভেদের জন্য কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সমকালীন সমাজচিন্তার এই প্রতিফলন বর্তমান নাটকে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ উক্ত বর্ণভেদের কোন প্রকৃত গুরুত্ব নাট্যমধ্যে সৃষ্টি করা হয় নি।

কালিদাস-শ্রীহর্ষের নাটকে নৃপতির বহুবিবাহ, বিবাহিতা পত্নীকে গোপন করে অপরের প্রতি আসক্তি উপভোগ্য রসবস্তুরূপে সহজেই পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একটা নীতিহীনতার প্রশ্ন এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই নীতিবোধ বিশেষ করে উনিশের শতকেই আমাদের সমাজজীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। মধুসূদন পাপপুণ্য, নীতিবোধ প্রভৃতি বিষয়ে চিরাচরিত ভারতীয় বিশ্বাসের কাছে বড় বেশি অনুগত ছিলেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নব্য মানবভাবনা এবং সমাজসংস্কার-সাধনার সঙ্গে যুক্ত নব্য নীতিবোধের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। কালিদাসাদির অনুসরণে যে নাট্যকাহিনী তিনি গড়ে তুলেছেন তাতে উক্ত নৈতিক প্রশ্নটি তীব্র হয়ে দেখা দেয় নি। দেবযানীর কাছে যযাতির অন্যাসক্তি দুরাচারের লক্ষণ বলে প্রতিভাত হলেও, শুক্রাচার্য এই বহুপত্নীবরণকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন, মেনে নেবার পরামর্শই দিয়েছেন কন্যাকে; দেবযানীর আচরণ ঈর্ষাপরায়ণা রমণীর ব্যবহার বলে গণ্য হয়েছে, চারপাশের সমাজে যযাতির দ্বিতীয় বিবাহে নীতিহীনতার কোন অভিযোগ ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি।

কোন কোন সমালোচক শর্মিষ্ঠার চরিত্রে রেনেসাঁসের ধর্ম খুঁজে পেয়েছেন; এ-আবিষ্কার পর্যাপ্ত যুক্তির দ্বারা নিশ্চিত নয়। শর্মিষ্ঠার কল্যাণী সর্বংসহা রূপে বাঙালী রমণীর চিরকালীন কোমলাখ্য চরিত্রধর্ম প্রতিফলিত।

আসলে শর্মিষ্ঠায় আধুনিক যুগের রক্তসঞ্চালন যেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে নি, তেমনি পৌরাণিক রাজ্যের মহিমা, বিপুলতা ও বর্ণাঢ্যতার স্পর্শ চিত্তকে জাগ্রত ও সমুন্নত করে তোলে নি। এ নাটক একটা কৃত্রিম সাহিত্যলোকের অলস জীবনযাত্রার মন্থর কামুকতার ছায়া বহন করে আনে মাত্র।

॥ সাত ॥

সাহিত্যকর্মের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সংলাপই নাটকের প্রাণ। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে দৃশ্যপট সর্বদা দর্শকদের মনকে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে রাখে, পাত্রপাত্রীর পোষাক-পরিচ্ছদ, মুখভঙ্গি, অঙ্গসঞ্চালন, কণ্ঠস্বর ও তার উত্থানপতন সংলাপের ভাষার সঙ্গে মিলে দর্শকদের মনে চরিত্রগুলির সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা মুদ্রিত করে দেয়। অনেক দুর্বল সংলাপও অভিনয় ও উপস্থাপনগুণে মনোহরণে সমর্থ হয়। কিন্তু সাহিত্য হিসেবে পাঠ করার সময়ে যদি দৃশ্যের প্রারম্ভে স্থানকালের বিশিষ্টতার উল্লেখও থাকে তাহলেও সমস্ত দৃশ্যটি জুড়ে পাঠক চিত্তে তা প্রত্যক্ষবৎ জীবন্ত থাকে না। শুধু সংলাপের ভাষার জোরেই (উপন্যাস-গল্পের মত পোষাকপরিচ্ছদ, আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ নাটকের চরিত্রবোধে সাহায্য করে না) কোন ব্যক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্য, আকৃতি-প্রকৃতি সব কিছুই প্রকাশ করতে হয়। সংলাপের মধ্য দিয়েই কাহিনী অগ্রসর হয়; দ্বন্দ্বকে ধরে রাখে সংলাপ। বিভিন্ন চরিত্রের স্বভাবগত পার্থক্য সংলাপের ভাষায় ধরা পড়ে।

মধুসূদনের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠার সংলাপ বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

এই নাটকের সংলাপে সংস্কৃত ভাষা ও সংলাপরীতির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। ভাষা তৎসম শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ সুপ্রচুর। অর্থালঙ্কারের ব্যবহার এত বেশি যে স্বাভাবিক বাংলা ভাষার প্রাণরস এখানে স্ফূর্তি পায় নি। অতিমাত্রায় কবিত্ব, বহু প্রচলিত এবং জীর্ণ উপমাদির মুহুর্মুহু ব্যবহার, অকারণ দৈর্ঘ্য, সংঘাতরসের অভাব, স্বগোতোক্তির অতিব্যবহার এবং মন্থরতার অন্যতম কারণ যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রভাব একথা মেনে নিতেই হবে। তবে কবির ব্যক্তিগত প্রবণতাও নাট্য-সংলাপের এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কম দায়ী নয়। সংস্কৃতরীতির অত্যধিক আনুগত্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকলেও মধুসূদনের শিল্পী-স্বভাবে নাট্যধর্মের তুলনায় কাব্যধর্মের আধিপত্যের কথাও ভুললে চলবে না।

নাটকের সংলাপে কথ্যভাষার আদল না থাকলে তা একান্ত কৃত্রিম হয়ে পড়ে। মধুসূদন তাঁর এই প্রথম নাটকে কথ্যভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তিনি 'কচ্যে', 'হচ্যে', 'বরবে', 'রয়েছে' প্রভৃতি চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। 'দেখে', 'করে', প্রভৃতি অভিশ্রুত পদের

প্রয়োগ লক্ষণীয়। এ বিষয়ে সংলাপের ভাষায় মোটামুটি সুসঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। সেকালের পক্ষে এ সিদ্ধি প্রশংসনীয়। অনেক পরবর্তী কালের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট হলেও ক্রিয়াপদে সাধু-চলিতের মিশ্রণও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। বাংলা গদ্যে তখন পর্যন্ত 'হুতোমপেঁচার নক্‌সা' রচিত ও প্রকাশিত হয় নি। আদ্যন্ত কথ্য ক্রিয়াপদ ও অভিশ্রুত শব্দের সুসঙ্গত প্রয়োগ এই গ্রন্থের পূর্বে প্রাপ্তব্য ছিল না। শর্মিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শব্দ ও বাক্যবিন্যাসে সহজ ও চলিত রীতি অনুসৃত হলেও কথ্য ক্রিয়াপদাদি ব্যবহারে সুসঙ্গত রীতিনিষ্ঠা প্রকাশ পায় নি। মধুসূদন এই নাটকের সংলাপে চলিত ভাষা ব্যবহার করেন নি, বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতির তিনি উত্তর-সাধক; কথ্য ক্রিয়াপদ ও অভিশ্রুত শব্দের ব্যবহারে কথ্যভাষার কিঞ্চিৎ বিভ্রম তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

বিদ্যাসাগরের ভাষা—

"অধিক আর কি বলিব, তার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া পরে জীবনদান করিয়াছেন; অথবা মনে মনে মনোনীত উপকরণ সামগ্রী সকল সঙ্কলিত করিয়া মনে মনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথাস্থানে বিন্যাসপূর্ব্বক, মনে মনেই তাহার শরীরনির্ম্মাণ করিয়াছেন; হস্তদ্বারা নির্ম্মিত হইলে, শরীরের সেরূপ মার্দ্দব ও রূপলাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভবিত না। ফলতঃ ভাই রে সে এক অভূতপূর্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি।...তাহার রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল কুসুম স্বরূপ, নখাঘাত বর্জ্জিত নবপল্লবস্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্নস্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধুস্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড ফলস্বরূপ, জানি না কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্ম্মল রূপের ভোগ আছে।"

—[শকুন্তলা]

মধুসূদনের ভাষা—

"আমরা যখন গোদাবরী-তীরস্থ পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল বিহার করি, তখন একদিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্যে কত্যে এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোলবিন্যাস করে অশোক বৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; আর তার চারিদিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হতে

লাগলো, যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন। পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিনী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো।"

কালিদাসের নাটকের ভাষা—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্যযোগা
 রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্ন সৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
 ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥
... ...

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ—
 রণাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
 ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥

বিদ্যাসাগরের ভাষার কাঠামোয়ই যে মধুসূদন তাঁর এই গদ্যরীতি গড়ে তুলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে বিদ্যাসাগর শব্দাদির ক্ষেত্রে, সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারে সংস্কৃতানুগ হয়েও ভাষায় এক ধরনের মাধুর্য বিস্তার করেছেন, মধুসূদনে সেই মাধুর্যটুকুর অভাব চোখে পড়ে। ফলে কবির গদ্যে সংস্কৃতানুকারিতার পরিমাণ আরও বেশি বলে মনে হয়।

মধুসূদনের গদ্যভাষার স্থবিরতা দৃষ্টি এড়াবার নয়। এর কারণ দুটি। প্রথমত, অর্থালঙ্কারের অতিব্যবহার; দ্বিতীয়ত, বাক্‌বিন্যাসে প্রত্যক্ষ মনোভাব প্রকাশের স্থলে আলঙ্কারিক বক্রতার আধিক্য। ফলে ভাব অর্থালঙ্কারে জড়িয়ে চিত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, বাক্যে বাক্যে বহু চিত্রের সমাবেশ ঘটায় কিংবা নানা বক্র পন্থা পরিক্রমা করে। ভাবের লক্ষ্যে পৌঁছবার এ জাতীয় তাগিদহীন বিলাস ভাষার গতিসৃষ্টিতে সম্পূর্ণত ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংস্কৃত ভাষায় গতি নেই, সংস্কৃত নাটকের কল্পনামূলে কাব্যধর্ম অধিক, নাট্যধর্মের গতিশীলতার প্রতি ঝোঁক বড় নেই। নাটকের সংলাপ গতিমুখ্য হওয়া চাই। শর্মিষ্ঠার ভাষার ব্যর্থতা একে নাট্যগুণচ্যুত করেছে। সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতি স্বভাবত মন্থরগতি, তাই য়ুরোপীয় ধারার নাট্যগুণ এই ভাষায় সঞ্চারিত করা একরূপ অসম্ভব। বাংলা চলিত গদ্যে যুগপৎ

দুলকি চালের দ্রুতগতি এবং অলস মন্থরতা প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু শর্মিষ্ঠা রচনার যুগে চলিতরীতির গদ্যরচনার কথা প্রায় ভাবা যায় না।

বর্ণনাতিরেকও সচরাচর অনাটকীয় মন্থরতার সৃষ্টি করে। শর্মিষ্ঠার মন্থরতার জন্য বর্ণনা-প্রাধান্য ও ভাষাচিত্রের প্রাচুর্য বিশেষভাবে দায়ী। আসলে মধুসূদনের কবিস্বভাব বর্ণনা ও চিত্র-সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করবার তাগিদে এ-জাতীয় সংলাপকে আদর্শ বলে মনে করেছে। যে বর্ণন মূলত কাব্যকল্পনার সৃষ্টি গদ্যে তাকে প্রকাশ করতে গেলে বক্তব্য-অংশ পরিস্ফুট হতে পারে, কিন্তু উপলব্ধ আবেগটুকু—যা স্বভাবত কাব্যছন্দের দোলায় ধরা পড়তে পারে—পুরোই বাদ পড়ে যাবে। শর্মিষ্ঠার নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাধর্মী সংলাপ;

> "ঐ দেখুন কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্চে! অহো!—একি মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? অহো! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্চে! মহাশয়, একবার রথসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্চে। কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ম্ম সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদ্গীরণ কচ্চে!"

এবং মেঘনাদবধ কাব্যের প্রায় সমজাতীয় চিত্রের তুলনা করলেই এদের আবেদনগত পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রায় একজাতীয় উপাদান, কল্পনার প্রায় একই ভঙ্গি ছন্দে সমর্পিত হয়ে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে—

> কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে
> সাগর তরঙ্গ যথা পবন তাড়নে
> দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
> চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
> অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
> দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
> কালদণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
> রতনে খচিত কেতু উড়ে শতশত
> তেজস্কর।

ছন্দে সমর্পণ করে কবি এক্ষেত্রে তাঁর চিত্রকে গতিশীল করে তুলেছেন, এর স্থবিরতা ঘুচিয়েছেন আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে, শব্দচয়নের

কৌশলে তরঙ্গ-বন্ধুরতা এনেছেন, শিথিল আলস্য ভেঙেছে এই বর্ণনায়। আসলে কবির কল্পনার প্রকৃতিই কাব্যিক।

প্রকৃতি-বর্ণনার আধিক্য শর্মিষ্ঠায় আছে। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব কবি প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করেছেন। নাট্যে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এরা য়ুরোপীয় নাট্যরীতির সমর্থকদের কাছে নিন্দিত হবে। কবি নিজেও এক পত্রে লিখেছিলেন, "In the Sarmistha, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere poet. I often forgot the real in search of the poetical." নাটকে সংস্কৃতানুগ গদ্যে যে নিসর্গবর্ণনা প্রাণহীন প্রথানুগত্য এবং বর্ণহীন একঘেয়েমী, কাব্যে তাই-ই উপভোগ্য। যেমন—"সূর্য্যদেবতা প্রায় অস্তগত হলেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারিদিক হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসছে; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায়; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ আপনাদের বিরহ সময় সন্নিহিত দেখে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্চে, মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি প্রদানের উদ্‌যোগে ব্যস্ত; দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্চে।" এই শুষ্ক বিবরণ ছন্দোবদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে—

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরস বদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে,
গোষ্ঠগৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হাম্বারবে।
আইলা সুচারু তারা শশী-সহ হাসি,
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রাদেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিরাম লভিলা।।

কাব্যাংশের মধ্যে ভাবের যে পূর্ণতা, খণ্ড বস্তু থেকে অখণ্ডের দিকে বিস্তার, এবং ব্যঞ্জনাধর্ম আস্বাদ্য, গদ্যে তার সন্ধান নেই; বস্তু-অংশ আছে রস-অংশ নির্বাসিত। আসলে কবি মধুসূদন নাটকের মধ্যে গদ্যভাষায় কাব্য-সৃষ্টির সুযোগ খুঁজেছেন। কারণ তখনও অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরের কবিপ্রকৃতির পূর্ণ জাগরণ ঘটে নি।

ভাষাগত দুর্বলতা থাকলেও এবং নাটকীয়তার পক্ষে হানিকর হলেও এই নাটকের নিসর্গ বর্ণনাগুলি একান্ত তাৎপর্যহীন নয়। শুধুমাত্র পরিবেশ-পরিচিতিই তাদের উদ্দেশ্য নয়, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত রচনার কাজে কবি তাদের প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ায়, বিরহ বেদনাতুর প্রকৃতির পটভূমি সর্বগৌরবচ্যুতা দাসীত্বে বন্দিনী শর্মিষ্ঠার চরিত্রদ্যোতনা এনেছে, আবার চন্দ্রালোকিত রাত্রির উল্লাস দেবযানীর নব প্রেমব্যাকুলতার সুরটিকে ধরে রেখেছে। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)। আবার তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠা-সাক্ষাৎকারের কিছু পূর্বে যযাতি রাজান্তঃপুরের উদ্যানের যে বর্ণনা দিয়েছেন, "স্থানটি কি রমণীয়! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডপ কি সুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড তপন-তাপ যেন দেব-কোপাগ্নির ন্যায় বসুমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকর প্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে এখানেই স্নিগ্ধচিত্তে বিরাজ করচেন..." তা যেন শর্মিষ্ঠার প্রশান্ত চরিত্রের যোগ্য ভূমিকা রচনা করেছে।

কনগ্রিভ স্বগতোক্তির কার্য ও সার্থকতা বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তাঁর 'Double Dealer'-নাটকের মুখবন্ধে।

"I grant that for a man to talk himself appears absurd and unnatural ; and indeed it is so in most cases ; but the circumstances which may attend the occasion make great alteration. It oftentimes happen to a man to have designs which require him to himself, and in their nature cannot admit of a confident. Such, for certain, is all villainy ; and other less mischievous intentions may be very improper to be communicated to a second person. In such a case, therefore the audience must observe, whether the person

upon the stage takes any notice of them at all, or no. For if he supposes any one to be by when he talks to himself, it is monstrous and ridiculous to the last degree. Nay, not only in this case, but in any part of a play, if their is expressed any knowledge of an audience, it is insufferable. But otherwise, when a man in soliloquy reasons with himself, and pros and cons and weigh all his designs, we ought not to imagine that this man either talks to us or to himself ; he is only thinking, and thinking such matter as were inexcusable folly in him to speak. But because we are concealed spectators of the plot in agitation, and the poet finds it necessary to let us know the whole mystery of his contrivance, he is willing to inform us of this person's thoughts ; and to that end is forced to make use of the expedient of speech, no other better way being yet invented for the communication of thought."

স্বগতোক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং সীমাবদ্ধতা বিষয়ে বেশ স্পষ্টভাবেই লেখক নিজের অভিমত বিবৃত করেছেন। আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তি বর্জন করবার দিকেই ঝোঁক পড়েছে, এবং তা সঙ্গত কারণেই। কিন্তু এতকাল (মধুসূদনের কাল পর্যন্ত তো বটেই) দেশী-বিদেশী উভয় রীতির নাট্যকলায় স্বগত-সংলাপের সংস্থান ঘটেছে। তবে নাট্যকার পর্যাপ্ত নাট্যবোধের পরিচয় দিতে না পারলে স্বগতভাষণ নাটকের ভার বাড়ায় এরূপ অজস্র উদাহরণ আছে।

মধুসূদনের শর্মিষ্ঠায় স্বগতোক্তির অতিরেক লক্ষ্য করা যায়। এর কতটা প্রয়োজন ছিল আর কতটাই বা শুধুই ভাবোচ্ছ্বাস, অকারণ কবিত্ব প্রকাশ করবার জন্য আমন্ত্রিত তার বিচার প্রয়োজন।

এক। অপরের সম্মুখে, তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তির স্বগতোক্তিকে কনগ্রিভ হাস্যকর ও চরম অসঙ্গত বলেছেন। শর্মিষ্ঠায় এরূপ স্বগতোক্তির অভাব নেই। উদাহরণ হিসেবে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের শর্মিষ্ঠা-যযাতির সাক্ষাৎকারের কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। যযাতির কথায় শর্মিষ্ঠা নিজের মনে বলেছে, "আহা, প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী!—হা

অন্তঃকরণ তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?" "হা হৃদয়, তোর মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে?" যযাতির সামনে এই সব স্বগতোক্তি হাস্যকর। প্রথমত এই কথাগুলি তুলে দিলেও শর্মিষ্ঠার ব্রীড়া ও তৃষ্ণার মনোভাব কিছুমাত্র অপ্রকাশিত থাকত না। মনের এ-জাতীয় অনুভূতি দু-একটি অর্ধব্যক্ত কথায়, কিছু ভাবে-ভঙ্গিতে প্রকাশ পাবার সামগ্রী, স্পষ্ট সংলাপের ভাষায় নয়। এখানে নাটকের স্বগত-সংলাপ শর্মিষ্ঠার মনের যে অনুভূতিটুকু টেনে বের করে ভাষারূপ দিয়েছে তাতে নাটকীয় সংলাপের অধিকার নেই, এ জাতীয় স্বগতোক্তি গীতিকবিতার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের নিদর্শন। এরূপ উদাহরণ আরও সংকলন করা যেতে পারে। ঐ একই দৃশ্যে আবার যযাতি অন্তরাল থেকে শর্মিষ্ঠার আত্মসম্বরণে অসমর্থ উচ্ছ্বসিত উক্তি শুনে নিজের মনে বলেছে, "এ কি আশ্চর্য! এ যে সেই দৈত্যরাজ দুহিতা শর্মিষ্ঠা! কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না।" এ সংবাদ পাঠকদের কাছে কিছুমাত্র অজ্ঞাত নয়, স্বগতোক্তি হিসেবে এর অপ্রয়োজনীয়তা পাঠক-দর্শকের শিল্পবুদ্ধিকে আহত করে।

শর্মিষ্ঠায় প্রকৃতি-বর্ণনামূলক দীর্ঘ স্বগত-ভাষণ স্থান পেয়েছে। কবিত্বের মনোভাবই এদের জন্ম দিয়েছে, নাট্যচেতনা নয়। বিদূষক যে সব স্বগতোক্তি করেছে তার লক্ষ্য স্থূল হাস্যরস বিতরণ, নাট্যকাহিনীর সঙ্গে যেমন তা সম্পর্করহিত তেমনি অকৃত্রিম আত্মচিন্তার লক্ষণ তাতে নেই। কৃত্রিম ভাবনার মালা সাজিয়ে হাস্যরসসৃজনের উদ্দেশ্যেই এদের আনা হয়েছে। মন্ত্রীর স্বগতোক্তি (৩।১) ঘটনার ছিন্নসূত্র সংযোজনের চেষ্টা করেছে; বলা বাহুল্য এ জাতীয় চেষ্টা নাট্যগুণের দিক থেকে দুর্বলতার চিহ্নবাহী। সেক্‌সপীয়রের নাটকে স্বগতোক্তির যে সব উচ্চাঙ্গের নিদর্শন আছে সেখানে কোন বিশিষ্ট পাত্রের অন্তরের তীব্র হাহাকার, প্রবৃত্তির সংক্ষোভ, জীবনসম্পৃক্ত একান্ত ব্যক্তিক কোন উপলব্ধি প্রকাশিত। তার সামান্যতম প্রতিফলন শর্মিষ্ঠার স্বগতোক্তিতে নেই।

স্বগতোক্তি প্রসঙ্গে এই নাটকের অপর একটি কৌশলের কথাও মনে পড়বে। নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রীদের সহগামী এমন একটি করে চরিত্রের (বিদূষক, দেবিকা, পূর্ণিকা প্রভৃতি) সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মুখ্য চরিত্রগুলি আত্মোদ্ঘাটনের সহজ পথ খুঁজে পায়। প্রিয়তম সুহৃদের নিকট নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করা প্রায় আত্মগুঞ্জরণের সমপর্যায়ভুক্ত। স্বগতভাষণের আধিক্য কমিয়ে এই উপায়ে তাকে কিছুটা কথোপকথনের আকার দেওয়া

যেতে পারে, তাই প্রাচীনকাল থেকেই এই পদ্ধতিটির বহুল প্রচলন।[৮]

সংলাপের নাটকীয়তা নির্ভর করে কয়েকটি লক্ষণের উপরে।—

এক। সাধারণত সংলাপ সংক্ষিপ্ত হবে, প্রত্যক্ষ হবে। দীর্ঘ সংলাপে বর্ণনা, অপ্রত্যক্ষ বিবৃতি, অকারণ কবিত্ব প্রভৃতির প্রবেশ ঘটে সহজেই। স্বাভাবিক কথোপকথনের ভাবটি বিনষ্ট হয়ে যায়; প্লট বা চরিত্র বা পাত্রপাত্রীর অনুভূতি তথা বিশেষ বিশেষ মুডের দ্রুত গতিশীলতার স্থানে আসে মন্থরতা। শর্মিষ্ঠার সংলাপে সাধারণত দৈর্ঘ্য কিছু বেশি, বিশেষ করে স্বগত সংলাপগুলি আয়তনে বড়। বাগ্‌বিস্তার, অতিঅলঙ্করণ এবং ভাবোচ্ছ্বাস এর জন্য দায়ী। নাট্যকারের কবি-স্বভাব এই বিচ্যুতির পিছনেও সক্রিয়। দীর্ঘাকার সংলাপও অবশ্য নাট্যমধ্যে প্রবেশাধিকার পেতে পারে, কিন্তু তার ভাষা ভাবাবেগকে দ্রুত বহন করে নিয়ে যাবে। তার মধ্যে তরঙ্গোদ্বেলতা অনুভব করা যাবে। এমন কি বিস্তৃত বক্তৃতাও উৎকৃষ্ট নাট্যসংলাপ রূপে স্বীকৃতি পেতে পারে যদি তার মধ্যে উপরোক্ত গুণগুলি বর্তমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের এণ্টনির দীর্ঘ বক্তৃতার কথা স্মরণ করা চলে। সে বক্তৃতাব মধ্যে বক্তার এবং শুধুমাত্র বক্তার নয় একটা বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তবৃত্তির উদ্বেলতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় তরঙ্গিত ভাবটি চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের দরবার-দৃশ্যে ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘ সংলাপের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। মহৎ নাট্যপ্রতিভা সংলাপের দৈর্ঘ্যকেও বিচিত্র নাট্যরসে সরস করে তুলতে পারেন। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠার সংলাপে দৈর্ঘ্যই আছে, নাট্যরস নেই বললেই চলে।

দুই। নাটকের প্রাণ হল দ্বন্দ্বে। দ্বন্দ্ব তাই নাটকীয় সংলাপেরও প্রাণ। এই দ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোভাবের বৈপরীত্যের ফলস্বরূপ দেখা দিতে পারে; আবার বাস্তব ঘটনা ও চিত্তপ্রবণতার সংঘাতজাতও হতে পারে। শর্মিষ্ঠায় কচিৎ নাট্যদ্বন্দ্ব দানা বেঁধেছে, সে সব ক্ষেত্রে সংলাপেও কিছু পরিমাণ সংঘর্ষ দেখা যায়। পূর্বে এ-বিষয়ের আলোচনা হয়েছে।

তিন। সংলাপের ভাষা কর্মের বাহন হবে। বিবৃতি বা বর্ণনা তার লক্ষ্য নয়। বিবৃতি থাকলেও কর্মের মুখরতা সেখানে কথার দেয়ালে আঘাত করে ফিরলেই নাট্যসংলাপ হিসেবে তার সার্থকতা। শর্মিষ্ঠার ভাষায় সেই আদর্শ সংলাপের লক্ষণ নেই। বিবৃতি এখানে প্রধান এবং

প্রত্যক্ষ কর্ম থেকে দূরে নিশ্চিন্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে লুপ্ত। প্রত্যক্ষ কর্মজগৎ থেকে এই নাট্য-কল্পনার জগৎ যেন দূরে অবস্থান করে। এখানে ভাষা তাই কর্মের উত্থান-পতন ও গতির ব্যঞ্জনা বহন করে না।

চার। নাটকীয় সংলাপ চরিত্রের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ধরে রাখবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। প্রধান পাত্রপাত্রীদের মুখভঙ্গিও যেন তাদের ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং নাট্যকার দূরে থাকেন, সৃষ্ট চরিত্র নিয়ে যেমন পুতুল নাচের খেলা খেলেন না, তেমনি তাদের বিচিত্র কণ্ঠে শুধু নিজের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত দেখতে চান না। শর্মিষ্ঠায় মুখ্য পাত্রপাত্রীদের কোনরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই কবির কল্পনায় ধরা দেয় নি। একমাত্র অসঙ্গত প্রলাপ, ভোজনরসিকতা প্রভৃতির জন্য বিদূষকের সংলাপ বিশিষ্টতা পেয়েছে। আসলে নানা পাত্রপাত্রীর কণ্ঠে কবি মধুসূদনের ভাষাই আমরা শুনতে পাই, তাদের উচ্ছ্বাসে-কবিত্বে-সংলাপদৈর্ঘ্যে ও আলঙ্কারিকতায় মধুসূদনের ব্যক্তিত্বই অনেকাংশে পড়া যায়।

পাঁচ। নাটকীয় সংলাপের প্রধান অংশই অপরের সঙ্গে আলাপ ও কথোপকথনে প্রকাশিত। মনে ভাবের যত গভীর উচ্ছ্বাসই তরঙ্গিত হোক না কেন, তার সবটুকু নাটকীয় সংলাপে প্রকাশযোগ্য নয়। কতটুকু প্রকাশযোগ্য তা পরিস্থিতি, পরিবেশ ও উপস্থিত অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে বক্তার সম্পর্কের উপরে নির্ভর করে। সেই প্রকাশযোগ্য অংশটুকুর মধ্যেই অবশ্য মনোভাবের সব গভীরতা ও চাঞ্চল্যটুকু প্রতিফলিত হবে। সেক্‌সপীয়রের নাটকে এরূপ নাট্যরসসমৃদ্ধ সংলাপের নিদর্শন মুহুর্মুহু মিলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতেও এ জাতীয় অত্যুচ্চ নাট্যগুণান্বিত সংলাপের সুপ্রচুর উদাহরণ আছে। কচিৎ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' বা 'নূরজাহানে' অনুরূপ দু'একটি সংলাপ চোখে পড়বে। কিন্তু মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকে এ জাতীয় সংলাপ নেই। একবার মাত্র দেবযানীর কথায় কবি অজ্ঞাতসারে এই ধরনের বাক্য প্রযুক্ত করেছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে রাজা শর্মিষ্ঠাকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করা সম্পর্কে দেবযানীর অনুমতি চাইলেন।

"রাজা।...কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল?

দেবযানী। (সহাস্যমুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?"

নাট্যকার সচেতন হলে 'সহাস্যমুখে' কথাটি ব্যবহার করতেন না। এই বাক্যটির অন্তরে কিছু জ্বালা লুকিয়ে আছে, অভিমান আছে, অপমানবোধ আছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুকে মেনে নেবার প্রসন্নতা প্রদর্শনেরও

প্রয়োজন আছে। অভিনেত্রী এখানে কিরূপ মুখভঙ্গি করবেন তা অত সহজে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ নাটকীয় সংহত সংলাপ শর্মিষ্ঠায় আর একটিও নেই বললেই হয়।

॥ আট ॥

কোন নাট্যকর্মের সাফল্যের চরম নিরিখ তার চরিত্রচিত্রণ। ঘটনা যতই নাটকীয় হোক, যতই তরঙ্গচাঞ্চল্য এদের মধ্যে দেখা যাক, চরিত্রচিত্রণের সার্থকতার সঙ্গে যুক্ত না হলে তা বালসুলভতায় পরিণত হতে বাধ্য।[১] হ্যামলেট নাটকে কি ঘটনা ঘটল তার উপরে এর মাহাত্ম্য ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে নি, কে সেই ঘটনা ঘটাল, কাদের হৃদয় সেই ঘটনাস্রোতে আন্দোলিত হল, তার উপরেই এই নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল। চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে শর্মিষ্ঠা নাটকের মূল্য সামান্য বলেই বিবেচিত হবে। পূর্ববর্তী নাটকগুলির তুলনায় এর সাফল্যের পরিমাণ অধিক হতে পারে, কিন্তু তার জোরে কোন স্থায়ী সাহিত্যমূল্য দাবী করার অধিকার এ নাটকের নেই। এটি কবির প্রথম রচনা। নাটকাকারে কাহিনী বিবৃত করা, নিজের অন্তরের উচ্ছ্বসিত কবিত্বের জন্য ভাষার দ্বার খুলে দেওয়া—এই দুটিই ছিল কবির অভিপ্রায়। কাজেই খুব প্রত্যাশা নিয়ে এই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া চলে না।

প্রথমত, শর্মিষ্ঠা নাটকের চরিত্রচিত্রণে উনবিংশ শতকের নব্য মানবভাবনা প্রতিফলিত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে নবজাগৃতির দৃষ্টিতে আবিষ্কার করা নূতন যুগের বাংলা সাহিত্যের পুরোধা মধুসূদনের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। নব্য চরিত্রভাবনার প্রথমতম সর্ত তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। ভাল-মন্দ-পাপ-পুণ্যের মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার না করে ব্যক্তি হিসেবে তার দিকে তাকানোই নব যুগ-লক্ষণ। নিজের অন্তরের তাগিদে—সামাজিক, নৈতিক— সর্ববিধ বাধা লঙ্ঘনের শক্তি নবযুগের সাহিত্যেই নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি-চরিত্রের অতলস্পর্শী গভীরতায় প্রবেশের দরজা এই কালেই প্রথম উন্মুক্ত হয়। এই নব্য সৃজনধারার পথিকৃৎ মধুসূদনও কিন্তু শর্মিষ্ঠায় এ পথে আদৌ পদার্পণ করতে চান নি। এই নাটকের অধিকাংশ মুখ্য চরিত্রে তাই শ্রেণীলক্ষণ প্রবল, ব্যক্তি-লক্ষণ নয়।

দ্বিতীয়ত, মহাভারত থেকে কাহিনী ও চরিত্রগুলির পরিচয় গ্রহণ করেছেন নাট্যকার, কিন্তু মহাভারতোচিত বিশিষ্টতা কোন চরিত্রে কিছুমাত্র রক্ষিত হয় নি। মহাভারতের চরিত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে

ব্যক্তি-বিশিষ্টতা ও রূঢ় বলিষ্ঠতা আছে, মধুসূদন সেদিকে কিছুমাত্র আকর্ষণ বোধ করেন নি। যযাতির চরিত্রের যে চিত্র মহাকবি ব্যাস এঁকেছেন তাতে প্রবল ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিচয় আছে। বহুপত্নীকত্বেই শুধু নয়, নিজের তরুণ পুত্রদের উপরে জরাভার চাপিয়ে দিয়ে যৌবনসুখসম্ভোগের মধ্যে চরিত্রের যে ভোগলোলুপতা প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা নেই।

দুই পত্নীতে সীমাবদ্ধ না থেকে এই ভোগবাসনা কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল মহাভারতে তার বিবরণ আছে। মহাভারতকার যযাতি-কাহিনীর পরিশিষ্টে তাঁর প্রজ্ঞার যে পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়াসক্তির সম্পর্ক নির্ণয় করা কিছু দুরূহ। মধুসূদন এই চরিত্রটিকে সংস্কৃত নাটকের প্রেমিক নায়ক চরিত্ররূপে দাঁড় করিয়েছেন। শর্মিষ্ঠা চরিত্রটি মহাভারতে দম্ভ, তেজ এবং দুঃখবরণের সাহস নিয়ে দেখা দিয়েছে। সে গুরুকন্যার তিরস্কারের জবাবে গায়ের জোর প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না, তাকে মেরে ফেলেছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়, আবার দেশ ও জাতির উপকারার্থে দাসীত্ব বরণেও বিলম্ব করে না। যযাতির প্রতি আপনার কামবাসনা প্রকাশ করতে গিয়েও সে তার চরিত্রের যে পরিচয় দিয়েছে তাকে কিছুতেই ব্রীড়াকুণ্ঠিত ও নম্র বলা চলে না। এ চরিত্র-পরিকল্পনায়ও মহাভারতের বিষয়বস্তু মাত্র গ্রহণ করে মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের কোমলস্বভাব প্রণয়ভিত্তিক নায়িকাচরিত্রের আদর্শই অনুসরণ করেছেন। মহাভারতকারের দেবযানীর চরিত্রটি একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই নারী যতটা উদ্ধত স্বভাব তার চেয়ে অনেক বেশি প্রেমের মন্ত্রে অশঙ্কিনী, প্রাগ্রসর এবং স্বতন্ত্রা। কচকে যেভাবে সে দৈত্যদের ক্রোধ থেকে রক্ষা করে অবশেষে প্রণয় নিবেদন করেছে এবং পরবর্তীকালে যেভাবে যযাতিকে তার দক্ষিণ হস্ত ধরে উদ্ধার করার অনুরোধ করে পরে সেই কারণ দেখিয়ে তাকে বিবাহ করতে রাজাকে একরূপ বাধ্য করেছে তা বিস্ময়কর। মধুসূদন মহাভারতীয় চরিত্র-কল্পনার সেই বিচিত্র, জটিলতার প্রতি কিছুমাত্র সম্মান না দেখিয়ে সংস্কৃত ত্রিকোণ-প্রণয় নাটকের জ্যেষ্ঠা মহিষীর আদলে তাকে গড়ে তুলেছেন। মাধব্য সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের হুবহু অনুকৃতি, নামটি পর্যন্ত কালিদাসের শকুন্তলা থেকে গ্রহণ করা।

তৃতীয়ত, মধুসূদনসৃষ্ট চরিত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে নি। মৃত পুরাতন নাট্যধারার অনুসরণ এর অন্যতম কারণ, এদের অনেকেরই আচার-আচরণ সংস্কৃত নাটকের প্রথার পথ ধরে চলেছে। ব্যক্তিগত

জীবনোপভোগকে বরণ করে নি। তার উপরে মুখের ভাষাভঙ্গির জড় কৃত্রিমতাও এদের প্রাণহীনতার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত নাটকের নায়কচরিত্রের লক্ষণ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে A. B. Keith বলেছেন,

> "His good qualities are innumerable, he must be modest···, handsome, generous···, prompt and skilled in action, affable, beloved of his people, of high family, ready of speech and steadfast. He must be young, and endowed with intelligence, energy, a good memory, skill in the arts, and just pride ; a hero, firm, glorious, skilled in the sciences, and an observer of law."[১০]

মোটামুটি এই আদর্শই মধুসূদন অনুসরণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের নাট্যকারের কাছে এর চেয়ে পরিহার্য আদর্শ আর কিছুই হতে পারে না। ফলে যে চরিত্র তাঁর হাতে গড়ে উঠল তা একান্তভাবেই কৃত্রিম। যযাতিকে আমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, দুর্বলচিত্ত এবং শিথিল চরিত্রের ব্যক্তি হিসেবেই এখানে পেয়েছি। এক কথায় অপদার্থ, কর্মহীন, বহু নারীকামী মানুষ বলেই তাকে মনে হয়। তার রাজকীয় মাহাত্ম্য বা গৌরব অপরাপর নানা চরিত্রের বর্ণনায় থাকলেও, চরিত্রে তার চিহ্নমাত্র নেই। একবার ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে তাকে শস্ত্রপাণি করে তোলা হয়েছে। কিন্তু এই পরিকল্পনাটুকুর কৃত্রিমতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। এই ঘটনাটি নাট্যকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা যায় নি, তা ছাড়া তস্কর বিতাড়নে রাজকীয় শক্তিমত্তা কিছু প্রকাশ পায় নি। দুষ্মন্তের চরিত্রের ইন্দ্রিয়দুর্বলতার মধ্যেও রাজকীয়তা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন কালিদাস, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বর্ণনা ছাড়াও সফলভাবেই তার বীর্যবত্তার প্রতি ইঙ্গিত করাও হয়েছিল। কিন্তু যযাতির চরিত্রে ভোগবাসনার অতিরেক, পত্নীর প্রতি প্রণয় নিবেদন ও পত্নীর সহচরীর প্রতি কামবাসনার অনুভব, তরুণ পুত্রকে আপন জরাভারে প্রপীড়িত করে ভোগপোযোগী যৌবনের অধিকার লাভ বৈচিত্র্যহীন ও জটিলতাহীন ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতাকে তার ব্যক্তিত্বের একক কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর ধনবিলাসী ভোগতৎপর 'বাবু' শ্রেণীর সঙ্গে এচরিত্রের সাদৃশ্য হয়ত দুর্লক্ষ্য নয়।

শর্মিষ্ঠা চরিত্রটিতে এক প্রশান্ত কল্যাণময়ীর রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। দেবযানীর দাসীরূপে প্রথমে তাঁর সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু "শর্মিষ্ঠা তখন দাসী এবং সহিষ্ণুতায় ও ধৈর্য্যে শর্মিষ্ঠা তখন তপস্বিনী।" এ জাতীয় চরিত্রকল্পনা মধুসূদনের নিজস্ব। সংস্কৃত নাটকের কোমলপ্রাণ মুগ্ধা নায়িকার আদর্শটি এক্ষেত্রে অনুসৃত হলেও, চিত্তের সর্ব সংক্ষোভ সংহরণ করে প্রশান্তি অবলম্বন এবং পরম শত্রু সম্পর্কেও কল্যাণচিন্তা কবি স্বয়ং কল্পনা করে নিয়েছেন। এ বিষয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন,

> "শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠা করে তুলতে গিয়ে মধুসূদন তাকে উনিশ শতকীয় বাঙালি কল্পনার কল্যাণীত্বের আধার করে তুলেছেন।··· প্রণয়িনীর এই তপস্বিনী মূর্তি ভারতীয় স্বপ্ন-কল্পনার,—উনিশ শতকীয় নারীকেন্দ্রিক পরিবার-জীবনের প্রেমিক বাঙালির ধ্যানের কল্পমূর্তি।"[১১]

শর্মিষ্ঠার চরিত্রের প্রথম দিকে যে প্রশান্ত ধৈর্য ও কল্যাণী রূপ ধরা পড়েছে তাকে বাঙালির উনিশ শতকের ভাবনার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত করার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সর্বংসহা ভাবটি ভারতীয় নারীত্বের আদর্শরূপে বহু প্রাচীনকাল থেকেই পূজিত হয়ে আসছে

তবে কোন চরিত্রে নিবৃত্তিবোধকে বড় করে তোলার কোন বিশেষ প্রবণতা কবির থাকার কথা নয়, বরং বিপরীত প্রান্তের দিকে কিছু ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। সেই ঝোঁক পরিণত হতে কিছু সময় লেগেছে। লক্ষণীয়, সেই পরিণতির যুগেও মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা চরিত্রে একটি সর্বংসহা ধৈর্য এবং কল্যাণপূত প্রশান্তির চমৎকার চিত্র কবি এঁকেছেন; সে পরিণতি শর্মিষ্ঠায় না থাকলেও তার পূর্বাভাস আছে।

কিন্তু যযাতির প্রতি প্রণয়ে শর্মিষ্ঠার এই মৌন সহনশীলতাকে বিচলিত হতে কবি দেখেছেন। সেই চিত্তোদ্বেলতা না থাকলে এই চরিত্রকল্পনা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যেত। বকাসুরের সঙ্গে আলাপে শর্মিষ্ঠা চরিত্রের একটি বিশেষ প্রান্ত আলোকিত হয়েছে। দেবযানীর দাসীত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পিতৃগৃহে ফিরে যাবার যে সুযোগ এসেছিল তা সে প্রত্যাখ্যান করেছে। বেদনার তীব্র দাহ অন্তরে পোষণ করে, দাসীত্বের লাঞ্ছনা বহন করেও সে যযাতির রাজধানী ছেড়ে যেতে চায় নি। যযাতির প্রতি প্রণয় নিবেদনের কথা তখনও ছিল তার কল্পনার বাইরে। এই মৌন প্রেমই তার অন্তরে সর্ববিধ অপমান, দুঃখ-ভোগ সহ্য করার শক্তি দিয়েছে। নারী-প্রেমের এই

শক্তির বিচিত্র মূর্তি সম্বন্ধে কবি বীরাঙ্গনায় পূর্ণ সচেতন হয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠায় তার অপরিণত পূর্বরূপ অঙ্কিত।

শর্মিষ্ঠার তুলনায় দেবযানী সু-অঙ্কিত। যযাতির প্রণয়িনী-মহিষী রূপে তার যে পরিচয় নাট্যকার দিয়েছেন, সেখানে প্রথানুগত্যের দ্বারা প্রাণধর্ম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। যযাতিকর্তৃক প্রেমবিষয়ে প্রতারিত হয়ে দেবযানী যখন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েছে তখনই তার চরিত্র প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যযাতি তার প্রেমকে অপমান করায় দেবযানী যে ভাষায় তাকে ধিক্কার দিয়েছে তা হিন্দু রমণীর স্বামীভক্তির সীমায় বদ্ধ হয়ে থাকে নি, থাকে নি বলেই তার আন্তরিকতায় সন্দেহ জাগে না। এই নাটকের কেন্দ্রগত নৈতিক সমস্যাটি মধুসূদন জীবন্তভাবে উপলব্ধি করেন নি, শুক্রাচার্য তাকে কোন সমস্যা বলেই স্বীকার করেন নি, কিন্তু দেবযানীর আর্তনাদে অবহেলিতা নারীর বেদনা উচ্ছ্বসিত ঝংকার তুলেছে। এই অপমানবোধ ও ক্রোধকে অবলম্বন করেই তার চরিত্র একটা ব্যক্তিত্বের স্পর্শলাভ করেছে।

দেবযানী চরিত্রের সুন্দর পরিচয় আঁকা হয়েছে যযাতির জরাগ্রস্ততার অব্যবহিত পরে। যযাতিকে অভিশপ্ত করার জন্য সে পিতাকে বাধ্য করেছে, কিন্তু প্রকৃতই যযাতি যখন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ল তখন তার ক্রোধ অকস্মাৎ গভীর বেদনায় রূপান্তরিত হল। মধুসূদন এই পরিবর্তন সাধন করে যথেষ্ট মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

শুক্রাচার্যের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ আছে, বিকাশ নেই। বোঝা যায় শর্মিষ্ঠাকে দাসীত্বে নিয়োগ করার পিছনে তার স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতা ছিল না, কিন্তু কন্যা দেবযানীর প্রতি অত্যধিক স্নেহদুর্বলতায় সেই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁকে করতে হয়েছে। যযাতিকে অভিশপ্ত করার পূর্বে তিনি যে দ্বিধায় পড়েছিলেন তার স্পষ্ট ছবি কবি এঁকেছেন। দেবযানীর স্বামী-নিন্দায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, যযাতির ন্যায় বহু গুণসম্পন্ন নরপতিকে তিনি অভিশাপ দিতে রাজী হন নি। কিন্তু দেবযানীর প্রতি তাঁর পিতৃস্নেহ সব বিচারকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এর গুণেই শুক্রাচার্য বেশ প্রাণবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

বিদূষক চরিত্রপ্রসঙ্গে কীথ তাঁর "The Sanskrit Drama" বইয়ে বলেছেন,

"The king's confident and devoted friend is the Vidusaka, a Brahmin, ludicrous alike in dress, speech and behaviour. He is a mishappen dwarf, bald headed with projecting teeth and red eyes, who makes himself ridiculous by his silly chatter in Prakrit, and his greed for food and presents of every kind. It is a regular part of the play for the other characters to make fun of him, but he is always by the king's side, and the latter makes him his confident in all his affairs of the heart ..."

শর্মিষ্ঠা নাটকের মাধব্যের আকৃতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ মধুসূদন করেন নি, কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় দিয়েছেন তা একান্তভাবেই উপরের মন্তব্যের অনুগামী। তার ভোজনলোলুপতা স্থূল হাস্যরসের উপকরণ যুগিয়েছে। একটি দৃশ্যে বিদূষকের ভোজনব্যাপার নিয়ে কৌতুক করতে গিয়ে কবি কিছু কল্পনা-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। লোভনীয় ভোজ্যবস্তু চুরি করে চুরির পাপ স্খালন করেছে নিজেই তা ভোজন করে। কারণ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোয় পাপ দূরীভূত হয় এবং সে নিজে একজন ব্রাহ্মণ। এই চিত্রে স্থূলতা থাকলেও কিছু নূতনত্বও আছে। মূল নাট্যকাহিনীর সঙ্গে কোনাদক দিয়েই এই ব্যক্তিটি নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে নি। তবে- লক্ষণীয়, কবি একাধিক দৃশ্যে নটীর প্রতি তার মনোভাবের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে হাস্যকর অসঙ্গতির সঙ্গেই কিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়াসক্তির ইঙ্গিত মিলছে।

শর্মিষ্ঠার সাফল্যের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু জয়ের উল্লাসে কবি-চিত্তের সুপ্তি বিচলিত হয়েছে। অথচ তাঁর কবিপ্রাণ নাট্যরাজ্যের দেয়ালে মাথা খুঁড়েছে, মুক্তির পথ পায় নি। অমিত্রাক্ষরের ছন্দ-গঙ্গা ভাগীরথী হয়ে সর্ববাধা ঘোচাবার সংবাদ আনে নি।

২গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "After his (অর্থাৎ মধুসূদনের) admission to the first rehearsal and before he had

entered upon his task of the English translation of the Ratnavali Modhu, with his partiality for English taste exclaimed to me (aside), 'What a pity, the Rajahs should have spent such a lot of money on such miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your theatre'. I laughed at the idea of his offering to write a Bengali play, and chaffingly asked if it was his wish to see us introduce a wretched Vidya Sundar on our stage. Conscious of the dearth of really good plays in our language, he could not but feel the sting of my remark as a home-thrust and simply muttered, 'We shall see, we shall see".

[২]গৌরদাসকে এক চিঠিতে মধুসূদন লিখছেন, "Ramnarayan's version as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ramnarayan to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any....He has made my poor girls talk d-d cold prose".

[৩]মধুসূদনকে লেখা রাজনারায়ণ বসুর এই সমালোচনাত্মক পত্রখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, "Sermista is exactly after the pure classical model, is in many places full of sterling poetry, and displays considerable knowledge of human nature ! I shall never forget the sweet resigning spirit of the gentle Sermista, the tender interview between her and the king, the pathetic meeting between Devajani and her father and the mean tiresome jokes of the clown".

[৪]কবিরাজ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "সাহিত্য দর্পণে" কাব্য-নাট্যাদির দোষ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লিখিত দোষগুলির পরিচয় দিয়েছেন,

"দুঃশ্রবত্বম্—পরুষবর্ণতয়া শ্রুতিদুঃখাবহত্বং দুঃশ্রবত্বম্। যথা, 'কর্ত্তার্থ্যং যাতু তন্বঙ্গী কদানঙ্গবশংবদা'।

বক্তরি ক্রোধসংযুক্তে তথা বাচ্যে সমুদ্ধতে।
রৌদ্রাদৌ তু রসেঽত্যন্তং দুঃশ্রবত্বং গুণং ভবেৎ ॥

যথা, 'উৎকৃত্যোৎকৃত্য কৃত্তিমিত্যাদি' (উত্তর রামচরিতম্)

নিহিতার্থত্বম্—নিহিতার্থত্বমুভয়ার্থস্য শব্দস্যাপ্রসিদ্ধেঽর্থে প্রয়োগঃ। যথা, 'যমুনাশম্বরমম্বরং ব্যতানীৎ।' শম্বর শব্দো দৈত্যে প্রসিদ্ধ ইহ তু জলে নিহতার্থঃ।

অবিমৃষ্টবিধেয়াংশভাবঃ—'স্বর্গগ্রামটিকাবিলুণ্ঠনবৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ' অত্র বৃথাত্বং বিধেয়ং তচ্চ সমাসে গুণীভাবাদনুবাদ্যত্বপ্রতীতিকৃৎ।

চ্যুতসংস্কারত্বম্—'গাণ্ডীবী কনকশিলানিভং ভুজাভ্যামাজঘ্নে বিষম-বিলোচনস্য বক্ষঃ'। 'আঙোযমহনঃ স্বাঙ্গকর্মকাচ্চেতি' অনুশাসনবলাদাঙ্পূর্বস্য হনঃ স্বাঙ্গকর্মকস্যৈবাত্মনেপদং নিয়মিতম্। ইহ তু তল্লঙ্ঘিতমিতি ব্যাকরণ লক্ষণহীনত্বাৎ চ্যুতসংস্কারত্বম্।"

[৫]এই নূতন ভূমিকাভিনেতা (কৃষ্ণধন) সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ গৌরদাসকে লিখেছেন,—"He or she, as you might choose to call, is a real acquisition. To a melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to hear, and to crown all, he is daily showing a capacity for the stage..."

[৬]রবীন্দ্রনাথ 'কাদম্বরীচিত্র' (প্রাচীন সাহিত্য) নামক প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের গল্পকথনরীতির মন্থরতা বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন, "গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক—ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভারের মত বহন করিয়া চলিতে হয়, তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না।...দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহ্য শোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধহয় সর্বদা চলাফেরার জন্য সে হয় নাই—বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হোক, কিন্তু কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মতো বিরাজ করিতে থাকে।"

[৭]নাটকে না হলেও মধুসূদনের কাব্যে কিন্তু এই পৌরাণিক রস বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে। ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, "The honest reader of Meghnadbadh Kavya, I mean

one with no critical axe to grind, must look for the ancientness in the spirit of the whole poem till he believes that the modern age is not so modern and what is ancient is not so archaic, and he is encouraged in this effort by a quick realisation of two very important things about the poem : first, that it does not use mythology as a subtle allegory to dramatize a new social reality and secondly, it is not just mythography in elegant verse. Here the Gods are like the Gods of Homer, not hopelessly divine, and demons shed human tears, here the walls of a city of gold smoulder and fall in a battle-fire raised by the monkey army of a mendicant prince who is clad in bark, and all creation, the waves of the sea or the sands on its shore, the gorgeous throne-room or the bare camps are instinct with a life such as it appeared to the eye of an elder world." (Our Divine Language—Michael's Achievement in verse. : The sunday Hindusthan Standard, March 22, 1959) উদ্ধৃতাংশটি অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখিত 'মাইকেল রচনা সম্ভারে'র ভূমিকা থেকে গৃহীত। প্রমথনাথ বিশী একেই বলেছেন "প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বর"।

[৮] "...the soliloquy is often more or less successfully disguised by being turned into a speech addressed to some listener who is brought forward for the purpose. The so-called confident originated in the Chorus of Greek tragedy, and passed thence through Seneca into the drama of the Renaissance under the form of the intimate friend, or nurse, or some such person to whom the speaker without restraint, could unburden his soul." (—Hudson : An Introduction to the study of English literature.)

[৯] "Story and incident and situation in theatrical work are, unless related to character, comparatively childish and unintellectual. They should indeed be only another phase of the development of character." (—Henry Arthur Jones : The Renascence of the English Drama.)

[১০] The Sanskrit Drama.

[১১] ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়

পদ্মাবতী

আত্মছলনা

॥ এক ॥

বাঘ একবার রক্তের আস্বাদ পেয়ে সুপ্তি থেকে জেগে উঠেছে। তার কর্ম-তৎপরতায় বাধা দেবে কোন্ শক্তি?—এই ভাষায় কবি পদ্মাবতী রচনাকালীন তাঁর মনোভাব একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন[১]। শর্মিষ্ঠার অভিনয়প্রস্তুতি তখন সাড়ম্বরে চলছে। পরিচিত মহলে মধুসূদনের সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এই উত্তাপকে জুড়িয়ে যেতে দেবেন না কবি, দ্রুত দ্বিতীয় নাটক লিখতে লাগলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে পদ্মাবতীর চার অঙ্ক লিখে ফেললেন। কোন এক অজ্ঞাতনামা সখের দলের জন্য এই নাটকটি লেখা হয়েছিল, একথা তিনি নিজে বলেছেন। কিন্তু কোন সখের দল কর্তৃক নাটকটি রচনার অব্যবহিত পরে অভিনীত হয়েছিল এমন সংবাদ পাওয়া যায় না। মনে হয় এ নাটকটি রচনার সময়েও কবি বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। এই কারণেই নাট্যকাহিনীর সংক্ষিপ্তসার এবং নাটকের সমাপ্ত অংশ সঙ্গে সঙ্গে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের প্রধান ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করতেন। কিন্তু বেলগাছিয়ায় তখন তাঁর প্রথম নাটকের প্রস্তুতি চলছিল, কাজেই সে-কথা মুখ ফুটে বলা সম্ভব হয় নি।

শর্মিষ্ঠা নাটক প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। নব্য নাট্যকলার নিদর্শন হিসেবেও এ গ্রন্থকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন অনেকে। মধুসূদন নিজেও মুখে যতই বিদেশী সৌরভের কথা বলুন না কেন অন্তরে অন্তরে ঠিকই বুঝতেন যে এ নাটক সম্পূর্ণত সংস্কৃতরীতির বশীভূত। তিনি ভদ্রার্জ্জুন-কীর্তিবিলাসের নাট্যকারদের চেয়ে অনেক ভালভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যরীতির অন্তরের পার্থক্যটি বুঝতেন, সম্ভবত সমকালের অন্য পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালির চেয়ে কিছু বেশিই বুঝতেন। তাঁর সমগ্র হৃদয় অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল শর্মিষ্ঠার মত নাটক লিখতে। (অবশ্য সঠিক বলা সম্ভব নয় এ বিষয়ে তিনি কতটা সচেতনভাবে ভেবেছিলেন; তবে সচেতন-অবচেতন মিলিয়ে তাঁর সমগ্র কবিসত্তায় যে ধূমায়িত প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই।) কিন্তু প্রকৃত পাশ্চাত্ত্য নাটকের রস বাংলা নাটকে নিয়ে আসবার উপায় কি? সংস্কৃত

নাট্যরসে শিক্ষিত বাঙালির মন তখন আকণ্ঠ নিমগ্ন। নাটকাভিনয় জনরুচিকে অবহেলা করতে সচরাচর সাহসী হয় নি। এই পরিবেশে কবি পদ্মাবতীর পরিকল্পনা করলেন। নাট্যসাহিত্যকে পাশ্চাত্ত্যমুখী করবার ব্যাকুলতা এবং সমকালীন বাঙালির নাট্যরুচিকে আঘাত করবার সাহসের অভাব এই পরিকল্পনার পিছনে সক্রিয়। পাশ্চাত্ত্যরীতিকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত ও প্রকাশ করার আরও কিছু বাধা থাকা সম্ভব। তার মধ্যে জাতীয় জীবনযাত্রায় সংঘাত-প্রাধান্য ও ঘটনাবহুলতার অভাব, কবিচিত্তের কবিত্বের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ এবং অত অল্পসময়ের (শর্মিষ্ঠা মাত্র কয়েক মাস আগে লেখা হয়েছে) মধ্যে বাংলা ভাষায় ইংরেজী ধরনের নাটকীয়তা সৃজনের অক্ষমতা প্রভৃতি কারণ নিশ্চয় আছে। মধুসূদন পদ্মাবতীতে আত্মছলনা করলেন। কাহিনীটি পাশ্চাত্ত্য পুরাণের রাজ্য থেকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু উপস্থাপন এবং রসনিবেদনের দিক থেকে তিনি সংস্কৃত নাটকের সীমা লঙ্ঘন করতে চাইলেন না।

পদ্মাবতী নাটকে গ্রীক পুরাণ থেকে কাহিনী সঙ্কলন করেছেন কবি। এ ঘটনা বাংলা নাট্যসাহিত্যে অভিনব। এর পূর্বে বিদেশি নাটকের অনুবাদের একটিমাত্র চেষ্টা হয়েছে হরচন্দ্র ঘোষের "চারুমুখ চিত্তহারায়"। সে চেষ্টা কোনদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়। মধুসূদন মৌলিক নাটক লিখতে গিয়ে গ্রীক কাহিনী গ্রহণ করলেন। বলা যেতে পারে গ্রীক কাহিনী-রসকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যে একাকার করে মিশিয়ে দিতে চাইলেন। পূর্ববর্তী নাটকে ভারতীয় পুরাণ-কাহিনী অনুসরণ করে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেই একই পথে পরিক্রমা করে পূর্ব খ্যাতিকে বৃদ্ধি করার চেষ্টাই সাহিত্যিক-শিল্পীদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নিন্দিত হবার ভয় থাকা সত্ত্বেও মধুসূদন সম্পূর্ণ নূতন পথে পা বাড়ালেন।[২] নূতন পথ তাঁর নিজের পূর্ব সৃষ্টির দিক থেকে—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্যের দিক থেকে—বাঙালির সামগ্রিক সাহিত্যিক রুচির ব্যাপারেও। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে মধুসূদন কাব্যসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যরীতিকে বিস্ময়কর সমগ্রতায় আত্মস্থ করে অপূর্ব চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রকাশ করলেও কাহিনী-ভিত্তির ক্ষেত্রে এ দেশীয় পুরাণাদির অনুগতই থেকেছেন। ওভিদের আদর্শে বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিত হলেও তার কাহিনী ও চরিত্রগুলি প্রধানত রামায়ণ-মহাভারত থেকে সঙ্কলিত। মেঘনাদবধ কাব্যের জীবনদৃষ্টির পশ্চাতে গ্রীক জীবনবোধ যতটাই থাক না কেন, মিল্টনের ছন্দোভঙ্গির যত অনুসরণ থাক, কাহিনী ও চরিত্রগুলি

রামায়ণের অন্তর্গত। কাজেই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে পদ্মাবতী নাটকের কাহিনীটি গ্রীক পুরাণ থেকে নেওয়া হল কেন? তাঁর সাহিত্যজীবনে বিদেশি কাহিনীকে আত্মসাৎ করে বাংলা কাহিনীকে সমৃদ্ধ করার কোনরূপ সাধনা ছিল বলে জানা যায় না। কাজেই কবি কোন বিশিষ্ট কারণেই যে এই পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আসলে অন্যভাবে যখন পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি ও নাটকীয় রস সঞ্চার সম্ভব হচ্ছে না, তখন পাশ্চাত্ত্য কাহিনীর সাহায্যে মনের অন্দরমহলে কিছুটা তৃপ্তি লাভের চেষ্টা একধরনের আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। পদ্মাবতীতে নাটকীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা শর্মিষ্ঠার তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতরীতি ও রসের পুরো প্রভাব এখনো বজায় থেকেছে। এখন পর্যন্ত নাট্যকলাগত সমুন্নতি পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, কোন গুণগত স্বাতন্ত্র্য আসে নি। প্রকৃত নাটকীয় সাফল্য থেকে পদ্মাবতীব স্রষ্টা মধুসূদনেব অবস্থান এখনও বহু দূরে।

॥ দুই ॥

পদ্মাবতী নাটক প্রসঙ্গে বাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে কবি লিখেছেন, "I am sure, I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised." কবি গ্রীক কাহিনী অবলম্বনে এই নূতন প্লটটি গড়ে তুলে মনে মনে যথেষ্ট খুশি হয়েছিলেন, "All that I can tell you is that there are few prettier plots in any drama that you have read! I invented it one blessed Sunday."[৩] সম্ভবত তাঁব প্রিয় গ্রীক কাহিনীর সাহায্য নিতে পারায় তিনি এতটা উল্লসিত হয়েছিলেন।

গ্রীক পুবাণে স্বর্ণ আপেলেব গল্পটি যে ভাবে বিবৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার এখানে উদ্ধাব করা হল, তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য। ট্রয়ের রাজকুমাব প্রায়ামের পুত্র প্যারিস জন্মমুহূর্তেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। কারণ তার জন্মের পূর্বে ভবিষ্যদ্বক্তারা ঘোষণা করেছিল যে নবজাত কোন ট্রয়কুমার থেকেই ভবিষ্যতে এই সুন্দরী নগরীর পতন হবে। প্রায়াম সদ্যোজাত প্যারিসকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু কোন উপায়ে সে রক্ষা পায় এবং এজেলাউস নামক রাখালের পুত্ররূপে বড় হতে থাকে। ক্রমে প্যারিস যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং বীরত্ব ও সৌন্দর্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা

অর্জন করে। নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির জন্যও অলিম্পিয়াবাসী দেবকুল তার প্রতি প্রীত হন। এদিকে এরিস স্বর্ণনির্মিত একটি আপেলে "শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর জন্য" কথাগুলি লিখে এক বিবাহসভায় নিক্ষেপ করে। হেরা, আথেনী এবং আফ্রোদিতি তিন জনেই এই সম্মানের দাবি করে। জিউস এই প্রতিযোগিতার বিচারভার অর্পণ করলেন প্যারিসের উপরে।

"He (অর্থাৎ প্যারিস) was herding his cattle on· Mount Gargarus, the highest peak of Ida, when Hermes, accompanied by Hera, Athene, and Aphrodite, delivered the golden apple and Zeus's message : 'Paris, since you are as handsome as you are wise in affairs of the heart, Zeus commands you to judge which of these goddesses is the fairest.'

Paris accepted the apple doubtfully. 'How can a simple cattleman like myself become an arbitrator of divine beauty ?' he cried, 'I shall divide this apple between all three'.

'No, no, you cannot disobey Almighty Zeus !' Hermes replied hurriedly. 'Nor am I authorized to give you advice. Use your native intelligence !'

'So be it', sighed Paris. 'But first I beg the loosers not to be vexed with me. I am only a human being, liable to make the stupidest mistakes.'

The goddesses all agreed to abide by his decision.

'Will it be enough to judge them as they are ?' Paris asked Hermes, 'or should they be naked ?'

'The rules of the contest are for you to decide,' Hermes answered with a discreet smile.

'In that case, will they kindly disrobe ?'

Hermes told the goddesses to do so, and politely turned his back.

Aphrodite was soon ready, but Athene insisted that she

should remove the famous magic girdle which gave her an unfair advantage by making everyone fall in love with the wearer. 'Very well', said Aphrodite spitefully, 'I will, on condition that you remove your helmet—you look hideous without it.'

'Now, if you please I must judge you one at a time,' announced Paris, 'to avoid distractive arguments. Come here, Divine Hera ! Will you other two goddesses be good enough to leave us for a while ?'

'Examine me conscientiously', said Hera, turning slowly around, and displaying her magnificent figure, 'and remember that if you judge me the fairest, I will make you lord of all Asia, and the richest man alive.'

'I am not to be bribed, my Lady....Very well, thank you. Now I have seen all that I need to see. Come, Divine Athene.'

'Here I am,' said Athene, striding purposefully forward. 'Listen, Paris, if you have enough commonsense to award me the prize, I will make you victorious in all your battles, as well as the handsomest and wisest man of the world.'

'I am a humble herdsman, not a soldier,' said Paris. 'You can see for yourself that peace reigns throughout Lydia and Phrygia, and that king Priam's sovereignty is uncontested. But I promise to consider fairly your claim to the apple. Now you are at liberty to put on your clothes and helmet again. Is Aphrodite ready ?'

'Aphrodite sidled up to him, and Paris blushed because she came so close that they were almost touching.

'Look carefully, please, pass nothing over....By the way, as soon as I saw you, I said to myself : "Upon my word,

there goes the handsomest young man in Phrygia! Why does he waste himself here in the wilderness herding stupid cattle?" Well, why do you Paris? Why not move into a city and lead a civilized life? What have you to lose by marrying someone like Helen of sparta, who is as beautiful as I am, and no less passionate? I am convinced that, once you two have met, she will abandon her home, her family, everything, to become your mistress.......'

'Would you swear to that?' Paris asked excitedly.

Aphrodite uttered a solemn oath, and Paris, without a second thought, awarded her the golden apple.

By this judgement he incurred the smothered hatred of both Hera and Athene, who went off arm-in-arm to plot the destruction of Troy, while Aphrodite with a naughty smile, stood wondering how best to keep her promise.

—[The Greek Myths Vol 2 by Robert Graves.]

এই ঘটনার অল্পকাল পরে প্যারিসের সত্য পরিচয় প্রকাশ পেল এবং রাজপ্রাসাদে সে সাদরে গৃহীত হল। প্যারিস হেলেনলাভের বাসনার আগুন আপন হৃদয়ে প্রজ্জলিত রাখল। কিছুকাল পরে সে স্পার্টা গমন করল এবং হেলেনের স্বামী মেনেলিউসের আতিথ্য গ্রহণ করে হেলেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন মেনেলিউসের অনুপস্থিতির সুযোগে হেলেনকে নিয়ে পলায়ন করল। ট্রয় দুর্গে হেলেন ও প্যারিস সাদর অভ্যর্থনা পেল। এই ঘটনা থেকেই সূত্রপাত হল দশবর্ষ ব্যাপী ট্রয়যুদ্ধের। গ্রীসের নৃপতিবৃন্দ হেলেনের পিতার কাছে পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করবার জন্য মেনেলিউসের ভ্রাতা আগামেমননের নেতৃত্বে ট্রয় আক্রমণ করল। তারা দশ বৎসরকাল ট্রয় অবরোধ করে রইল। অবশেষে ট্রয়ের পতন হল।

মধুসূদন গ্রীক কাহিনীটিকে গ্রহণ করে ভারতীয় বেশে তাকে উপস্থিত করলেন দর্শক পাঠকদের দরবারে। কাজটি খুব সহজ ছিল না। পদ্মাবতী

নাটকটিও কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোক এরূপ ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল। গ্রীক পুরাণকথাকে নাট্যরূপে একেবারে ভারতীয় করে না তুলতে পারলে সমকালীন কোন রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের কাছেই যে তা সহজে সমাদৃত হবে না এ কথাটি তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন। এ বিষয়ে মধুসূদনের কৃতিত্ব মোটামুটি স্বীকার্য যে তাঁর নাটকে গ্রীক কাহিনীর গ্রীকত্ব বহুলাংশে বিসর্জিত হয়েছে। রচনাটির অভারতীয় প্রাণধর্ম কবি অনেকাংশে ঢেকে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রথমত, লক্ষণীয়, গ্রীক কাহিনীটির অংশবিশেষ মাত্র তিনি গ্রহণ করেছেন। তিন দেবীর মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা। নৃপতিকে বিচারকরূপে মনোনয়ন। তিন দেবীরই শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর মর্যাদা লাভে উৎসুক হয়ে বিচারককে প্রলোভিত করতে চাওয়া। প্রেমের দেবীর প্রতিশ্রুত প্রলোভনে বিচারকের বিহ্বল হয়ে তাকেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে মনোনয়ন। প্রেমের দেবীর চেষ্টায় বিচারকের সুন্দরী নারীলাভ, অপর দেবীদ্বয়ের বাধাদানের ও ক্ষতিসাধনের চেষ্টা। অবশেষে অপর দেবীদ্বয়ের উৎসাহদানের ফলে বহু দেশের রাজন্যবর্গকর্তৃক নায়কের রাজ্য আক্রমণ। পদ্মাবতী নাটকের কাহিনীর এই অংশটি গ্রীক পুরাণানুসারী।

দ্বিতীয়ত, গ্রীক পুরাণের পাত্রপাত্রীরা মধুসূদনের নাটকে নামের পরিবর্তন করেছে, আচরণেরও রূপান্তর ঘটিয়ে তাদের বিদেশজাত লক্ষণ অনেকাংশে মুছে ফেলেছে। প্যারিস হয়েছে ইন্দ্রনীল, হেলেন রূপান্তরিত হয়েছে পদ্মাবতীতে। হেরা শচীর রূপ ধারণ করেছে, আফ্রোদিতি হয়েছে রতি। আথেনীর স্থানে এসেছে মুরজা—যক্ষেশ্বরী। নারদের ভূমিকাটি অনেকটা এরোসের স্থান অধিকার করেছে। কাহিনীটির ভারতীয় রূপ দিতে গিয়ে কবি বিশেষ সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন তার একটা বড় প্রমাণ হল স্বর্ণ আপেলকে স্বর্ণপদ্মে রূপান্তরিত করায়। নারদের চরিত্রের কলহপ্রবণতা ভারতীয় পুরাণ তথা লোকবিশ্বাসের অঙ্গ। কবি সেই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়েছেন। গ্রীক আফ্রোদিতির সঙ্গে রতির চরিত্রের গুণগত পার্থক্য থাকলেও উভয়েই কামজ প্রেমের দেবতারূপে নিজ নিজ দেশের পুরাণকথায় অভিহিত হয়েছে; হেরা গ্রীক দেবকল্পনায় দেবরাজ জিউসের পত্নী, শচী হিন্দুদের দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী। সুতরাং এই পরিবর্তন যেমন বাঙালি পাঠক-দর্শকের সাধারণ বোধ ও রুচিকে আহত করে না, অন্যদিকে তেমনি মূল গল্পটিকেও এর দ্বারা নাকচ করে দেওয়া হয় নি। আথেনীর যথাযথ স্থানে

কোন একজন ভারতীয় দেবীকে বসানো যায় না। কবি এখানে যক্ষপত্নী মুরজাকে বসিয়েছেন। এই দেবী সম্পূর্ণ ই কবির কল্পনাজাত।

তৃতীয়ত, পদ্মাবতীতে গ্রীক পুরাণকাহিনীর সৌন্দর্যবিচার প্রসঙ্গটির সর্বাধিক অনুসরণ করা হয়েছে। তিন দেবীর প্রলোভন প্রদর্শন, শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরূপে নির্বাচিত হবার জন্য ব্যাকুলতা, কলহপ্রবণতা এবং ঈর্ষার ভাব মধুসূদনের নাটকেও আছে। কিন্তু গ্রীক পুরাণকথার মধ্যে প্যারিস-চরিত্রের কামাতুরতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই কামনার অগ্নিতে ইন্ধন যুগিয়ে রতির জয়লাভের চিত্রটিও বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। মধুসূদনের অঙ্কিত চিত্রটিতে দেহকামনার রক্তরাগ এরূপ আদিম তীব্রতা নিয়ে প্রকাশ পায় নি। কারণ, এক। গ্রীক পুরাণকথায় অতি প্রাচীন জীবনলীলার যে অনাবৃত চিত্র সহজে প্রকাশিত তার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালির রুচির অনেক পার্থক্য। মধুসূদন পুবাতন গ্রীক জীবনচর্চার যত বড ভক্তই হন না কেন সেই উন্মুক্ত নগ্নতার যথাযথ চিত্রায়ন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুগের পরিবর্তনে রুচির পরিবর্তন ঘটবেই। দুই। সমকালীন দর্শকদের রক্ষণশীল মনোভাবের কথাও কবিকে মনে রাখতে হয়েছে। গ্রীক কাহিনীর সঙ্গে এই পার্থক্যের ফলটি কিন্তু সুদূরপ্রসারী হয়েছে। প্যারিসের চরিত্র, হেলেনের চরিত্র, হেলেনকে স্বামীগৃহ থেকে নিয়ে আসা সব কিছুর মধ্যে কামনার যে দাবদাহকে প্রত্যক্ষ করেছেন গ্রীক পুরাণকারেরা, তার বীজ এই বিচার দৃশ্যেই বর্তমান। এই আগুনেই আসলে ট্রয় ধ্বংস হয়েছে। কবি মধুসূদন প্রথম থেকেই সে পথে পা বাড়ান নি। গল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তাঁর চোখের সামনে ছিল। জীবনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে মানবস্বভাবের একটি মূল প্রবৃত্তির অতি তীব্র আলোড়নের ভয়াবহ রূপ তিনি পদ্মাবতীতে দেখাতে চান নি, অথচ গ্রীক গল্পটির মধ্যে জীবনসত্যের অনুরূপ উপকরণই সঞ্চিত ছিল, সে দেশের নানা কবি-নাট্যকার সেই সব উপকরণগুলিকে কাজেও লাগিয়েছেন। মধুসূদন সেই উপকরণের কতকাংশ গ্রহণ করে একটি কমেডি তৈরী করতে চেয়েছেন। তিনি কামনার সেই অগ্নিকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। কোন বিশিষ্ট গভীর প্রবৃত্তিলোকে তিনি প্রবেশ করতে চান নি। সমাপ্তির মিলন মাধুর্যের পূর্বাভাস হিসেবে সমস্ত নাটকের মধ্যে একটা লঘু মেজাজকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। প্রথম অঙ্কে ক্রুদ্ধা শচী-মুরজার প্রস্থানের পরেও তাই ইন্দ্রনীল সহজ মনে বিদূষকের সঙ্গে রসিকতায় যোগ দিয়েছে। এটি আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে

পারে। কিন্তু বিশিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতটি স্মরণ থাকলে এর কারণ অনুমান করা কঠিন হবে না।

চতুর্থত, কবি গ্রীক গল্পটির উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন নি। কালিদাসের শকুন্তলার আদর্শে একটি প্রণয়োপাখ্যান ঐ গল্পটির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। প্যারিস ও হেলেনের চরিত্রভিত্তির পরিবর্তন ঘটায় এবং কাহিনীর মূল রসাবেদনটি অনুসরণ না করায় ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর প্রণয়-আখ্যানটি সহজেই সংস্কৃত নাট্যাদর্শে গঠিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শকুন্তলায় প্রকাশিত জীবনজিজ্ঞাসাও তিনি আশ্রয় করতে চান নি, তার কাহিনীরস নিয়েই তৃপ্ত থেকেছেন। যদি গ্রীক কাহিনীর জীবন-চেতনা এবং শকুন্তলার জীবনবোধ দুটিকেই আয়ত্ত ও সমন্বিত করতে চাইতেন কবি তাহলে শেষ পর্যন্ত নিদারুণ ব্যর্থতাই বহন করতে হত। কারণ ঐ দুই ধারা মানবোপলব্ধির বিপরীত প্রান্তবাসী। কবি উভয় উৎসের নিকট থেকে সহজ ঘটনা-বৈচিত্র্য ও কাহিনীরস নিয়ে মেলাতে চেয়েছেন। গল্প-গঠনে কোন গুরুতর স্বাতন্ত্র্যের রেখা পাঠককে তাই পীড়া দেয় নি।

পঞ্চমত, গ্রীক দেবচরিত্র কল্পনার সঙ্গে এ দেশীয় দেবচরিত্রের কল্পনা-ভিত্তিতে কিছু পার্থক্য আছে। যে তিনটি দেবীচরিত্র এই নাটকে অঙ্কিত হয়েছে তাতে গ্রীক-ভাবনার ছাপ স্পষ্ট। চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করব।

নাটকের কাহিনী উৎস যাই হোক না কেন বিন্যাস যে সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী তাতে সন্দেহ নেই। গ্রীক নাট্যভঙ্গির স্পর্শমাত্র সেখানে নেই।

গ্রীক সাহিত্য ও ভাবনালোকের সঙ্গে বাংলা সৃজনধর্মী সাহিত্যের প্রথম সংযোগ স্থাপিত হল পদ্মাবতীতে। মধুসূদনের এ কৃতিত্বের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাছাড়া কবি মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রতিভার বিবর্তনের দিক থেকেও এই অনুসরণ তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে মেঘনাদবধ রচনার সময়ে বন্ধুকে লেখা চিঠিতে কবি বলেছেন, "It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you.

You shan't have to complain again of the Un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write as a Greek would have done." বোঝা যাচ্ছে পদ্মাবতীতে গ্রীক কাহিনী গ্রহণ করায় রাজনারায়ণবাবুর ন্যায় সাহিত্যরসিক ব্যক্তিও সন্তুষ্ট হন নি। যাই হোক পরিণত রচনায় কবি গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পদ্মাবতীতে তার চিহ্ন নেই; আবার এই সময়ের কাব্যে তিনি গ্রীক গল্প গ্রহণের বিরুদ্ধতা করলেও পদ্মাবতীতে গ্রীক গল্পই অনেকটা অনুসৃত হয়েছে। গ্রীক-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ও তাকে আয়ত্ত করার রীতিতে একটা পরিবর্তনসূত্র এর মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায়। কিন্তু ট্রয়যুদ্ধ ও তৎসম্পর্কিত কাহিনী সাহিত্য-সাধনার এই প্রথম পর্ব থেকেই নানাভাবে কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পদ্মাবতীতে আছে স্বর্ণ আপেলের গল্পের অনুসৃতি, 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় স্বর্গে দেবলোক প্রসঙ্গে, অষ্টম স্বর্গে নরক বর্ণনায়, নবম স্বর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টির চিত্রে ইলিয়াড-ওডেসির স্থান বিশেষের আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে এবং 'হেক্টর বধে' ইলিয়াডের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

॥ তিন ॥

পদ্মাবতী নাটকের কাহিনী পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক আখ্যান থেকে গৃহীত হলেও বিন্যাস-কৌশলে কবি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের আদর্শকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন। অবশ্য সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকলক্ষণগত যে চিহ্নগুলি তিনি শর্মিষ্ঠাতেই বর্জন করেছেন, নূতন করে তাদেব অনুকরণ এ ক্ষেত্রে করা হয় নি। শর্মিষ্ঠার অনুরূপ কোন প্রস্তাবনা সঙ্গীত (শর্মিষ্ঠা নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে যা পরিত্যাগ করা হয়েছিল) এখানে নেই, কিন্তু আকাশমার্গ থেকে উত্থিত একটি সমাপ্তি গীতি আছে (শর্মিষ্ঠার প্রথম সংস্করণে একটি সমাপ্তি সঙ্গীত ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সেটি কবি তুলে দিয়েছিলেন।) তাছাড়া সমাপ্তিতে নারদের মুখ দিয়ে স্বস্তিবাচন শুনিয়েছেন কবি—

আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি ।—
সুখে সদা কর বাস অবনী-মণ্ডলে,
পরাভবি শত্রুদল, মিত্রকুলে পালি,
ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্ম্মের নন্দন
পৌরব। চরমে লভ স্বর্গ ধর্ম্মবলে।

(পদ্মাবতীর প্রতি)
যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতি-রাজেন্দ্র নন্দিনি,
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজ বালা
শর্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয়জন কাব্যরত্ন হারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

শকুন্তলা নাটকের সমাপ্তির ভরতবাক্যের আদর্শে এই স্বস্তিবচন রচিত—

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥

তবে লক্ষণীয়, মধুসূদন নিজের সাহিত্যিক পরিচয় দিতে চেয়েছেন এই প্রসঙ্গে ; বিশেষ করে সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভের যে বাসনা তাঁর চিরকালের এই কবিতায় তারও প্রতিফলন ঘটেছে।

শর্মিষ্ঠা নাটক থেকেই সংস্কৃত নাট্যাদর্শানুযায়ী যে রীতিগুলি তিনি অস্বীকার করে এসেছেন পদ্মাবতীতেও সেই অস্বাকৃতি সমানে চলেছে। নাটকটিকে অঙ্কবিভাগে মাত্র সীমাবদ্ধ না করে প্রায় প্রতি অঙ্কে স্থানগত ঐক্য বজায় রেখে দৃশ্য বিভাগও করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রথম অঙ্কে কোন দৃশ্য বিভাগ নেই এবং চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যের মধ্যে একটি দৃশ্যে স্থানিক ঐক্য রক্ষিত হয় নি। বিষ্কম্ভক-প্রবেশকের ন্যায় দৃশ্য-পরিকল্পনা এ নাটকেও স্থান পায় নি, সূত্রধার, নটির কথোপকথন পরিত্যক্ত, গদ্যে-পদ্যে সংলাপ নেই ; অভিজাত পুরুষ ব্যতীত অপরাপর শ্রেণীর পাত্র এবং স্ত্রী-চরিত্রগুলিকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলাবার চেষ্টা হয় নি।[8] শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে সব দোষের উল্লেখ করেছিলেন তার সবগুলিই পদ্মাবতী সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাছাড়া দেবচরিত্র-কল্পনার বিশিষ্টতার জন্যও সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রাজ্য থেকে তিনি ধিক্কারই পেতেন, একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তবুও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে পদ্মাবতী নাটকের মূল শৈলী সংস্কৃত নাটকের সমজাতীয়। জনৈক সমালোচক পদ্মাবতী নাটকে সংস্কৃত প্রভাবের পরিমাণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, "...সংস্কৃত নাটকের বাকসর্বস্বতা বা

পঞ্চসন্ধির দৃঢ়বদ্ধতা কিছুই মধুসূদনের নাটকে অনুসৃত হয় নাই"।[৫] সমালোচকের এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম শ্রেণীর দু-একখানি সংস্কৃত নাটকের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকে কাহিনীর বিকাশগত যেরূপ ঐক্য লক্ষিত হয় মধুসূদনের পদ্মাবতীর গ্রন্থনে তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নৈপুণ্য প্রকাশ পায় নি। দ্বিতীয়ত, পদ্মাবতী পর্যন্ত মধুসূদনের নাটক রসসৃষ্টির অভিমুখেই পরিচালিত হয়েছে। রসসৃষ্টিতে কালিদাস-ভবভূতির মত গভীরতা তাঁর আয়ত্ত ছিল না, কারণ এ রাজ্যে ছিল তাঁর প্রবাসযাপন, তবে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত নাট্যকারদের তুলনায় তিনি দুর্বলতার পরিচয় দেন নি।

এই রসসৃষ্টির প্রশ্নটিকে একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখা কর্তব্য। কারণ সংস্কৃত নাটকে এই রসসৃজনই লক্ষ্য। The Sanskrit Drama গ্রন্থে A B. Keith বলেছেন,

"The most original and interesting part of dramatic theory is the gradual definition of the nature of the sentiment which it is the aim of the performance to evoke in the mind of the audience. ... The sentiments may all be employed in drama, but there are rules affecting their use. In each play there should be a dominant sentiment ; in the Nataka it should be the erotic or the heroic, other sentiments are merely auxiliary, but that of wonder is especially appropriate in the denouement ; indeed something in the way of supernatural intervention is often convenient to extricate the plot."

পদ্মাবতী নাটকের দিকে লক্ষ্য করলে কীথ-কথিত রসসৃষ্টির আদর্শের অনুসরণ দেখা যাবে। এই নাটকে আদি বা প্রেম-রসই মুখ্য। অন্য রস তার সাহচর্য করেছে। প্রধানত বিদূষকের আচরণে হাস্যরস প্রকাশ পেয়েছে। হাস্যরসসৃজনে কঞ্চুকী এমন কি স্বয়ং রাজা ইন্দ্রনীলও কিছু ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রাজার চরিত্রকে আশ্রয় করে বীররস সৃষ্টিরও সামান্য প্রচেষ্টা আছে। পদ্মাবতীর দুর্দশায় কিঞ্চিৎ করুণরস সৃষ্ট হয়েছে।

মুখ্যরস গৌণরস দুটির দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি, কিছুটা পুষ্টই হয়েছে।

সমাপ্তিতে বিস্ময়রসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, দৈবী প্রভাবে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে।

ইংরেজী কাব্যনাটকচর্চার মধ্য দিয়ে মধুসূদনের কবিমন বিকাশ লাভ করেছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত রসতত্ত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। সাহিত্যদর্পণকারকে তিনি স্পষ্ট ভাষায়ই অস্বীকার করতে চেয়েছেন। আসলে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের মূল আবেদনের মধ্যে রয়েছে অতি গুরুতর বৈপরীত্য। অথচ সংস্কৃত নাট্যধারারই অনুসরণ মধুসূদনকে করতে হয়েছে। তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও বিশিষ্ট সংস্কৃত নাটক পাঠ ও অনুসরণ-চেষ্টার মধ্য দিয়ে রসসৃজনেও মোটামুটি সাফল্য তিনি লাভ করেছেন।[৬]

এই লক্ষণ দেখেই বোঝা যায় কবি এখন পর্যন্ত সংস্কৃতরাজ্যেরই অধিবাসী থেকেছেন, ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের জগতে অধিকার বিস্তারের মনোভাব নিয়ে প্রবেশ করেন নি। ফলে সংস্কৃত নাটকের মত মধুসূদনের নাটকেও চরিত্রের ব্যক্তিত্ব মুখ্য নয়, কোন বিশিষ্ট রসের 'আলম্বনবিভাব' রূপেই তার মূল্য ; এই কারণেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা নরনারীর জাতিগত পরিচয়ই পায় প্রাধান্য। রসসৃষ্টির জন্যই সংলাপে প্রবৃত্তির সংঘর্ষজাত নাট্যরস অপেক্ষা গীতিধর্মী বর্ণনার আধিক্য।

গ্রীক কাহিনীর নাট্যরূপ দান করতে গিয়ে পদ্মাবতীতে তিনি স্পষ্টত একটি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ করেছেন। সেই নাটকটি হল মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলা"। আসলে গ্রীক স্বর্ণ আপেলের কাহিনী এবং শকুন্তলার গল্প ও বিন্যাসভঙ্গির সমন্বয়ের ফল হল পদ্মাবতী।

এক। পদ্মাবতী নাটকের প্রথমাঙ্কের গোড়াতেই ধনুর্বাণহস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ এক পলায়মান হরিণের পশ্চাদ্ধাবণ করতে করতে। শকুন্তলা নাটকেও প্রস্তাবনা অংশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ ভাবেই প্রবেশ করেছেন রাজা দুষ্মন্ত। তবে কালিদাস দুষ্মন্তের সঙ্গে একজন সারথী দিয়ে কথোপকথনের সুযোগ করে দিয়েছেন, কিন্তু ইন্দ্রনীলের সঙ্গে কোন সহচর উপস্থিত না করায় মধুসূদনকে স্বগতোক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে।

দুই। পদ্মাবতীর দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকী এবং রাজপুরীর দুটি নারীর (সখী এবং পরিচারিকা) আলাপের মধ্য দিয়ে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ

অঙ্কের প্রবেশকের পরে কঞ্চুকী এবং দুজন পুরমহিলার কথোপকথনের মাধ্যমে পাঠক-দর্শক কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ পান। মধুসূদনের পরিকল্পনাটিতে কালিদাসের নাটকের ছাপ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তবে কবি দৃশ্যটিকে স্মিত কৌতুকরসে সঞ্জীবিত করে মৌলিকতার চিহ্ন রেখেছেন।

তিন। শকুন্তলা নাটকের প্রথমাঙ্কে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। উভয়ে উভয়কে দেখেই প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। দুষ্মন্ত নিজের সত্য পরিচয় গোপন করে। শকুন্তলার আচরণে যুগপৎ তৃষ্ণা ও ব্রীড়া প্রকাশ পায়। পদ্মাবতীর তৃতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ঐ আদর্শের অনুসরণ করেছেন মধুসূদন। ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ, উভয়েব প্রেমাকুলতা, ইন্দ্রনীলের ছদ্মপরিচয় দানে কালিদাসের প্রভাব পড়েছে। তা ছাড়া বাক্‌ভঙ্গি এবং আচরণে কোথাও কোথাও হুবহু কালিদাসকে অনুকরণ করেছেন কবি। পদ্মাবতী বলেছে—"সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো। উহু, আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত)।" কালিদাসের নাটকে শকুন্তলা বলেছে—

> "অণসূএ। অহিণবকুসসূইএ পরিক্খদং মে চলণং। কুরবঅসাহা-পরিলগ্‌গং চ বক্কলং। দাব পরিবালেধ মং। জাব ণং মোআবেমি।
> (রাজানম-অবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্যসহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা।)"

মধুসূদনের অনুসরণ এখানে অনুবাদে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু কালিদাস সুদীর্ঘ দৃশ্যটিতে বর্ণনায় ও ভাষার খেলায় প্রেমানুভূতিব ও সৌন্দর্য-কল্পনার যে রাজ্য গড়ে তুলেছেন তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ একরূপ অসম্ভব। এই দৃশ্যে প্রেমাকুলতা ও সংযমের যে দ্বন্দ্ব দুষ্মন্তের চরিত্রে প্রদর্শিত এবং কোমল, সরল যে যৌবনতৃষ্ণা শকুন্তলাকে ঘিরে বিকশিত পদ্মাবতীতে তার অনুরূপ সাফল্য মিলবে না।

চার। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পদ্মাবতীর ছদ্মপরিচয়ে তার সঙ্গে নিজ মিল অসম্ভব জেনে ইন্দ্রনীল দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে, "হে প্রভো অনঙ্গ! যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্র দ্বারা পর্বত-রাজের পক্ষচ্ছেদ করে্যে তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্পশরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কর্ত্যে চাও?" শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলাকে পাবার আশা নেই ভেবে দুষ্মন্তের এই হা হুতাশের ছায়াপাত তাতে লক্ষ্য করা যায়—

"তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো-
র্দ্বয়মিদময়থার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈ-
স্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারী করোষি॥

ভগবন্ কামদেব নং তে ময্যু নু কোশঃ। কুতশ্চ তে কুসুমায়ুধস্য সতস্তৈক্ষ্ণমেতৎ।"

পাঁচ। পদ্মাবতী নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের আদর্শ হল কালিদাসের শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্ক। শকুন্তলাকে অস্বীকার করবার পরে হারানো আঙটি পাওয়া গেলে দুষ্মন্তের সব মনে পড়ে গেল। শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করবার জন্য দুষ্মন্তের পাপবোধ ও মানসিক যন্ত্রণা যথেষ্ট তীব্র ভাবে এই দৃশ্যে প্রকাশ পেয়েছে। শকুন্তলার প্রতি প্রথম প্রেম, তপোবন কুঞ্জে মিলন-কালীন নানা স্মৃতি তার মনে জেগে উঠতে লাগল। কিভাবে নির্দয়চিত্তে শকুন্তলাকে রাজসভায় অপমান করে বিতাড়িত করেছে সে কথা চিন্তা করে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল। কালিদাস সংস্কৃতরীতির সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন এই দৃশ্যে। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দৃশ্যটির সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন,—

"অঙ্গুরী পাইয়াই রাজার যেমন সব কথা মনে পড়িল, অমনি তাঁহার ঘোরতর অনুতাপ হইল। প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল আর তাঁহাকে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই অনুতাপ, এই যন্ত্রণা, এই অধীরতায় রাজার চরিত্র বেশ খুলিতে লাগিল। বোকা বিদূষক নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিতে লাগিল। যে সকল কথা এ সময়ে চাপা দেওয়া উচিত, বোকাটা সেই সব কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ...এই সময়ে আবার সদাগরের মরার খবর আসিল। সে আঁটকুড়া ছিল, বিদূষক যে কথাটি মনে করাইয়া দেয় নাই সেটাও মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, আমি 'অপুত্রক' অথচ আমার পুত্র হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল। আমি ছেলেটি হেলায় হারাইয়াছি। তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন..."

—[দুর্বাসার শাপ]

এর তুলনায় মধুসূদনচিত্রিত দৃশ্যটি একান্তভাবেই অকিঞ্চিৎকর। পদ্মাবতীর

বিরহে রাজা বেদনার্ত এটুকুই দেখাতে চেয়েছেন কবি, ভাষার কৃত্রিম সংস্কৃতানুসরণের জন্য সে চেষ্টায়ও যথেষ্ট সফল হন নি।

ছয়। পদ্মাবতী নাটকের পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পদ্মাবতী-ইন্দ্রনীলের মিলন ঘটেছে। এই দৃশ্যটি শকুন্তলা নাটকের সপ্তমাঙ্কের আদর্শে পরিকল্পিত। অকুস্থলের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন ঘটেছিল দেবর্ষি মারীচের আশ্রমে, পদ্মাবতীকে ইন্দ্রনীল খুঁজে পেয়েছে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে। তা ছাড়া গৌতমী, শার্ঙ্গরব প্রভৃতি নামগুলি পর্যন্ত তিনি শকুন্তলার পূর্বার্ধ থেকে গ্রহণ করে এখানে প্রয়োগ করেছেন। পদ্মাবতীর এই উচ্ছ্বসিত বাক্যে—"বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন?" শকুন্তলার নিম্নোদ্ধৃত সংলাপের অনুরূপ।—

"হিঅঅ, অস্সস অস্সস। পরিচ্চত্তমচ্ছেরণ অণুঅম্পিঅ হ্মি দেব্বেণ। অজ্জউত্তো কৃখু এসো।"

কিন্তু শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কালিদাস দুষ্মন্তের আগ্রহ-ব্যাকুলতা ও সংশয়ের যে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেছেন তা নাটকীয় সৌন্দর্য লাভ করেছে। বালক ভরতের প্রসঙ্গ এদিক থেকে নাটকীয় তাৎপর্যের সঙ্গে কালিদাস কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে। আবার শকুন্তলার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎকার ও দীর্ঘস্থায়ী সংলাপে তিনি বেদনার গীতোচ্ছ্বাসকে শতধারায় মুক্ত করেছেন। মধুসূদনের দৃশ্যটি একান্তভাবেই মামুলী ও প্রাণোত্তাপহীন। দৃশ্যান্তরালেই ইন্দ্রনীলের আগ্রহ, চিন্তা প্রভৃতির অবসান ঘটানো হয়েছে। পদ্মাবতীর সংবাদ তিনি পেয়েছেন এবং নিশ্চিন্ত আছেন, তাছাড়া পদ্মাবতী-ইন্দ্রনীলের একান্তে সাক্ষাৎকারের জন্য কোন অবকাশের সৃষ্টিও তিনি করেন নি।

কালিদাসের শকুন্তলার কাহিনীর আদর্শ মধুসূদন গ্রহণ করলেও গ্রীক কাহিনীর সঙ্গে তাকে মিশিয়ে যে রূপ দান করা হয়েছে তাতে শকুন্তলার গভীরতা নেই। শকুন্তলার কাহিনীটি শুধুমাত্র ঘটনার মালা নয়, ঘটনার গতি সেখানে চরিত্রের মধ্য দিয়ে। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের প্রণয়ের মধ্যেই সেখানে বিচ্ছেদের বীজ লুকিয়ে থাকে। তাদের চরিত্রের বিশিষ্টতার ফল সেই বিচ্ছেদ। সে বিচ্ছেদ পদ্মাবতী নাটকের মত শুধু বাইরে থেকে আরোপিত নয়। শকুন্তলা নাটকে প্রতিটি ঘটনায় তাদের হৃদয়লোক মথিত এবং মথিত চিত্তের প্রতিক্রিয়ায় ঘটনাধারা প্রভাবিত। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের বিচ্ছেদ-বেদনার তীব্রতার মধ্যেই তাই মহাকবি উপ্ত করেছেন মিলনের সম্ভাবনা।[৭]

মধুসূদনের শকুন্তলা-অনুসরণ পর্যবসিত হয়েছে নায়ক-নায়িকার প্রেম, মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের একটি অতি মামুলী কাঠামো গ্রহণ করায় এবং কিছু কিছু সংলাপের ভাষায়।

স্বর্ণ আপেলের কাহিনীটির সঙ্গে শকুন্তলা-প্রভাবিত প্রণয়-কাহিনীটির সমন্বয় একেবারে ব্যর্থ হয় নি এই কারণে যে শকুন্তলার অন্তরস্থিত গভীর মানবজিজ্ঞাসাটিকে কবি আয়ত্ত করতে চান নি। তিনি সে কাহিনীর বাহিরের কাঠামোটিই মাত্র গ্রহণ করেছেন, অন্তর সত্যে পৌঁছতে চান নি। না হলে এই বিপরীতধর্মী রচনা দুটির মিলন সম্ভব হত না।[৮]

কালিদাসের শকুন্তলার প্রভাব ছাড়াও সাধারণভাবে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের একটি বহুল অনুসৃত উপকরণ এবং প্রকাশভঙ্গির ও ভাষার বিশিষ্ট রীতি তিনি শর্মিষ্ঠার মত এখানেও ব্যবহার করেছেন।

বিদূষক মানবকের চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের আদর্শে পরিকল্পিত। তার ভোজনলোলুপতা, ভাঁড়ামি করে লোক হাসাবার চেষ্টা এবং রাজার প্রণয় ব্যাপারে সাহায্য দান সংস্কৃত আদর্শ থেকেই গৃহীত।

উপমাবহুল সমাসবদ্ধ ভাষায় দীর্ঘ ও বর্ণনাত্মক বাক্যে তাঁর পাত্র-পাত্রীরা এ নাটকেও কথা বলেছে। সংলাপে অনুবাদমূলক অংশ বেশি নয়, কিন্তু গম্ভীর ভাবপ্রকাশক মৌলিক অংশেও সংস্কৃত ভাষারীতির মেজাজটি স্পষ্ট।

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অনুকরণে কবির সিদ্ধি সীমাবদ্ধ হলেও পদ্মাবতীতেও তিনি সংস্কৃত নাট্যরাজ্যেই প্রধানত ভ্রমণ করেছেন, গ্রীক কাহিনীকে যথাসম্ভব কোমল করে সংস্কৃত নাটকসুলভ গল্পের সঙ্গে মেলাবার উপযোগী করে নিয়েছেন। গ্রীক গল্পভিত্তিটি একান্ত বাহিরের ব্যাপারেই থেকে গিয়েছে, সংস্কৃত নাট্যরাজ্য থেকে কবিকে উদ্ধার করতে পারে নি।

॥ চার ॥

পদ্মাবতী নাটকের গঠনরীতি প্রশংসনীয়। শর্মিষ্ঠা নাটকের তুলনায় দৃঢ় একাগ্রতা এর সর্বাঙ্গে প্রকট। শর্মিষ্ঠা নাটকের একটি সম্পূর্ণ অঙ্ক দেবযানী-যযাতির বিবাহ-কথায় অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত, নাট্যদ্বন্দ্ব সেখানে যেন স্থগিত থেকেছে। সেরূপ অংশ পদ্মাবতীতে দু-একটি দৃশ্যের অতি সঙ্কীর্ণ কোন

কোন অংশ জুড়ে বসেছে। কিন্তু কোথাও তার আয়তন মূল নাট্যদ্বন্দ্বের একাগ্রতাকে আহত করতে পারে নি।

এই নাটকের মূল সমস্যা হল ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে শচী-মুরজার ক্রোধ। এই ক্রোধ বিশেষ করে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলনব্যাপারে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করেছে। শচী-মুরজা-কালপুরুষ এই তিনজন মিলে নাটকটিতে একটি বিপরীত শক্তিব্যূহ রচনা করেছে। রতির চেষ্টায় ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর প্রণয়সঞ্চার ও মিলন-ঘটনাকে এই বিরোধী শক্তি বিপর্যস্ত করে দিতে চেয়েছে। নাটকটির আদ্যন্ত এই দুই পক্ষ অল্পাধিক সক্রিয় থাকায় দ্বন্দ্বপ্রাণতার হানি কোথাও ঘটে নি। পদ্মাবতীর প্রথম অঙ্কে একটি মাত্র দৃশ্য। এই দৃশ্যে উক্ত দ্বন্দ্বের ভিত্তি যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গেই স্থাপিত হয়েছে। ইন্দ্রনীল সুন্দরী নারীর লোভে রতিকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে ঘোষণা করেছে। অপমানিতা শচী এবং মুরজা রতির প্রতি ঈর্ষাবশে ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। এ সংঘাত একদিক থেকে দেখলে রতি এবং শচী-মুরজার মধ্যেই মূলত আবর্তিত। কিন্তু ইন্দ্রনীলকে অবলম্বন করেই এই সংঘর্ষ চলেছে। ইন্দ্রনীলের জীবন এবং ভাগ্যের যে একটি বিশিষ্ট সমস্যা দেবনারীদের এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রীয় ঘটনা রূপে দেখা দিয়েছে, তা হল ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলনের সমস্যা। রতি এদের মিলন সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়েছে আর শচী-মুরজা বিঘ্নোৎপাদনের নানা পন্থা আবিষ্কার করেছে। প্রথম অঙ্ক থেকেই অপর একটি পার্শ্ব সমস্যার বীজ বপন করা হয়েছে। হারানো কন্যার জন্য মুরজার ব্যাকুলতার প্রসঙ্গ এখানেই এনেছেন নাট্যকার।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে রতির সক্রিয়তায় বহুবার স্বপ্নদর্শনে ইন্দ্রনীলের প্রতি আকৃষ্টা পদ্মাবতীর কাছে চিত্রকরীর বেশধারণ করে রতি, ইন্দ্রনীলের চিত্র উপস্থিত করেছে। পদ্মাবতীর হৃদয়ে ইন্দ্রনীলের প্রতি প্রেমসঞ্চার এবং ফলে শচী-মুরজার চিন্তা এই দৃশ্যে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরের আয়োজন সংবাদ পাই। এর পিছনেও রয়েছে রতির হাত। নাটকের দ্বিতীয়াঙ্ক রতির সক্রিয়তায় পূর্ণ। বিপরীত প্রান্তীয় উভয়পক্ষের সক্রিয়তা না থাকলে দ্বন্দ্ব তীব্র এবং ঘনীভূত হয়ে ওঠে না। নাট্যকার এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন ছিলেন বলেই সম্ভবত রতির এই সাফল্যে চিন্তান্বিতা এবং ক্রুদ্ধা শচী-মুরজাকে পরামর্শরত অবস্থায় দেখিয়েছেন। নাট্যদ্বন্দ্ব এই অঙ্কে ক্রমবিকশমান।

তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে রতির চেষ্টায় স্বপ্নে বারবার পদ্মাবতীর

সৌন্দর্য দেখে রাজা ইন্দ্রনীল কিভাবে তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে সংবাদ পাই। এই অঙ্কের দুটি দৃশ্য মিলে একটি নবতর পার্শ্বসমস্যা মূল নাট্যদ্বন্দ্বে কিছু বিচিত্রতা ও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পদ্মাবতী এবং ইন্দ্রনীল পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট কিন্তু ছদ্মপরিচয়ের ফলে সে আকর্ষণে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এই সমস্যাটি একান্তভাবেই স্বল্পস্থায়ী। দুটি দৃশ্যের মধ্যেই এর আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ। এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি রেখেই সম্ভবত মধুসূদন তৃতীয় অঙ্ককে দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে একটা স্বতন্ত্র অঙ্ক বলে কল্পনা করে নিয়েছেন। আসলে এই দুটি অংশের একই অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। দুই অঙ্কের এই চারটি দৃশ্য সুস্পষ্টভাবে একটি ঘটনাপর্যায়ের অনুগত। রতির চেষ্টায় পদ্মাবতী-ইন্দ্রনীলের প্রণয়সঞ্চার এবং পরিশেষে বিবাহ। মাঝখানে ছদ্ম-পরিচয়ের ফলে কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি। প্রেমাকুলতা ও মিলনের মাঝখানে এই স্বল্পস্থায়ী সমস্যার বাধা অধীরতার সৃষ্টি করে নাট্যরস বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে ঐ অংশ একটি স্বতন্ত্র ঘটনাক্রম সূচিত করে নি।

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যে নাট্যসমস্যা চরমে উঠেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্কে রতির ঈপ্সিত পথে ঘটনাক্রম চলেছে। এই দুই অঙ্কে ঘটনার মূল গতিপথ ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলনাভিমুখী। বিরোধী শক্তি যে অন্তরালে প্রস্তুত হচ্ছে একবার পাঠক-দর্শককে সে সংবাদ দিয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু এতকাল শচী-মুরজারা মোটামুটি নিষ্ক্রিয় ছিল। আপাতদৃষ্টিতে রতি-ইন্দ্রনীলের বিজয় একরূপ নিশ্চিন্ততার বিভ্রম সৃষ্ট করেছিল। ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলন ঘটবার পরে নূতন করে আর কি-ই বা ঘটতে পারে; পাঠক-দর্শকের মন যখন এরূপ সংশয়ান্বিত তখন চতুর্থ অঙ্কে বিপদ বিচিত্র অস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ ও গুপ্ত শক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। শচী-মুরজার চক্রান্তে এবং কলির প্রত্যক্ষ সহায়তায় পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরকালে উপস্থিত নানা দেশের রাজারা সংঘবদ্ধভাবে ইন্দ্রনীলের রাজ্য আক্রমণ করেছে। তার চেয়েও বেশি বিপদ দেখা দিয়েছে ছদ্মবেশে কলির পদ্মাবতী-হরণের ঘটনায়। রাজা যুদ্ধ জয় করেছেন, কিন্তু পদ্মাবতীর সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে বেদনার্ত হয়ে পড়েছেন। কলি পদ্মাবতীকে মিথ্যা করে রাজার পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদ দান করেছে। ফলে বিচ্ছেদ-বেদনা, গহন অরণ্যে পরিত্যক্ত হবার ভীতির সঙ্গে, ভবিষ্যতের সর্ব-আশার বিনষ্টিজনিত অতি তীব্র দুঃখ-ভোগের মধ্যে তাকে নিপতিত হতে হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের শেষে মনে

হয়েছিল ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলনই একমাত্র সত্য ; চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তিতে মনে হল বিচ্ছেদের এই তীব্র বেদনাই বোধ হয় অন্তহীন। দ্বিতীয়-তৃতীয় অঙ্কে রতির কর্মকৌশলের নিকটে শচী-মুরজাকে মনে হয়েছিল উপায়হীন ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তারা যে অন্তরালে বসে রতির পরিকল্পনাকে বিনষ্ট এবং ইন্দ্রনীলের সুখমিলনকে বিপর্যস্ত করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তার প্রমাণ মিলল চতুর্থ অঙ্ক শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। আবার ইন্দ্রনীলের ভীষণ বিপদের সময়ে রতি আবির্ভূত হয়ে শচী-মুরজা-কলির চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে নি। তবে সে যে নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিল না তার কিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, যখন ছদ্মবেশে সে পদ্মাবতীদের গহন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য থেকে পথ দেখিয়ে ঋষিদের আশ্রমে পৌছে দিয়েছে। রতি অবশ্য এমনি সাময়িক সাহায্য করেই সন্তুষ্ট ছিল না। সে যে মহাদেবী ভগবতীর সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই অস্ত্রেই শচীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করেছে পরবর্তী অঙ্কের সূচনাতেই তার নিদর্শন মিলেছে।

পঞ্চম অঙ্কের দুটি দৃশ্যে নাট্যসমস্যার সমাধান দেখান হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে ভগবতীর নির্দেশে শচীর ক্রোধ বাধ্য হয়ে প্রশমিত হয়েছে। মুরজা-পদ্মাবতী সম্পর্কজনিত যে সমস্যার একটি সূক্ষ্ম সূত্র মুরজা চরিত্রকে আশ্রয় করে প্রথমাবধি প্রবাহিত হচ্ছিল তারও সমাধান ঘটেছে পদ্মাবতীর প্রকৃত পরিচয় লাভে। এই দৃশ্যে বিঘ্নকারী শক্তির আক্রমণোদ্যত মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, পরবর্তী দৃশ্যে তারই ফলে সম্ভব হয়েছে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর স্থায়ী মিলন।

নাট্যশাস্ত্রোক্ত পরিভাষার আশ্রয় নিলে বলা চলে এই নাটকের প্রথম অঙ্কে মূল দ্বন্দ্বের exposition ; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্ক জুড়ে ঘটেছে দ্বন্দ্বের ক্রমবিকাশ বা growth of action ; চতুর্থ অঙ্কে দ্বন্দ্ব উঠেছে চরমে, এখানে নাটকের climax ; পঞ্চম অঙ্কে যুগপৎ এবং অতিদ্রুত ঘটেছে fall of action এবং catastrophe। এই নাটকের চরম উত্তেজনার অংশটি সমাপ্তির কাছাকাছি স্থাপিত। ক্লাইম্যাক্সের পরে দ্রুত সর্ব সমস্যার সমাধান এবং মিলন-সমাপ্তি। এ জাতীয় গঠনরীতির নাট্য-আবেদন লক্ষ্য করবার মত। নাট্যদ্বন্দ্ব ক্রমেই জটিল, তীব্র ও উত্তেজনাকর হয়ে সমাপ্তির মুখে এসে চরম হয়ে ওঠে এবং তারপরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। পাঠক-দর্শকের মন ধীরে নাটকের দ্বন্দ্বরস আস্বাদ করতে করতে সংঘর্ষের উত্তালতায়

গিয়ে পৌছায়। এই উদ্দামতার পরে ধীরে ধীরে দ্বন্দ্বের ক্রমিক সমাপ্তির শিথিল রসাস্বাদের ধৈর্য আর তার থাকে না। কাজেই fall of action-এর অংশটি catastrophe-এর সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, তার স্বাতন্ত্র্য আর অনুভব করা যায় না। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে নাট্যোৎকর্ষের দিক থেকে যতই তারতম্য থাক না কেন নাট্যগঠনে এই একই আদর্শের মোটামুটি অনুসরণ ঘটেছে। climax-টিকে catastrophe-এর অতি নিকটে বসিয়েছেন তিনি। climax-কে নাটকের মাঝখানে বসিয়ে বিলম্বিত fall of action-কে প্রশ্রয় দেন নি।[৯]

পদ্মাবতীতে মূল নাট্যদ্বন্দ্বের উপস্থাপনের যে বিশিষ্টতাগুলি লক্ষণীয় তা হল— এক। একাধিক পার্শ্ব সমস্যার সংযোগে নাট্যদ্বন্দ্ব অনেকটা জটিল হয়ে উঠেছে। প্রথমত, মুরজার হারিয়ে যাওয়া কন্যার জন্য ব্যাকুলতা এবং প্রকৃত পরিচয় না জেনেই পদ্মাবতীর প্রতি স্নেহাকুলতা একটি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শচী-মুরজা এবং শেষদিকে শচী-মুরজা-কলিদেব মিলে বিঘ্নকারী যে শক্তিব্যূহ সৃষ্টি করেছে, মুরজার মনোভাব তার মধ্যে দুর্বলতার সুর তুলেছে। নাটকের প্রারম্ভ থেকেই মুরজার এই মনোভাবের বীজ দেখা গিয়েছে, সমাপ্তির মুখে সে জানতে পেরেছে পদ্মাবতীই তার সেই হারানো কন্যা। এই পার্শ্ব সমস্যা তীব্র সংঘাতমূলক হয়ে উঠে নাট্যদ্বন্দ্বকে যথার্থ জটিলতা দিতে পারত, মুরজার ব্যক্তিত্বের অভাবে শচীর চরিত্রের দৃঢ়তার কাছে নীরবে মাথা নত করায় তা ঘটে নি; শুধুমাত্র মুরজার চরিত্রে কিছু বিশিষ্টতা সৃষ্ট হয়েছে, সামগ্রিকভাবে নাট্য-কাহিনীর উপরে এর প্রভাব অনুভূত হয় নি। দ্বিতীয়ত, পদ্মাবতী-ইন্দ্রনীলের পরিচয়ের প্রশ্ন নিয়ে স্বল্পকাল স্থায়ী এক সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে। পদ্মাবতী এবং ইন্দ্রনীল উভয়ে বারবার স্বপ্নে দেখে প্রণয়াকুল হয়ে পড়েছে; তার উপরে পদ্মাবতী আবার ইন্দ্রনীলের চিত্রও দেখেছে। কিন্তু তারা পরস্পরের পরিচয় জানে না। ইন্দ্রনীল বণিকের ছদ্মবেশে এসে পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ পেল এবং নিজের সত্য পরিচয় গোপন করল। পদ্মাবতীও নিজেকে পদ্মাবতীর সহচরী বলে পরিচয় দিল। ফলে উভয়েই হতাশ হয়ে পড়ল, তাদের কাম্যজন রাজকুলোদ্ভব নয় জেনে, মিলনের সম্ভাবনা না দেখায় তারা বেদনার্ত হল। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যেই ঘটনাচক্রে ছদ্মপরিচয়ের আবরণ খসে পড়ল। এই জাতীয় আভ্যন্তরীণ সমস্যার সহায়তায় নাটকীয় জটিলতা বৃদ্ধি

পায়। সেকস্‌পীয়রের কমেডিতে এবং সংস্কৃত নাটকে এই কৌশল বহুল ব্যবহৃত। যেখানে এদের মিলনে কোন প্রকৃত বাধা নেই, সেখানে এ জাতীয় ছদ্ম বাধার সৃষ্টি করে ঘটনাগত চাঞ্চল্য, উৎকর্ণ কৌতূহল সহযোগে নাট্যরস ঘনীভূত করে তোলার চেষ্টা হয়। মধুসূদনও সে চেষ্টাই করেছেন। তবে এই ছদ্মপরিচয় বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারত। মধুসূদন অত্যল্পকালমধ্যে এই সমস্যার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অনুরূপ ছদ্ম-পরিচয়জাত প্রত্যাশিত চাঞ্চল্য ও কৌতূহল এ ধরনের অতি সরলীকরণের ফলে লাভ করা যায় নি। নাটকীয় মূল সমস্যা থেকে মধুসূদন দৃষ্টিকে সরাতে চান নি। পার্শ্ব সমস্যাকে অধিক বিস্তার দিলে রসনিবিড়তার হানি ঘটত। আবার নাটকের এই অংশে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে) শচী-মুরজার নিষ্ক্রিয়তার জন্য দু পক্ষের সংঘর্ষের রস অনুভূত হয় নি। সেই অভাব পূরণের কাজে এই সমস্যার তরঙ্গভঙ্গকে কবি কাজে লাগাতে চেয়েছেন।

দুই। এই নাটকে দ্বন্দ্বের প্রত্যাশিত তীব্রতার হ্রাস ঘটেছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত, দ্বিতীয়-তৃতীয় অঙ্কে রতির সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ কিন্তু তার বিরোধী পক্ষের আপাতনিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। শচী-মুরজা শুধু দাঁড়িয়ে দেখেছে এবং পরামর্শ করেছে ;

> "শচী।...এই মাহেশ্বরী পুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দিবার চেষ্টা পাচ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই স্ত্রী-রত্নটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাকবে?...
>
> মুরজা। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্তব্য?...সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন।"

কিন্তু কার্যত তারা কোন বাধার সৃষ্টি করে নি। ফলে সংঘাতের ভাব থাকলেও তা বাস্তব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয়ত, চতুর্থ অঙ্কে শচী-কলির সক্রিয়তা তীব্র হয়ে উঠল। রতি বেদনার্ত চিত্তে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর বিচ্ছেদ দেখেছে, পদ্মাবতীর ভাগ্যবিপর্যয় রোধের কথা ভেবেছে; নেহাৎপক্ষে আরণ্য শ্বাপদের আক্রমণ থেকে তার জীবন বাঁচিয়েছে। রতি বলেছে—"হায়! দেবকুলে শচীর মত চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সে যে দুষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে [illegible] বিদীর্ণ হয়। তা আমার এখন কি করা উচিত?...আমি কৈলাস-

পুরীতে ভগবতী পার্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাকবে না।"—(চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)। কিন্তু সে শচী-মুরজা-কলিদেবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় নি। নাট্য-সংঘাত এর ফলে প্রত্যাশিত তীব্রতা পায় নি। তৃতীয়ত, এ নাটকের নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সক্রিয়তার একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর প্রণয় ব্যাপারটি পর্যন্ত অনেকটা পুতুল খেলার মত। এদের মুক্ত ব্যক্তিত্বের কোন ভূমিকা এতে ছিল না। বিশেষত শচী-মুরজা-কলিদেবের চক্রান্তের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর প্রতিরোধ সৃষ্টি করার সামর্থ্য যেন এর নায়কের ছিল না। কলির প্ররোচনায় সমবেত নৃপতিদের আক্রমণ প্রতিহত করে কিছু কর্মক্ষমতার পরিচয় ইন্দ্রনীল দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শত্রুকে রাজা স্পর্শ-মাত্র করতে পারে নি। তাদের চক্রান্ত এবং তাদের ঘটানো সর্বনাশের সামনে ইন্দ্রনীল একান্তভাবেই অসহায় বোধ করেছে। পদ্মাবতীর সঙ্গে নাট্য-সমাপ্তিতে যে মিলন ঘটল তাও দৈবী কৃপায়। সে জয় বিপক্ষের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ায় ইন্দ্রনীলের কিছুমাত্র কৃতিত্ব ছিল না। মূল নাট্যদ্বন্দ্বে ইন্দ্র-নীল অবলম্বন বা object মাত্র হয়ে থেকেছে, আশ্রয় বা subject হয়ে উঠতে পারে নি। নাট্যদ্বন্দ্ব যথেষ্ট ঘনীভূত না হবার এটি একটি প্রধান কারণ। নাটক কিংবা গল্পোপন্যাসের কাহিনী রূপকথা, এডভেঞ্চার বা গোয়েন্দা গল্পের তুলনায় শিল্পরূপের অনেক উৎকর্ষ সূচিত করে। কারণ এখানে ঘটনাবলীর মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে তা একান্তভাবেই ব্যক্তি-সাপেক্ষ। রূপকথায় ঘটনাপারম্পর্যে ক্ষীণ যুক্তিমূলকতা থাকে। গোয়েন্দা বা এডভেঞ্চারের গল্পে এই যুক্তিক্রমকে কিছু পুষ্ট করার চেষ্টা হয়। কিন্তু পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি, চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কাহিনীর যে যোগসূত্র থাকে তা নেহাৎই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু পরিণত শিল্পরূপে—নাটকে বা কথাসাহিত্যে গল্পের একটি দ্বিতীয় উপকরণের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। একে মানবিক উপকরণ (human element) বলা চলে। একদিকে ঘটনা অন্যদিকে মুখ্যপাত্রপাত্রীদের চরিত্র—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে এদের প্লট গঠিত হয়। চরিত্রের বিশিষ্ট প্রবণতা ঘটনার সৃষ্টি করে, সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসে। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, সমস্যার বিবর্তনে চরিত্রের অন্তর্লোকে তরঙ্গোদ্বেলতার সৃষ্টি হয়। এর প্রতিফলন আবার ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। চরিত্রবিবিক্ত ঘটনার বিকাশ এখানে অসম্ভব; ঘটনাবিবিক্ত বায়বীয় চরিত্রগতি অভাবনীয়। এই কারণেই নাটকাদি শুধু গল্প বলে না, গল্পকে উপলক্ষ করে

জীবনজিজ্ঞাসার গভীরে প্রবেশের সাধনা করে। পদ্মাবতী নাটকের কাহিনী-গ্রন্থনে চারিত্রিক উপকরণটির সম্পূর্ণ অভাব ঘটেছে এমন মনে করা ঠিক নয়। নানাবিধ বিচ্যুতি সত্ত্বেও শচী-মুরজা-রতি ঘটনাংশকে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং ঘটনার বিকাশে যতটা চিত্তোদ্বেলতা অনুভব করেছে তার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিচরিত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কিন্তু ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর প্রেম, মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের কাহিনী শুধুই ঘটনাবর্ত। এই ঘটনাগুলির মানসিক প্রতিক্রিয়ার কিঞ্চিৎ বিবর্ণ, মামুলী ও প্রাণহীন পরিচয় নাট্যমধ্যে থাকলেও ঘটনার গতিনিয়ন্ত্রণে তাদের কিছুমাত্র ভূমিকা নেই। ইন্দ্রনীল বা পদ্মাবতীর কোন আচরণ (ইন্দ্রনীলের সৌন্দর্যবিচার নয়, ঐ আচরণের সঙ্গে তার চরিত্রের কোন যোগ নাট্যকার স্থাপিত করতে পারেন নি) ঘটনাকে প্রভাবিত করে নি, তাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে টানাপোড়েনে নাটকটির কাহিনী-নির্মিত ঘটে নি, তাদের স্বাতন্ত্র্যের ছাপ নাটকটির সারা দেহের মধ্যে কোথাও পড়ে নি।

তিন। নাটকের মধ্যে এমন পরিবেশসৃজনকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে পারেন নি মধুসূদন যেখানে নাট্যদ্বন্দ্ব স্থগিত থেকেছে। শর্মিষ্ঠায় এ জাতীয় ঘটনাংশ যতটা স্থান অধিকার করেছিল, পদ্মাবতীতে তা নিঃসন্দেহে অনেক-খানি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। প্রথমত, বিদূষককে আশ্রয় করে নাট্যমধ্যে যে অংশগুলি সংযোজিত হয়েছে তা সর্বাংশে অপরিহার্য ছিল না। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক নাট্যদ্বন্দ্বের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতভাবে শুধু হাস্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে মঞ্চে দেখা দিত। অবশ্য রাজার সহচর হিসেবে তার মনোলোকের অনুভূতি ও আবেগের উচ্ছ্বাস তাকে আশ্রয় করে কোন কোন সময়ে প্রকাশ পেত। শর্মিষ্ঠা নাটকের বিদূষক সংস্কৃত নাটকের এই সাধারণ কাঠামোকে একান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছে। পদ্মাবতীতে বিদূষক অন্তত একটি দৃশ্যে তার স্বভাবসিদ্ধ ও ঐতিহ্যানুগ হাস্যরস পরিবেশন করতে গিয়ে নাট্যদ্বন্দ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মাহেশ্বরীপুরীতে নৃপতির অমৃতফল চুরি করায় রক্ষকেরা যখন বিদূষককে আক্রমণ করল তখন সে আত্মরক্ষার্থে ইন্দ্র-নীলের কাছে এসে উপস্থিত হল এবং ফলে ইন্দ্রনীল এতদিন যে আত্মগোপন করেছিল তা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে গেল।—(তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)। ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলনে ছদ্মপরিচয় যে বাধার সৃষ্টি করেছিল তা এইভাবেই বিদূরিত হল। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বিদূষক বিরহী রাজার বেদনা-প্রকাশের সাক্ষী হয়ে সংস্কৃত নাট্যে প্রচলিত বিদূষকের কর্তব্য করেছে।

এ ছাড়া প্রথম অঙ্কের একটা দীর্ঘ সময় সে-ই রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকারূপে অবস্থান করেছে, চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সে আপন বীরত্ব প্রতিপাদনের জন্য কিছু কৌতুকপূর্ণ প্রচেষ্টা করেছে এবং এই দুটি স্থানই সম্পূর্ণত নাট্যদ্বন্দ্বের বাহিরে। তা ছাড়া পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শচীতীর্থে শচী এবং অপ্সরাদের কথোপকথন কিছুটা স্থান জুড়ে বসেছে। এই অংশটির সঙ্গে নাট্যদ্বন্দ্বের যেমন কোন সম্পর্ক নেই তেমনি রসের দিক থেকেও কোন সঙ্গতি নেই। তবে নাট্যকাহিনীর সহিত নিঃসম্পর্কিত এ জাতীয় অংশের পরিমাণ বর্তমান নাটকে অনেক কমে এসেছে।

পদ্মাবতীতে মধুসূদনের নাট্যকলার সাধনা যে একধাপ অগ্রসর হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রথম প্রমাণ এর নাট্যকাহিনীর নিটোল ঘটনা-গ্রন্থনে। অন্য নানা দিকেও এই অগ্রগতির চিহ্ন আছে।

এক। বিবৃতির স্থানে প্রত্যক্ষ ঘটনার আমন্ত্রণে উপস্থাপন-ভঙ্গিতে অনেক বেশি নাটকীয়তা এসেছে। শর্মিষ্ঠায় ঘটনার প্রত্যক্ষতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিহার করা হয়েছে; সুদীর্ঘ প্রকৃতি-বর্ণনা, স্বগতোক্তিতে ঘটনার বিবরণ-দান এবং গীতিধর্মী উচ্ছ্বাসপ্রকাশ প্রাধান্য পেয়েছে। পদ্মাবতীতে এদের পরিমাণ কমেছে এবং তুলনামূলকভাবে ঘটনাসংঘর্ষের প্রত্যক্ষতা অধিক স্থান জুড়ে বসেছে। প্রথম অঙ্কের নারদপ্রদত্ত স্বর্ণপদ্মের অধিকার নিয়ে শচী, মুরজা এবং রতির কলহ প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পাওয়ায় চরিত্র-সংঘর্ষের রস নাটকীয় সৌন্দর্য লাভ করেছে। রাজা ইন্দ্রনীলের বিচারকে প্রভাবিত করবার জন্য তিন দেবীর সাগ্রহচেষ্টাও প্রত্যক্ষত ব্যক্ত হওয়ায় উপভোগ্য হয়েছে। দেবীত্রয়ের প্রস্থানের পরে বিদূষককে ভয় দেখাবার জন্য ইন্দ্রনীলের যে কৌতুকাভিনয় তাও প্রত্যক্ষ কর্ম (direct action) হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ইন্দ্রনীল এবং পদ্মাবতীর সাক্ষাৎকার ঘটাতে দ্বিধা করেন নি কবি। স্বপ্নে দৃষ্ট যে কাম্য হয়ে উঠেছিল তাকে প্রত্যক্ষত দেখবার মানস-তরঙ্গোদ্বেলতায় নাটকীয় রসের সম্ভাবনা থাকে। নাট্যরস সৃষ্টিতে কবি যথেষ্ট সাফল্য লাভ না করলেও প্রত্যক্ষতা এড়িয়ে পরোক্ষ বিবরণের পথ ধরেন নি এটি তাঁর ক্রমবর্ধমান নাট্যচেতনার প্রমাণ। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রক্ষকদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিদূষক যেভাবে ইন্দ্রনীলের আশ্রয়গ্রহণ করেছে তাতে ঘটনাংশ বেশ তীব্রতা তথা নাটকীয়তা লাভ করেছে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কলি কর্তৃক পদ্মাবতী-

হরণ এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে পদ্মাবতীকে ইন্দ্রনীলের মৃত্যুসংবাদ দানে হৃতচেতন করবার চেষ্টা ঘটনাগত প্রত্যক্ষতায় তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। শর্মিষ্ঠার আলোচনায় দেখেছি যে অনুরূপ ঘটনাগর্ভ প্রত্যক্ষতা ক্বচিৎ দু'একটি ক্ষেত্রে মাত্র আত্মপ্রকাশ করেছে, অধিকাংশ সময়ে বিবৃতি-বর্ণনায় কাজ সেরেছেন কবি।

অবশ্য পদ্মাবতীতে বিবৃতি-বর্ণনার আধিক্য কোথাও নাট্যরসের হানি ঘটায় নি এমন মনে করার কারণ নেই। নাটকের মধ্যে বিবৃতি-বর্ণনার প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। কিছু ঘটনা-বিবরণের আশ্রয় নাট্যকারকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। নাট্যদ্বন্দ্বের প্রধান অংশকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ ঘটনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে হয়। গৌণ এবং প্রাসঙ্গিক অংশই মাত্র বিবৃতির রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু সে বিবৃতিও ঘটনাসংঘর্ষের ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে প্রকাশ পাবে যাতে এর নিস্তরঙ্গ বিবৃতিধর্ম অনেকটা আবৃত হয়ে যায়। পূর্ব ঘটনার বিবরণ বা মঞ্চের অন্তরালে সংঘটিত বিষয়ের সংবাদ নাট্যদ্বন্দ্বের বিকাশে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই সব সংবাদকে মূল কাহিনী থেকে স্বতন্ত্র আকারে উপস্থিত করেন না। মূল কাহিনীর ঘটনার সঙ্গে তাকে কৌশলে বিন্যস্ত করেন। মধুসূদন কোনকালেই সে জাতীয় কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন নি,—সে জাতীয় নাট্যকারের মনই তাঁর ছিল না। শর্মিষ্ঠার চেয়ে স্বল্প হলেও পদ্মাবতীর বিবৃতি-বর্ণনায়ও আদর্শ নাট্যরূপের তুলনায় আধিক্য আছে। পদ্মাবতীর স্বগত উচ্ছ্বাসে আমরা যখন স্বপ্নে দৃষ্ট ইন্দ্রনীলের প্রতি তার চিত্তপ্রবণতার সংবাদ পাই তখন তাকে পরিহার্য বলে মনে করতে পারি না। কিন্তু রতি যখন সেই স্বপ্ন দেখাবার সংবাদ দেয় কিংবা শচী-মুরজার কাছে রতির কৌশলে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর আয়োজনের খবর পাই তখন নাট্যরসহীন বিবৃতি হিসেবে এদের গণ্য করি। কঞ্চুকীর কাছ থেকে অন্তঃপুরের মহিলারা স্বয়ম্বরের আয়োজন সংবাদ শুনেছে। কিন্তু সংবাদ এখানে হৃদয়রসের সহযোগ লাভ করেছে। কয়েকটি নারীর চিত্ত-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে উপস্থিত হওয়ায় এই সংবাদ দান নাট্যপ্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, কিন্তু একান্ত নাট্যাবেদনশূন্য হয়ে থাকে নি। মানবকের স্বগত সংলাপে যেখানে ইন্দ্রনীলের স্বপ্নদৃষ্ট বালিকার প্রতি অনুরাগ এবং ছদ্মবেশে দেশভ্রমণ ও মাহেশ্বরীপুরী আগমনের সংবাদ পাই, কিংবা রাজকুমারীর অসুস্থতানিবন্ধন স্বয়ম্বর ভেঙে দেবার কথা কঞ্চুকীর মুখে জানতে পারি সেখানে এদের বিবৃতি-ধর্ম প্রকট হয়ে নাট্যরসের হানি ঘটিয়েছে। স্বয়ম্বর সভা ভেঙে যাবার দৃশ্যটির নাট্যসম্ভাবনা ছিল প্রচুর। বিশেষ করে চতুর্থ অঙ্কে

অসন্তুষ্ট ও অপমানিত নৃপতিদের ইন্দ্রনীলের রাজ্য আক্রমণের উপযুক্ত কারণ এই ঘটনার মধ্যে সৃষ্টি করা যেত।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য দুটি নাট্যগুণে দুর্বল। রাজা অর্ধ-স্বগতোক্তিতে পদ্মাবতীকে হারিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। অথচ পদ্মাবতী-হরণের সংবাদ প্রাপ্তির মুহূর্তে রাজার অন্তর-বেদনা যে নাটকীয় তীব্রতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারত তাকে পরিহার করেছেন কবি। ঘটনার সাতদিন পরে তিনি ইন্দ্রনীলকে দর্শক-পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। ফলে নাটকীয় আকস্মিকতার রস সম্পূর্ণই বিনষ্ট হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মুরজার কন্যাসম্পর্কিত সমস্যার সমাধান ঘটেছে। মুরজা দৃশ্যান্তরালে বসুমতীর কাছে সংবাদ পেয়েছে এবং সে-সংবাদ পাঠককে জানিয়েছে। এই পরোক্ষতা মুরজার পার্শ্বসমস্যার ক্ষেত্রে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। কিন্তু রতির চেষ্টায় ভগবতীর নির্দেশে যখন মূল নাট্যসন্ধির চরম গ্রন্থিটি উন্মোচিত হল নারদের মাধ্যমেই সংবাদ আকারে তা পরিবেশন করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বিবদমান দুই পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নাটকীয় রসসৃষ্টির বিশিষ্ট সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নি। রতি অন্তরালেই থেকে গিয়েছে। পরবর্তী দৃশ্যে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর নাটকীয় সাক্ষাৎকারের সুযোগ ছিল। এই সাক্ষাৎ-সম্ভাবনাকে একবার প্রতিহত করে নাট্যকৌতূহল বৃদ্ধি করেছিলেন কবি :—

> "পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য! সখি, তাই ত। বিধাতা কি তবে এতদিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন? (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? (রোদন।)
>
> সখী। প্রিয় সখি, চল, আমরা ঐ বৃক্ষবাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না। [উভয়ের প্রস্থান]।"

কিন্তু এ কৌতূহল নিবৃত্ত করা হয় নি। বহুলোকের সামনে প্রণয়ীযুগলের সাক্ষাৎ একটা সামাজিক সম্মিলনে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘকাল অন্তরমধ্যে পোষিত আবেগ আকস্মিক মুক্তিতে কম্পিত হয় নি।

দুই। দুইয়ের অধিক চরিত্রের একই সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিতি ও কথোপকথন নাটকীয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা জটিলতা সৃষ্টি করে; একটা ঘনত্বের (Third dimension) বোধ আনে। শর্মিষ্ঠা প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। শর্মিষ্ঠা নাটকের

বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে স্বগত-সংলাপ, অর্ধ-স্বগতোক্তি (অর্থাৎ একান্ত বন্ধুজনের কাছে হৃদয়োদ্ঘাটন) এবং দুই ব্যক্তির কথোপকথন। পদ্মাবতীতে দুইয়ের অধিক পাত্রপাত্রী একসঙ্গে কথা বলে বহুমুখী মনোভাবের সংঘাতে ঘন নাট্যরস সৃষ্টি করেছে অনেকগুলি ক্ষেত্রে। প্রথম অঙ্কের শচী, মুরজা, রতির আলাপে অবশ্য যথেষ্ট নাট্যরস প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু নারদের আগমন এবং স্বর্ণপদ্মটি উপস্থিত করার সঙ্গে ঘটনার পরিমণ্ডল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল। চারটি চরিত্রের অন্যোন্য আলাপে নাটকীয়তা ঘনীভূত হবার সুযোগ পেল। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে এই তিন দেবীর আলাপকালেও নাটকীয় উদ্বেলতা-সৃষ্টিতে কোথাও বাধা হয় নি। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পদ্মাবতী, সখী এবং ছদ্মবেশিনী রতিকে একই সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত করা হলেও তিনজনের পারস্পরিক কথোপকথন নেই। রতি ও পদ্মার আলাপকালে সখী নীরব থেকেছে। পরের দৃশ্যে কঞ্চুকী, পরিচারিকা ও সখীর কথোপকথনে কিছু বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজা-সখী-পদ্মার, দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজা-বিদূষক ও উদ্যান রক্ষকদের, চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কলি-পদ্মা-সখীর, দ্বিতীয় দৃশ্যে কলি-শচী-মুরজার পারস্পবিক কথোপকথনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মধুসূদন তিনচরিত্রসমন্বিত দৃশ্যের নাটকীয় সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে না পারলেও এই পদক্ষেপ যে নাট্যকলার দিক থেকে উন্নতি সূচিত করে তাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুই চরিত্রের আলাপে নাট্যরস তত প্রকাশ পায় নি। কখনও পদ্মাবতী সখীর সঙ্গে নর্মালাপ করেছে, কখনও বেদনার উপলব্ধি সখীর সাহচর্যে অর্ধ-স্বগতোক্তির মত উচ্চারিত হয়েছে, কখনও রাজা বিদূষকের কাছে আপন চিত্তোচ্ছ্বাস উদ্ঘাটিত করেছে। দুই ব্যক্তির কথোপকথনে চরিত্র-বৈপরীত্য বা ভিন্নমুখী উদ্দেশ্যের সংঘাতে নাট্যরস কখনও কখনও জমে উঠেছে; যেমন বিদূষক ও নেপথ্যচারী রাজার কণ্ঠস্বর প্রথম অঙ্কে লঘু নাট্যরস সৃষ্টিতে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। তবে যখনই তিন ব্যক্তির অন্যোন্য আলাপের সুযোগ তৈরী করে তুলতে পেরেছেন কবি তখনই নাটকীয়তা সার্থকতর ও গভীরতর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তিন। প্রকৃতিবর্ণনা পদ্মাবতীতে শর্মিষ্ঠার তুলনায় স্বল্প হয়ে এসেছে। নাটকের প্রারম্ভে ইন্দ্রনীলের মুখ দিয়ে বিন্ধ্যপ্রদেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করানো হয়েছে। কিন্তু তা একান্ত সংক্ষিপ্ত। নাটকের শুরুতে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটুকু দেশকালের বিশিষ্টতার সুরটি ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। নাটকীয়তার পক্ষ

থেকে এই অংশের বিরুদ্ধে বড় রকমের আপত্তি তোলা চলে না। কিন্তু দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সখীর সঙ্গে পদ্মাবতীর আলাপে সন্ধ্যার বর্ণনাপ্রসঙ্গে অস্তাচলগামী সূর্য, নবোদিত রোহিনী নক্ষত্র, মালতী-মধুকরের প্রণয়সম্পর্ক, কুমুদিনীর চন্দ্র-কামনা প্রভৃতি নানা মামুলি প্রসঙ্গের কৃত্রিম ভঙ্গিতে অবতারণা স্থান পেয়েছে। ইন্দ্রনীলও বিদূষকের কাছে কমলিনী-সূর্যের প্রণয়-কথার বর্ণনা করেছে। সেখানেও কৃত্রিম সংস্কৃতানুকারিতাই প্রকট। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শচী-রম্ভার সংক্ষিপ্ত কথোপকথনেও অনুরূপ বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে। এ জাতীয় বর্ণনার সংখ্যাল্পতা এবং আকারগত সংক্ষিপ্ততা পদ্মাবতীকে নাট্যরসের দিক থেকে কিছু উন্নত স্তরের স্থষ্টিতে রূপান্তরিত করেছে।

চার। শর্মিষ্ঠায় স্বগতোক্তি শুধু চিত্তরুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় নি; ঘটনাসংঘর্ষে প্রকাশিতব্য অনেক কিছুই স্বগতোক্তির সাহায্য নিয়েছে। পদ্মাবতীতে স্বগতোক্তি অনেক কম এবং মাঝে মাঝে তা ঘটনা ও চরিত্রদ্বন্দ্বের স্থান অধিকার করলেও তার পরিমাণ বেশি নয়। গোটা দৃশ্য জুড়ে স্বগতোক্তি এ নাটকে নেই; এবং শুধুমাত্র স্বগতোক্তির সহায়তায় কোন ঘটনাসন্ধিকেই প্রকাশ করা হয় নি, স্বগত-সংলাপকে ঘটনাংশের সহযোগিতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পদ্মাবতীর স্বগত-সংলাপের মুখ্য অংশ কতকগুলি চরিত্রের হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং চিত্তের অন্দরের গুপ্ত অভিপ্রায় প্রকাশের কাজে লাগান হয়েছে; দু-একটি ক্ষেত্রে (যেমন নারদ-শচীর সাক্ষাৎকালে, প্রথম অঙ্ক) স্বগতোক্তিকে প্রকৃত নাটকীয়তা স্থষ্টির কাজেও কবি লাগিয়েছেন।

পাঁচ। শুধুমাত্র নাট্যকাহিনীর প্রয়োজনে পথিক, নাগরিক প্রভৃতি কাহিনীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত চরিত্রের আমদানী করে তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঘটনার অগ্রগতি দেখান নাটকীয় কৌশল হিসেবে সবচেয়ে অপরিণত। শর্মিষ্ঠায় সেরূপ পরিস্থিতির আশ্রয় নিয়েছেন মধুসূদন, পদ্মাবতীতে কবির নাট্যকৌশল অপরিণতির এই স্তর অতিক্রম করে গিয়েছে।

ছয়। অপর দু-একটি ক্ষেত্রে "Contrast in parallelism", "Dramatic irony" প্রভৃতি নামে পরিচিত নাট্যকৌশল ব্যবহারের প্রবণতা কবি দেখিয়েছেন পদ্মাবতীতে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শচী ইন্দ্রনীলের দুর্ভাগ্যে উল্লাস প্রকাশ করে বলেছে, "কি আহ্লাদের বিষয়। কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ করো বনবাস

দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ কচ্যে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড দুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্। তা তুই এখন আপন কুকর্মের ফল বিলক্ষণ কর্য়ে ভোগ কর্। তোকে আর এখন কে রক্ষা করবে?" কিন্তু এই দৃশ্যে অল্প পরেই দেবী ভগবতীর নির্দেশে তাকে ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে এবং পরবর্তী দৃশ্যে তাকে নিজেকে অগ্রবর্তিনী হয়ে ইন্দ্রনীলের হস্তে পদ্মাবতীকে সমর্পণ করতে হয়েছে। Dramatic irony-এর নিদর্শন হিসেবে একে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ছদ্মবেশী ইন্দ্রনীলের সাহচর্যে মাহেশ্বরীপুরীতে এসে বিদূষক স্বয়ম্বর উৎসবের নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত হবার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। বিদূষকেরা (বিশেষ করে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে বাংলা নাটকের অভ্যন্তরে যারা প্রবেশাধিকার পেয়েছে) এরূপ ভোজনলোলুপতা প্রকাশ করতেই অভ্যস্ত, তাই প্রথমত এই ব্যাপারটি একান্ত মামুলী বলেই দর্শক-পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল তার চরিত্রের লোভের এই অতিরেক এবং স্বয়ম্বর-নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চনাজাত অস্থিরতাই শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনীলের সত্যকার পরিচয় ব্যক্ত করে নাট্যঘটনাকে উদ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করল। একে ঠিক Dramatic irony বলে চিহ্নিত করা না গেলেও নাট্যকৌশলের এই সূক্ষ্ম কারুকর্ম সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

শচী ও মুরজার চরিত্রের বৈপরীত্যগর্ভ সমধর্ম (contrast in parallelism) নাট্যরসের বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। উভয়েই ইন্দ্রনীলের সর্বনাশ সাধনে ব্রতী। কিন্তু এদের চরিত্রগত পার্থক্য ঐ উদ্দেশ্যগত ঐক্যের মধ্যেও সাফল্যের সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

অবশ্য উপরের আলোচনা থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হবে না যে পদ্মাবতী নাট্যকলার দিক থেকে উন্নত পর্যায়ের রচনারূপে গৃহীত হবার যোগ্য। আমি শুধু এটিই দেখাতে চেয়েছি দুর্বলতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও নাট্যকলাকৌশলের প্রয়োগে মধুসূদনের হাত যে ক্রমপরিণতির পথে তাতে সন্দেহ করা চলে না।

॥ পাঁচ ॥

পদ্মাবতী নাটকটি মূলত গম্ভীর রসের। সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুযায়ী গাম্ভীর্যপূর্ণ নাটকেও বিদূষকের সহায়তায় লঘুরস পরিবেশন করা কর্তব্য। পদ্মাবতীতেও

বিদূষক এবং হাস্যরসাত্মক পরিবেশ আছে। সংস্কৃত নাট্যাদর্শের অনুসরণের পথ ধরে যেটুকু অপরিহার্য তা থেকে কবি শর্মিষ্ঠা রচনাকালে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু পদ্মাবতীতে লঘুরস অতটা প্রথানুগ নয়। এখানে বিদূষকের কৌতুকসৃষ্টি শর্মিষ্ঠার চেয়ে কিঞ্চিৎ উন্নততর হতে পারে। সেটি কিছু বড় কথা নয়। পদ্মাবতী নাটকের কৌতুকরসের পরিবেশন বিদূষকের চরিত্র ছাপিয়ে গোটা নাটকটির প্রাণরসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বিদূষক বীরের ছদ্মবেশে যে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করেছে তা বিদূষকোচিত ভাঁড়ামির ঊর্ধ্বস্তরে ওঠে নি, নাট্যকাহিনীর অন্দরমহলে এ প্রসঙ্গের আসন নয়, বাহির মহলে এর স্থিতি। কিন্তু এ নাটকে বিদূষকের উপরে কৌতুকসৃষ্টির ভার অর্পণ করে অপরাপর চরিত্র গাম্ভীর্যের মুখোস পরে ঘুরে বেড়ায় নি। স্বয়ং নায়ক রাজা ইন্দ্রনীল পর্যন্ত নাটকটির প্রথমার্ধে দীর্ঘ স্থান জুড়ে কৌতুকলীলায় যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা বয়স্যের সঙ্গে নৃপতির নর্মলীলার সীমায় বদ্ধ থাকে নি। এই অংশটির আস্বাদ লঘু, কিন্তু উপভোগ্য। কবির ভাষা এখানে প্রাণবন্ত এবং নাটকীয়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মাহেশ্বরীপুরীর কঞ্চুকী সখী এবং পরিচারিকার সঙ্গে যে রসিকতা করেছে তার স্মিত মাধুর্যও উপেক্ষণীয় নয়।

এই নাটকে কৌতুকরস সৃষ্টিতে মধুসূদন মোটামুটিভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমাঙ্কে বিদূষকের চরিত্রের ভীতি, লোভ, ক্ষুদ্রতা ও উপস্থিত-বুদ্ধির সঙ্গে রাজার চরিত্রের কৌতুকপ্রিয় তারল্যের লঘু সংঘাতেযুগপৎ হাস্যরস ও নাট্যরস জমে উঠেছে। ভাষাভঙ্গির মুহুর্মুহু পরিবর্তন—প্রতিধ্বনির সহিত আলাপে তরল ঘরোয়াভাব ও রসিকতা করার প্রলোভন প্রকট, আবার যক্ষরাজের সঙ্গে আলাপের ভাষায় আতঙ্ক ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সমস্ত জিনিসটাই তৈরী করে তোলা, ইন্দ্রনীলের রহস্য করবার ইচ্ছা থেকেই জন্মেছে, পাঠক-দর্শক কিছু অস্পষ্টভাবে হলেও প্রথমাবধিই তা বুঝতে পারে। অস্পষ্টতাটুকু থাকবার ফলে নাটকীয় কৌতুহলও একেবারে লোপ পায় না। অবশ্য দ্বিতীয়াঙ্কে কঞ্চুকীর ভূমিকায় হাস্যরসের যে রূপ তার নাট্যগুণ এতটা প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু কল্যাণকামী প্রসন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা কোথাও ভাঁড়ামিতে রূপান্তরিত হয় নি। নারদের কলহপ্রবণ চরিত্র, নারদের আগমনে শচীর মনোভাব এবং অন্তর্যামী নারদের তা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হওয়া, তিন দেবীর স্বর্ণপদ্মটি তথা সুন্দরীশ্রেষ্ঠার গৌরবলাভের জন্য ব্যাকুলতা, বিচারককে

ঘুষ দিয়ে দলে টানবার চেষ্টাও কৌতুকগত এবং ভাষাব্যবহারেও সে রসটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন কবি। তা ছাড়া এ নাটকে বিদূষকের প্রথানুগ রসিকতাও কম স্থান জুড়ে বসে নি। সে সব অংশে মৌলিকতা না থাকলেও বিবর্ণ নীরসতাও নেই। এই নাটকের দশটি দৃশ্যের মধ্যে ছয়টি দৃশ্যে হাস্যরসের আয়োজন আছে, তবে একটি দৃশ্যে (শেষ দৃশ্য) তা নেহাৎই সংক্ষিপ্ত। অন্য পাঁচটি দৃশ্যে হাস্যরসের স্থান নগণ্য নয়।

পদ্মাবতী নাটকে হাস্যরসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

এক। এ নাটকে কৌতুকরসসৃষ্টি বেশ প্রাধান্য পেয়েছে।

দুই। এ নাটকের গাম্ভীর্য রসটুকু প্রেমসম্পর্কিত। ইন্দ্রনীলের বীর্যবত্তা ভোজবাজীর মত ক্ষণস্থায়ী এবং পরোক্ষ সংবাদে সীমাবদ্ধ। শচী-মুরজা-কলির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তার বলিষ্ঠতার আস্বাদ নাট্যকার দিতে পারেন নি। প্রণয়রসের চিত্রণ, ঘটনাগ্রন্থন, পরিবেশসৃজন ও সংলাপে কৃত্রিমতাই বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে। কলির শয়তানি (villainy) ছাড়া অন্যত্র প্রণয় প্রভৃতি গম্ভীর রসাবেদনে বিবর্ণতা বিরক্তিকর, কিন্তু কৌতুকপ্রাণ অংশগুলির প্রাণোত্তাপ অনুভব করা যায়। এ নাটকে কবি প্রণয়ীযুগলকে একবার মাত্র সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছেন, শেষ দৃশ্যে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর সাক্ষাতের যে সুযোগ এসেছিল তাকে কবি ইচ্ছা করে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। আসলে কবি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। শর্মিষ্ঠার নিষ্প্রাণ বিবর্ণতার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সংস্কৃত নাট্যসুলভ প্রণয়দৃশ্য রচনায় মধুসূদনের কবিচিত্তের সহজ সমর্থন ছিল না। দ্বিতীয় নাটকে তা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। শকুন্তলার মত সংস্কৃত প্রণয়-নাটকের আদর্শ সামনে রেখেও কবি উদ্দীপনা অনুভব করেন নি। কৌতুকরসের রাজ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ণবন্ত প্রাণচাঞ্চল্যে নাটকের সেই অপর প্রান্তই ধন্য হয়েছে।

তিন। পদ্মাবতী নাটক থেকেই মধুসূদন কৌতুকরস সৃজনের দিকে এক বিশেষ প্রবণতা অনুভব করতে থাকেন। গাম্ভীর্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতানুকারিতা থেকে মুক্তির যখন অন্য কোন পথ আয়ত্ত ছিল না তখন কৌতুকরসের বহুলতার আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেছেন বলেই মনে হয়। পদ্মাবতী থেকেই কৌতুকসৃষ্টিতে তিনি নিপুণতা অর্জনের সাধনা করতে থাকেন, এবং অন্তত পক্ষে একটি ক্ষেত্রে কৌতুকপ্রাণ নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সফলও হয়েছেন। প্রসঙ্গত

উল্লেখযোগ্য যে পদ্মাবতী নাটক শেষ হবার পূর্বেই কবি তাঁর প্রহসন দুটি লিখেছিলেন। সর্বাংশে নাট্যসাফল্য প্রথম তিনি লাভ করলেন কৌতুকরসের রাজ্যে প্রবেশ করার পরেই। যখন তিনি কৃষ্ণকুমারীর ন্যায় যথার্থ গম্ভীররসের নাটক লিখতে গেলেন তখনও কৌতুকরসকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গ্রহণ না করে পারলেন না। কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রসঙ্গে এরূপ অভিযোগ তুলে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন যে ট্রাজেডিকে কমেডির শৈলীতে শুরু করায় দুই রসের সঙ্গতি বিধান করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি এবং সেই কারণেই নাটকটি মূলত ব্যর্থ হয়েছে।[১০] কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন পদ্মাবতী থেকেই কৌতুকরসের প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখিয়ে আসছেন। পাশাপাশি মনে রাখবার মত যে কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি আদৌ লঘুতাকে প্রশ্রয় দেন নি, সেখানে মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের রাজ্যে কবির বিহার।

চার। সাহিত্যিক সাফল্যের দিক থেকে অবশ্য এর ফলে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। নাটকের মূল রসাবেদনে যে গাম্ভীর্য তার সঙ্গে এই লঘুতার সঙ্গতি বিধান ঘটেছে কিনা তার বিচার করা কর্তব্য। পদ্মাবতী নাটকে কৌতুকরসের আধিক্য মূল রসের গাম্ভীর্যকে বিঘ্নিত করে নি। এই নাটকের গাম্ভীর্যেও অবশ্য ট্রাজেডির কুলিশ-কঠোরতা নেই, আছে কমেডির প্রসন্ন আস্বাদ। এর পশ্চাতে ঈর্ষা-দ্বেষ-ক্রোধ এবং ক্ষতিসাধনের যে প্রবৃত্তি তরঙ্গিত হচ্ছিল, কলির চরিত্রে ও কার্যে এবং শচীর চরিত্রে ছাড়া অন্যত্র তা প্রধান হয়ে ওঠে নি। কলি কর্তৃক পদ্মাবতী-হরণ এবং তার ফলে বিচ্ছেদ-বেদনার সৃষ্টি হলেও রোমান্টিক কমেডির প্রচলিত আদর্শকে তা বড় ছাপিয়ে যায় নি। এই নাটকে কোথাও সমস্যা এত গুরুতর হয়ে ওঠে নি যাতে কিছুমাত্র লঘুত্বের অবকাশ না থাকে। অবশ্য পদ্মাবতী-হরণের ঠিক পরেই কৌতুকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদূষকের নকল বীরত্বাভিনয় সুর কেটে দেয়। তা না হলে সামগ্রিকভাবে এ নাটকে রসাবেদনের ঐক্য বিঘ্নিত হয় নি। কৌতুকরস এর সমস্যার সম্ভাব্য তীব্রতাকে কমিয়ে দিয়ে গ্রীক পুরাণকথার নিদারুণ ট্রাজেডিগর্ভ কাহিনীকে কমেডিতে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছে। এর ফলে ইন্দ্রনীলের চরিত্রে তারুণ্যের চাপল্য এসেছে, কিন্তু পদ্মাবতীর কাহিনীতে কোনরূপ অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় নি।

এইসব নানা কারণেই পদ্মাবতীর কৌতুকরস একটা মামুলী প্রসঙ্গমাত্র হয়ে থাকে নি।

॥ ছয় ॥

পদ্মাবতী নাটকটি কবি সম্পূর্ণ করবার পূর্বেই প্রহসন দুটি রচনা করবার কাজে হাত দিয়েছিলেন। নাটকটির চার অঙ্ক শেষ হবার পরে তিনি বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে প্রহসন রচনায় হাত দেন এবং সম্ভবত ঐ ক্ষুদ্র নাটক দুটি দ্রুত শেষ করেন। পদ্মাবতীর পঞ্চম অঙ্ক প্রহসন দুটি সমাপ্ত হবার পরে রচিত হয়[১১]।

সতর্ক পাঠকের চোখে, পদ্মাবতী নাটক কিছুটা দ্বিধাদীর্ণ বলেই মনে হবে। প্রহসন দুটি রচনার পূর্বের অংশ এবং পরের অংশের মধ্যে সুরের, রচনারীতির এবং নাট্যাদর্শেরও পার্থক্য ধরা পড়বে। নাটকটির প্রথম চার অঙ্কের আটটি দৃশ্য প্রহসন রচনার পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছিল। পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য দুটি প্রহসনোত্তর পর্বে রচিত। প্রহসন দুটি রচনার মধ্য দিয়ে কবি নাট্যসৃষ্টিতে বিস্ময়কর সমুন্নতি লাভ করলেন। সংস্কৃত আদর্শে গ্রীক কাহিনী নিয়ে পরিকল্পিত প্রায় সমাপ্ত পদ্মাবতী তাঁর নবজাগ্রত নাট্যচেতনাকে আর ধরে রাখতে পারছিল না। নাটকটি নেহাৎ সমাপ্ত করার জন্যই তিনি শেষ দুটি দৃশ্য লিখেছিলেন। অবশ্য নাট্যকাহিনীতে এর ফলে শিথিলতা আসে নি, কারণ মূল পরিকল্পনাটি তিনি পূর্বাহ্ণেই করে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ দুটি দৃশ্য (চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটিও অনুরূপ দুর্বলতাপূর্ণ) রচনা হিসেবে এতটা অনুকরণসর্বস্ব ও বিবর্ণ যে মনে হয় লেখকের শিল্পী-প্রাণের কিছুমাত্র উল্লাস এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় নি।

প্রথমত, নাটকের এই অংশ প্রত্যক্ষ সংস্কৃতানুসরণসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। পদ্মাবতীর শেষ দৃশ্য কালিদাসের শকুন্তলার সমাপ্তি-অংশের দুর্বল অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়ত, চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাট্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে শর্মিষ্ঠার তুলনায় যে সীমাবদ্ধ সাফল্য তিনি দেখিয়েছেন পঞ্চম অঙ্কে তার চিহ্নমাত্র নেই। শচীতীর্থে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা (শচী-রম্ভা সংবাদ) বিরক্তির কারণ হয়েছে। এই দৃশ্যে বিবদমান পক্ষের মধ্যে যখন সন্ধি স্থাপিত হল তখন রতিকে অনুপস্থিত রেখে নারদের দ্বারা পরোক্ষ সংবাদে কাজ সেরেছেন কবি। পরবর্তী দৃশ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে নায়ক-নায়িকার আকস্মিক মিলনের নাটকীয়তা পরিহার করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত আটটি দৃশ্যের পাঁচটিতেই কৌতুকরস এক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। পঞ্চম অঙ্কের দুটি দৃশ্যে এ রসের একরূপ প্রবেশ

নিষেধ। অথচ এ নাটকে কৌতুকরস সৃষ্টিতে কবি বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছেন।

চতুর্থত, চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাট্যসমস্যা যেমন দানা বেঁধেছিল যেন নারদের সংবাদ বহনের মধ্য দিয়ে একরূপ জোর করে এবং খানিকটা অকস্মাৎ তার সমাধান হয়ে গেল।

সব দেখে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে মধুসূদন এই নাটকের সমাপ্তি-অংশ যেমন-তেমন করে শেষ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, পূর্বের চার অঙ্কের অনুরূপ সতর্কতা ও যত্নের পরিচয় দেন নি।

॥ সাত ॥

পদ্মাবতী নাটকের চরিত্র চিত্রণের সামগ্রিক বিচারে শর্মিষ্ঠা থেকে কবি কিছু অগ্রসর হয়েছেন একথা বলা চলে। তবে সে অগ্রগতির পরিমাণ খুবই সামান্য।

এ নাটকে উল্লেখযোগ্য মানব-চরিত্র মাত্র তিনটি—ইন্দ্রনীল, পদ্মাবতী এবং বিদূষক। দেব-দেবীর চরিত্রসংখ্যাই বেশি—শচী, মুরজা, রতি, নারদ এবং কলি। মানব-চরিত্রাঙ্কনে গ্রীক চরিত্রের একান্ত বাহিরের কাঠামোর উপরে সংস্কৃত নাট্যসুলভ ভাবনাভঙ্গিই জয়যুক্ত হয়েছে। দেবদেবীর চরিত্রসৃষ্টিতে গ্রীক চিন্তার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নৃপতি ইন্দ্রনীল এ নাটকের প্রধান পুরুষ চরিত্র। দেবীদের সৌন্দর্যের বিচারক হিসেবে, প্রণয়ের দেবীর আশীর্বাদে ও চেষ্টায় সুন্দরী নারীকে পত্নীরূপে লাভ করায় সে স্পষ্টত গ্রীক পুরাণ কথার প্যারিসের দেশীয় সংস্করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অপর একটি চরিত্র-আদর্শও এখানে অনুসরণ করা হয়েছে, তা হল মোটামুটিভাবে সংস্কৃত নাটকের ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন নায়কের: আদর্শ।[১২] প্রত্যক্ষত দুষ্মন্ত থেকে সে আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রীক প্যারিসের চরিত্র হোমার থেকে আরম্ভ করে গ্রীক সাহিত্যিকদের অনেকেই চিত্রিত করেছেন। তাদের মধ্যে বড় ঐক্য নেই। কেউ কেউ প্যারিসকে যথার্থ পৌরুষের অধিকারী বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ (স্বয়ং হোমরও) কামদুর্বল প্যারিসের কাপুরুষোচিত মূর্তির চিত্র এঁকেছেন। গ্রীক পুরাণ-কথার প্যারিসে কামনাপ্রাধান্য ও বীর্য দুই গুণেরই সমন্বয়। প্যারিসের যতটুকু অনুকৃতি ইন্দ্রনীলের চরিত্রে আছে তা নেহাৎই

কাহিনীগত, চরিত্রগত নয়। আবার কালিদাসচিত্রিত দুষ্মন্তের সঙ্গেও সে কোনক্রমেই উপমিত হবার নয়। দুষ্মন্তে কামনা ও সংযমের অন্তর্লীলার সুন্দর চিত্র আছে। প্রেম যার কাছে খেলা তার অন্তরের প্রকৃত বিরহ-যন্ত্রণার তীব্রতায় ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রনীলের চরিত্রের মধ্যে এমন কোন বিশিষ্টতা নেই যার দ্বারা তার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হতে পারে।

ইন্দ্রনীল-চরিত্রের লঘু লীলাময়তার যে পরিচয় প্রথম অঙ্কে মিলছে তার উপভোগ্যতা অস্বীকার্য এবং রচনাভঙ্গির গুণে সেই অংশটুকু এই ব্যক্তির চরিত্রের অকৃত্রিম অংশ বলে মনে হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভাবলে ইন্দ্রনীলের রাজকীয়তা, প্রেম, যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়, বিরহ-যন্ত্রণার উপলব্ধি (কবি যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা এই চরিত্রে করতে চেয়েছেন, তারা সফলভাবে চরিত্রলক্ষণ হয়ে উঠেছে কিনা তা পরে আলোচ্য) প্রভৃতির সঙ্গে এই লঘু লাস্যরূপের কোন সঙ্গতি বিধান করাই সম্ভব নয়। কোন তরলমতি তরুণের পক্ষে যা সম্ভব দায়িত্বশীল ও বীর্যবান নৃপতির চরিত্রে তা হাস্যকর।

কিন্তু ইন্দ্রনীলের চরিত্রের অন্যান্য লক্ষণ ভাষাব্যবহারের কৃত্রিমতায় এবং অন্য নানা কারণে অবিশ্বাস্য। তাকে বীররূপে চিত্রিত করবার চেষ্টা আছে। দুষ্মন্তের স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রের সাহায্যার্থে গমন তার প্রণয়ীচরিত্রে মহিমা দিয়েছে। সম্ভবত অনুরূপ গৌরব সৃষ্টি এক্ষেত্রেও কবির উদ্দেশ্য ছিল। তা ছাড়া ট্রয়যুদ্ধের ছায়াপাত এখানে ঘটেছে। কিন্তু ছায়ামাত্র। কলির একটি স্বগত-সংলাপে এই জাতীয় প্রসঙ্গকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায় না। বিশেষত, কোন গম্ভীর কাজে এই একবার মাত্র ইন্দ্রনীল অবতীর্ণ হবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তাও কবি নেপথ্যবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আসলে ইন্দ্রনীলের চরিত্রে কোনরূপ সক্রিয়তার সৃষ্টি করতে পারেন নি মধুসূদন। সে বিচার করেছে—কিন্তু সে-বিচার নারী-সৌন্দর্যের, এবং তাতেও কিছুমাত্র নিরপেক্ষতা এবং প্রলোভনজয়ী ব্যক্তিত্বের পরিচয় নেই। স্বপ্নে এক সুন্দরী নারীকে দেখে সে তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে, এবং ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে। পরিশেষে সেই নারীর সন্ধান সে পেয়েছে কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রেখেছে। তার এই আচরণসমূহের কোন অনিবার্যতা নেই। যেন এই ব্যক্তির চরিত্রভিত্তিতে কোনরূপ মাধ্যাকর্ষণের বন্ধন নেই। ছদ্মপরিচয়ের ফলে যখন পদ্মাবতীর সঙ্গে তার মিলনে বাধার সৃষ্টি হল তখনও সে কর্মহীন বিমূঢ়তায় মধ্যযুগীয় ভীরু বাঙালিসুলভ পশ্চাতমুখিতা দেখিয়েছে।

পদ্মাবতীর প্রতি তার আকর্ষণ যতই তীব্র হোক না কেন রাজবংশসম্ভূত নয় এমন কোন নারীকে সে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারে না। এই ঘটনা তার চিত্তে সামান্য ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে মাত্র, মর্মবিদারী অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় নি। প্রবৃত্তির প্রবল সংক্ষোভ ইন্দ্রনীলের চরিত্রে নেই, আবার সে নিবৃত্তিমার্গের উপাসকও নয়। নিজের জীবন-ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টাও তার মধ্যে বড় নেই (নেপথ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধজয় ব্যতীত)। এর ফলে তার বিরহক্রন্দনের কৃত্রিমতা, মিলনানন্দের নিরুত্তাপ পাঠককে পীড়িত করে।

পদ্মাবতীর চরিত্রটি সম্পূর্ণত বৈশিষ্ট্যবর্জিত। গ্রীক গল্পে হেলেনের যে স্থান বর্তমান নাটকে পদ্মাবতী তার স্থলাভিষিক্তা। কিন্তু হেলেনের চরিত্রের কোন লক্ষণই এই চরিত্র-পরিকল্পনায় গ্রহণ করেন নি কবি। হেলেনের সৌন্দর্যের কামনার অতি তীব্র বহ্নিজ্বালা এবং প্রচণ্ড ধ্বংস-শক্তির স্থানে এসেছে একটা কোমল, প্রসন্ন, প্রশান্ত ভাব। এই সৌন্দর্য, এই কমনীয়তা এবং এই কল্যাণবুদ্ধি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সাহিত্যের নায়িকা-চরিত্রের লক্ষণ হিসেবে চলে আসছে। সহৃদয়তা, সহনশীলতা এবং অপরের প্রতি দয়া তার কথায় কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। তার প্রেমোপলব্ধি রূপ পেয়েছে ইন্দ্রনীলকে দেখে আকস্মিক মূর্ছায়। বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তার অন্তর্লোকের যে চিত্র অঙ্কিত হবার সুযোগ ছিল কবি সাধ্যমত তাকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন। সব মিলে পদ্মাবতী পাঠকচিত্তে একটা শান্ত কোমল ভাবরস সঞ্চারিত করে। কবি তাঁর পূর্বসৃষ্ট শর্মিষ্ঠা-চরিত্রের কতকাংশের অনুসরণ করেছেন এখানে। তবে দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের দহনে সর্বংসহা শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতীর চেয়ে সার্থকতর সৃষ্টি। কিন্তু ভাষার কৃত্রিম সংস্কৃতানুকারিতায় এই একান্ত মামুলি পরিচয়ও যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি।[১৩]

বিদূষক মানবক সংস্কৃত সাহিত্যের অতি পরিচিত ভাঁড়। শর্মিষ্ঠার মাধব্যের তুলনায় মানবককে কিছু অধিকতর সুযোগ দিয়েছেন কবি। কিন্তু তার চরিত্রের মধ্যে স্বরূপগত কোন পার্থক্য আসে নি। তবে মানবক মাধব্যের তুলনায় বেশী জীবন্ত। তার ভোজনলোলুপতা একাধিক দৃশ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজার প্রণয়-বেদনার সাহচর্য দানকালে অবশ্য রাজার প্রতি তার ভালবাসার পরিচয় মিলেছে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মানবকের গম্ভীর সুরের সহানুভূতিতে প্রাণোত্তাপের স্বল্পতা লক্ষণীয়। অন্যত্র স্থূল হলেও

মানবক উপভোগ্য। তার ভাষার লঘু গতিময়তা ও কিঞ্চিৎ দুষ্ট বুদ্ধির সহযোগ আস্বাদ সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। তার লোভ এবং ভীতি নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজার সাহচর্যে লঘু পরিস্থিতির উদ্ভাবনে অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে। তবে প্রথমাঙ্কে ইন্দ্রনীলের অনুপস্থিতিতে তার নিন্দাবাদে তার চরিত্রের সুবিধাবাদী ভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করেছে। অপর একটি ক্ষেত্রে শাঠ্যের মাধ্যমে নিজেকে মহাবীর বলে প্রমাণ করবার চেষ্টায় হাস্যরসাত্মক চরিত্রে প্রত্যাশিত নির্দোষ নির্মলতার হানি ঘটেছে।

পাঁচটি দেবচরিত্র এ নাটকে স্থান পেয়েছে। দেবচরিত্রগুলি কর্মচাঞ্চল্যে ও রূপায়ণ নৈপুণ্যে সফলতর সৃষ্টি। এই চরিত্রগুলির পিছনে গ্রীক দেব-ভাবনার প্রভাব অনুভব করা যায়। মধুসূদন হিন্দু কলেজে বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির রস আকণ্ঠ পান করেছিলেন। বিদেশী সাহিত্যের রাজ্যে তাঁর মানসভ্রমণে কোথাও বাধা ছিল না। কাজেই প্রথম তারুণ্য থেকেই তিনি হিন্দু দেব-কল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় হিন্দুধর্মের সঙ্গে শেষ সম্পর্ক-সূত্রও ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি এবারে খোলা মনে শুধুমাত্র কাব্য-সৌন্দর্যের দিক থেকেই দেবচরিত্রগুলিকে দেখতে লাগলেন। গ্রীক দেবচরিত্রের প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ বর্তমান নাটকে দেখা গিয়েছে তা এসেছে প্রধানত গ্রীক কাহিনীর সঙ্গে সংযোগের জন্য।[১৪]

গ্রীক মহাকাব্যে এবং পুরাণে দেবদেবীর চরিত্রের যে রূপ ধরা পড়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা রুক্ষতা, উগ্রতা ও প্রবৃত্তির প্রবলতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় পৌরাণিক দেবকুলের অধিকাংশই যেমন কল্যাণশক্তির অধিকারী তাঁরা তা নন। ভারতীয় আর্য দেবতাদের মধ্যে যাঁরা উগ্র তাঁরাও শুধুমাত্র রুদ্র নন, শিবও। শান্ত এবং শান্তোগ্র এই দুই জাতীয় দেবতার সঙ্গেই আমরা অধিক পরিচিত। ভারতীয় প্রধান দেবতাদের কয়েকজনের মধ্যে মানবপ্রবৃত্তির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেলেও অনেকেই ঊর্ধ্বতর স্তরের অধিবাসী। নিবৃত্তিমার্গে তাঁদের স্থিতি, মানব-স্বভাবের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব অনেক। গ্রীক দেবতারা যেমন মানবজীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে প্রবেশ করে ঘটনাস্রোতে অংশগ্রহণ করেন, এমন কি মানবজীবনকে অবলম্বন করে নিজেরাই কলহ ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়, ভারতীয় দেবলোকে সেরূপ ঘটনা বিরল। এখানে ন্যায়-অন্যায় কল্যাণ-অকল্যাণের বোধটি এতই স্পষ্ট এবং দেবতারা সবাই এমন নিঃসংশয়িত ভাবে ন্যায়ধর্মের

পক্ষপাতী যে তাঁদের মধ্যে দলাদলির প্রশ্ন ওঠে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বা লঙ্কাকাণ্ডে দেবতাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই (কৃষ্ণ বা রাম মানবদেহ ধারণ করে জন্ম-জরা-মৃত্যুর বশীভূত মানবে রূপান্তরিত হয়েছেন)। কিন্তু তাদের সমষ্টিগত সমর্থন কোনদিকে তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু দেবমণ্ডলী নিরপেক্ষ নন। অনেকে তো প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের হয়ে লড়তে গিয়ে দেবতারা পরস্পরকে আহত করেছেন।[১৫]

গ্রীক দেবতারা আসলে মানবচরিত্রের বিচিত্র প্রবৃত্তির ও শক্তির এক একটি অতিগুণিত (magnified) সংস্করণ। শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার গুণে তারা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে স্থান লাভের অধিকারী।

মধুসূদন দেবচরিত্র গঠনে গ্রীক ভাবধারার অনুকরণ করায় (কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দেবদেবীর নাম ব্যবহার করায়) সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে গ্রীক আদর্শ গ্রহণ করায় শান্ত, কোমল ও কল্যাণরূপিণী নারীচরিত্রের প্রথানুগ রাজ্য থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। এর ফলেই প্রবৃত্তিতাড়িত নারীচরিত্র রূপায়ণের প্রথম সুযোগ তিনি করে নিতে পেরেছিলেন। হিন্দু পুরাণানুযায়ী চরিত্রাঙ্কন করলে এই সম্ভাবনাকে কার্যকর করা যেত না।[১৬]

হেরা গ্রীক দেবরাজ জিউসের পত্নী। ভারতীয় পুরাণে দেবরাজ ইন্দ্র (যদিও তাঁর সঙ্গে ক্ষমতা এবং দেবসমাজে সম্মান প্রভৃতির দিক থেকে জিউসের গুরুতর পার্থক্য আছে)। এই কারণে ইন্দ্রপত্নী শচীর নামে তিনি হেরাকে তাঁর কাহিনীতে উপস্থিত করেছেন। শচীর চরিত্রে নারীর আত্মাভিমান, কলহপ্রবণতা, ঈর্ষা অত্যন্ত নগ্ন ও অসংযত মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। নারদকে দেখেই সে মনে মনে তার নিন্দা করেছে, নারদ মনের কথা জানতে পারেন ভেবে চিন্তিত হয়ে মুখে তার বন্দনা করেছে। স্বর্ণপদ্ম লাভের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার জন্য সে চেষ্টার ক্রটি করে নি। দেবরাজপত্নী হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চেয়েছে। অপর দেবীদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়েছে; বিচারককেও সে-ই প্রথম প্রলোভিত করতে চেয়েছে। ইন্দ্রনীল রতিকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মনোনীত করায় ক্রোধে এবং ঈর্ষায় আত্মহারা হয়ে পড়েছে। ইন্দ্রনীলের চরম ক্ষতিসাধনের জন্য নৃপতিদের উত্তেজিত করবার ব্যবস্থা করেছে। নিরপরাধ কোমলস্বভাব পদ্মাবতীকে পর্যন্ত নানারূপ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তাকে স্বামীর নিকট থেকে হরণ

করে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। রতির সাহায্য না পেলে অরণ্যে পদ্মাবতীর জীবনহানি ঘটাও অসম্ভব ছিল না। নাট্যশেষে শচী প্রতিনিবৃত্ত হল ভগবতীর নির্দেশে ; তার নিজের চরিত্রে পরিবর্তনের সামান্যতম স্পর্শ লাগে নি। শচী-চরিত্রকে সামাজিক ন্যায়-অন্যায় ও নীতিবোধের দৃষ্টিতে দেখলে প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হিসেবে কোন চরিত্রের সাফল্যবিচার নীতিবোধের অনুসরণ করে চলে না। বহু সদ্‌গুণে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও পদ্মাবতী আমাদের কাছে আকর্ষণীয় চরিত্র বলে মনে হয় না ; কারণ বহুগুণের সমবায়ও তার নির্জীবতা ঘোচাতে পারে নি। কোন চরিত্র রচনাগুণে যদি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়, যদি মনে হয় ছুরিকাঘাতে তার বুক থেকে রক্তপাত হবে তবে সে সৃষ্টি অন্তত ন্যূনতম সাফল্য লাভ করেছে বলা যায়। শচী-চরিত্রে প্রাণধর্ম বর্তমান। সে অত্যন্ত হীন চরিত্রের নারী, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানশূন্য হয়ে শত্রুর উৎসাদন চেষ্টায় তার নিবৃত্তি নেই। পাষাণপ্রাণ নিষ্ঠুরতা নিয়ে সে এমন সব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছে, শুধুমাত্র ঈর্ষা, হিংসা ও ক্রোধ-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে সে অপরের এমন ক্ষতিসাধন করতে চেয়েছে যাতে দেবোচিত মাহাত্ম্যের চিহ্নমাত্রও নেই। তাতে মানব-স্বভাবেরও সবচেয়ে অন্ধকারবাসী অংশগুলির নিঃসংশয়িত প্রাধান্য। কিন্তু এই মনোভাবগুলির তাড়নায় শচীর চিত্ত প্রতিনিয়ত তরঙ্গিত হয়েছে, ঈর্ষার জ্বালায় সে দগ্ধ হয়েছে, ক্রোধে অধীর হয়েছে। এই চিত্তোদ্বেলতার প্রকাশ ঘটায় শচী-চরিত্র প্রাণবন্ত এবং সার্থক। তার সক্রিয়তার মূলে রয়েছে প্রাণকটাহে নিত্য আবর্তিত এই মানসিকতা।

মুরজা চরিত্রটি গ্রীক দেবী প্যালাস আথেনীর স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু প্যালাস আথেনীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কিছুমাত্র মুরজার মধ্যে প্রকাশ পায় নি। মুরজা মধুসূদনের মৌলিক সৃষ্টি। চরিত্রটির মধ্যে বাঙালিসুলভ মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে, কবির ব্যক্তি-চিত্তের উত্তাপও সেই সূত্র ধরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

মুরজা যক্ষেশ্বর-পত্নী, ঐশ্বর্যের দেবী। বিশেষ করে ঐশ্বর্যের দেবীকে এ নাটকে মাতৃমহিমার গৌরব দান করার পিছনে কবি-হৃদয়ের কোনরূপ আত্ম-প্রতিফলন আছে কি না ভাববার মত। বাঙালির ভাবনা ঐশ্বর্যের দেবতাকে কল্যাণের দেবতা বলে মনে করে নি। তাই কুবের ও লক্ষ্মীর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি তারা করেছে। যেখানে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য সেখানে কুবেরের

রাজ্য কিন্তু সম্পদের উপরে যেখানে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সেখানেই লক্ষ্মীর বসতি। মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনে নব্য মানববাদের সাধনার সঙ্গে পার্থিব ভোগবাদের চর্চা ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়েছিল। এই সূত্র থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচেতনায় ঐশ্বর্যের প্রতি এক সুতীব্র বাসনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তি-জীবন থেকে তাঁর কাব্যবোধের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল এই উপলব্ধি। পরবর্তীকালে তিলোত্তমাসম্ভবে ঐশ্বর্যাধিপতি কুবেরের মুখ থেকে পৃথিবীর প্রতি তিনি সুগভীর ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন। এখানে যক্ষরাজপত্নী মুরজাকে করে তুলেছেন মাতৃস্নেহের আধার।

অতি অল্পবয়সে মাতৃস্নেহবঞ্চিত হওয়ায় কবির মনে মাতৃস্নেহ সম্পর্কে একটা বিশেষ সংস্কার সৃষ্ট হয়েছিল। পরিণত বয়সের কাব্যেও নানাভাবে তিনি নারীর মাতৃরূপের চিত্র এঁকেছেন, এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টি কাব্য-সৌন্দর্য থেকে ভ্রষ্ট নয়। এমন কি মেঘনাদবধ কাব্যে তাঁর প্রিয়পাত্র মেঘনাদের হত্যাকারী লক্ষ্মণও মাতৃস্নেহসম্পাতে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। মুরজার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গগুলো সম্পূর্ণ ভোলা যায় না।

মুরজাও শচীরই দলভুক্ত। কিন্তু শচীর সঙ্গে তার চরিত্রের মূলগত পার্থক্য আছে। শচীরই মত সে ইন্দ্রনীলের বিচারের ফলে অপমানিত হয়েছে। শচীর সাহচর্যে সে ইন্দ্রনীলের ক্ষতিসাধনে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু গোড়া থেকেই তার চরিত্রের মধ্যে শচী থেকে স্বাতন্ত্র্যের বীজ উপ্ত করেছেন কবি। মুরজার মাতৃহৃদয় তার শাপগ্রস্ত এবং নিরুদ্দিষ্টা কন্যার জন্য ব্যাকুল। সাময়িক-ভাবে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা এবং ইন্দ্রনীলের সর্বনাশ-সাধনে শচীর সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করার মধ্যেও মাতার সহজ স্নেহাতুরতার হানি ঘটে নি। তাই পদ্মাবতীর ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হতে তার হৃদয় রাজী হয় নি। পদ্মাবতীর সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কের কথা না জানলেও একটি কোমলপ্রাণ বালিকার প্রতি তার এই প্রীতিবর্ষণ যেন সহজভাবেই হৃদয়-কেন্দ্র থেকে উৎসারিত। শচীর সঙ্গে তুলনায় মুরজা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজেই পাঠকচিত্তে মুদ্রিত হয়। তবে মুরজার চরিত্রে ব্যক্তিত্বের, বড় অভাব। শচীর প্রবল প্রভাব এড়িয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই পদ্মাবতীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা জানার পূর্ব পর্যন্ত শচীর সহকারীত্ব করায় সে আপত্তি করে নি। সে পরিচয় প্রকাশ পাওয়ায় তার তীব্র অনুশোচনা কবি মোটামুটি প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন নাটকের পঞ্চমাঙ্কে।

দেবী-চরিত্র তিনটির মধ্যে রতি-চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য কম। গ্রীক পুরাণের

আফ্রোদিতি কামের দেবতা। স্বর্ণ আপেলের কাহিনীটিতে তার চরিত্রের নির্লজ্জ কামাতুরতাই প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতীয় পুরাণে কামদেবের পত্নী রতির কোন স্পষ্ট মূর্তি নেই।

ছদ্মবেশ গ্রহণ, ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর প্রণয়-সংঘটন, গহন অরণ্যে পদ্মাবতীর প্রাণরক্ষা প্রভৃতি নানা পরিস্থিতিতে তাকে দেখেছি। কবি গ্রীক আদর্শের অনুসরণ করেন নি, কামের সেই প্রগলভ রূপ ও বিবেকহীন মত্ততা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের পটভূমিতে রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না, মধুসূদনের নব্যরুচির প্রশ্নও এ ক্ষেত্রে আছে। কবি রতিকে তার নায়ক-নায়িকার পক্ষভুক্ত করে কোমল ও স্নেহশীলা করে তুলেছেন।

নারদের ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অনুজ্জ্বল নয়। তার কলহপ্রবণ চরিত্র-ধর্ম আবির্ভাব মাত্রই একটি স্বগতোক্তিতে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে,—"আমি মহর্ষি পুলস্তের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন করতেছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা যে যেমন কর্যে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্যেই আমি এই পর্ব্বত-সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ হয়েছে। এই যে সুবর্ণ পদ্মটি আমি মানসসরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে।" নারদ চরিত্রের এই ভাব-কেন্দ্রটি ভারতীয় লোকবিশ্বাসের অনুগ। ভূমিকার মধ্যে কৌতুকরসের যে উপাদান আছে, কবি তা মোটামুটি কাজে লাগিয়েছেন। যাত্রাপালায় নারদ মুনি ভাঁড় রূপে স্থূলহাস্য বিতরণ করে দীর্ঘকাল দর্শকজনের মনোরঞ্জন করেছে। কবি তাঁর কৌতুককর ভূমিকাটিকে কতকাংশে রক্ষা করেছেন কিন্তু স্থূলতা ও গ্রাম্যতাকে মার্জিত রূপ দান করেছেন।

কলি পদ্মাবতী নাটকের সবচেয়ে বিশিষ্ট চরিত্র। এ যাবৎ বাংলা নাট্যসাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টিতে সংস্কৃত আদর্শকেই প্রধানত অনুসরণ করা হয়েছে। পদ্মাবতীর দুটি চরিত্রে মধুসূদন প্রথম সংস্কৃত আদর্শের বাহিরে পুরোপুরি পদার্পণ করলেন। তার মধ্যে শচীর চরিত্রে গ্রীক প্রভাব বর্তেছে, আর ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের villain জাতীয় চরিত্র থেকে কলিদেবের চরিত্রের আদলটি কবি গ্রহণ করেছেন।

কলির সঙ্গে এই নাটকের মূল সমস্যার সম্পর্ক থাকার কথা নয়। শচীর

প্রতিশ্রুত পারিতোষিকের লোভে সে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর সর্ববিধ ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু তার চরিত্রের ভিত্তিতে অকারণে মঙ্গল, কল্যাণ ও সৌন্দর্যকে বিপর্যস্ত করে দেবার একটি কদর্য প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। স্বগতোক্তির মাধ্যমে সে আত্মপরিচয় দিয়েছে—

আমি কলি ; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায় !
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকার পা-দুখানি গড়ি তার আমি !
জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মন্থনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।

কল্যাণ ও সুন্দরের প্রতি এই অকারণ ও সহজাত বিতৃষ্ণাই ;কলির villainy-র মূল কথা। শুধুমাত্র শচীর কাছ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় সে আসে নি।

নির্দিষ্ট কর্ম সমাধানের (অর্থাৎ পদ্মাবতীর অপহরণের) পর চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে শচী কলিকে বিদায় দিলেও সে নিবৃত্ত হয় নি, শুধুমাত্র অপরের ক্ষতিসাধনের বিকারগ্রস্ত আনন্দে পদ্মাবতীকে সে ইন্দ্রনীলের মৃত্যুসংবাদ দান করেছে।

সব মিলে কলি-চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়েছে, পদ্মাবতী নাটকের মধ্যে এই চরিত্রই সৃষ্টিধর্মের দিক থেকে সার্থকতম।

পদ্মাবতী নাটকের গদ্য ভাষা শর্মিষ্ঠার তুলনায় সহজতর এবং মার্জিত ও কথ্যরীতির নিকটবর্তী হয়েছে—এরূপ অভিমত সমকালের অনেকে প্রকাশ করেছেন।[১৭] যোগীন্দ্রনাথ বসুও পরবর্তীকালে পদ্মাবতীর ভাষাকে

শর্মিষ্ঠার তুলনায় উৎকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কাছে পদ্মাবতীর ভাষা অনেক বেশী নাট্যগুণে সমৃদ্ধ বলে মনে হয়েছে।[১৪]

পদ্মাবতীর ভাষার পাশে শর্মিষ্ঠার ভাষা রেখে পাঠ করলে দেখা যায়,—এক। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে গদ্যলেখায় কবির হাত অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছে। ভাষা তুলনামূলকভাবে সহজতর হয়েছে, মার্জিত হয়েছে। জড় সংস্কৃতানুগত্য থেকে যেমন তাঁর ভাষা কতকটা মুক্ত হয়েছে, তেমনি সংস্কৃত বাক্য গঠনের শিথিলতা, উপমাদি আশ্রিত জটিলতা এবং ধীর গতি ও গম্ভীর চাল থেকে তুলনামূলক স্বাতন্ত্র্য ভাষাভঙ্গিতে প্রবেশ করেছে। সংস্কৃতরীতিসম্মত সাধু গদ্যের এই সব বিচিত্র প্রবণতা থেকে কবি এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। পদ্মাবতী এবং ইন্দ্রনীলের বিচ্ছেদ-বেদনা প্রকাশের ভাষায় কিংবা চন্দ্র, সূর্য, রোহিণী, কুমুদিনী, কমলিনী, সরোবর প্রভৃতির সম্পর্ক বর্ণনার ভাষারীতিতে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু পদ্মাবতীর ভাষায় অগ্রগতির লক্ষণ দৃষ্টি এড়ায় না। দুই। শর্মিষ্ঠার তুলনায় পদ্মাবতীর ভাষা কিছু নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য একথা স্মর্তব্য পদ্মাবতীর ভাষার নাট্যগুণ প্রকৃতপক্ষে বেশি নয়, শর্মিষ্ঠার তুলনায় সামান্য বেশি এইমাত্র। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে পদ্মাবতীর সংলাপের ভাষায় (১) আকারের হ্রস্বতা, (২) কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার স্বল্পতা, (৩) স্বগতোক্তির স্বল্পতা ও সংক্ষিপ্ততা, (৪) বিবৃতিমূলকতার তুলনায় ঘটনা-তরঙ্গের কিছু আধিক্য লক্ষণীয়। এমন কি কোন কোন পাত্রপাত্রীর সংলাপে তাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের সামান্য প্রতিফলন ঘটেছে।

এই নাটকে স্বগতোক্তিকে অন্তত একটি ক্ষেত্রে নাটকীয় করে তোলার চেষ্টায় কবি সফল হয়েছেন। কলহপ্রবণ দেবতা নারদের আগমনের ফলে প্রথমাঙ্কে শচী এবং নারদের মধ্যে স্বগতোক্তিতে এবং প্রকাশ্যে যে কথোপকথন চলেছে তা যেমন কৌতুককর তেমনি সংঘাতপ্রাণ—

"শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোত্‌থেকে এসে উপস্থিত হলো?—ওমা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে? (প্রকাশে) ভগবন, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম।...

নারদ। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকাল ফল। বর্ণ দেখলে চক্ষু শীতল

হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে-পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে, একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হতো কোন মতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম।"

কোথাও কোথাও স্বগতভাষণ অনাবশ্যক ভাবে স্থান জুড়ে বসেছে। রতির সংলাপে (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক) স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পদ্মাবতীর ইন্দ্রনীলের প্রতি আকৃষ্ট হবার সংবাদ পাই। এই দৃশ্যের ঘটনায় তা স্বভাবত প্রকাশ পেয়েছে, তাই এই স্বগতোক্তি পরিহায বলে মনে হয়। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কলি স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করেছে। সেখানে তা অপরিহার্য বলে মনে হয়, কারণ অন্য কোন উপায়ে কলির চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কিছু পরেই কলি স্বগতবাক্যে দেশ-বিদেশের রাজাদের উত্তেজিত করে ইন্দ্রনীলের রাজ্য আক্রমণের সংবাদ দিয়েছে। স্বগতোক্তিব উপরে তা সম্ভবাতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করায় বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে নি। এর পরেই কলি পদ্মাবতীকে হরণ করার গোপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত কবেছে আত্মগতভাবে। কিছু পরেই যা ঘটবে তাকে ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে সম্পূর্ণত টেনে বের করায় নাটকায় কৌতূহল বিনষ্ট হয়েছে।

তবে এ নাটকে শুধু স্বগতোক্তি দিয়ে আগাগোড়া পূর্ণ করে কোন দৃশ্য উপস্থিত করা হয় নি। শুধুমাত্র বিবৃতিপূর্ণ স্বগতোক্তির দ্বারা ঘটনা পর্যায়ের বড় বড় ফাঁক ভরাট করা হয় নি। তবে বিদূষকের স্বগতোক্তিগুলি তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘ। সেগুলি সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের সংলাপের ন্যায় কৌতুকরস সৃজনের উদ্দেশ্যে রচিত। প্রকৃত নাটকীয়তার সঙ্গে তার সম্পর্ক অল্প। কঞ্চুকীর অমিত্রাক্ষরে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ স্বগত সংলাপ নাট্য-প্রয়োজনে আসে নি, প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখবার আনন্দ ও উত্তেজনায় জন্ম নিয়েছে।

সংলাপে মাঝে মাঝে লঘু কথ্যরীতির ব্যবহার প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথমাঙ্কের বিদূষক-ইন্দ্রনীলের সংলাপ এবং তিন দেবীর সুন্দরী-শ্রেষ্ঠারূপে অভিহিত হবার আগ্রহ ও তৎসম্পর্কিত কলহের উল্লেখ করা চলে। বাংলা ভাষার মধ্যে যে গতিশীলতা, যে দুল্‌কি চাল তার প্রাণের সঙ্গে জড়িত কবি এই সব ক্ষেত্রে তা আবিষ্কার করে সার্থকভাবে সংলাপে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র লঘু ভাবপ্রকাশের জন্য কবি ভাষার কথ্যরীতিকে পূর্ণভাবে ধরে রাখতে পেরেছেন, গম্ভীর ভাব-ভাবনা ও উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃতানুকারীতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। কথ্যরীতির পূর্ণ শক্তি তিনি আয়ত্ত করতে চান নি অথবা পারেন নি।

যে কয়েকটি চরিত্রের সংলাপে চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ ছায়া পড়েছে তাদের মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় বিদূষকের। তার অসঙ্গত, লোভী, ভীরু, কৌতুকপ্রাণ ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিত্ব মোটামুটি উপযুক্ত ভাষার সহযোগিতা লাভ করেছে। কঞ্চুকীর সংলাপে বৃদ্ধের স্মিত হাস্যের অনুরণন কতকটা শোনা যায়। কলির নিষ্ঠুর চক্রান্তকারী মনোভাব তার সংলাপে, বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দে আবদ্ধ ভাষার গাম্ভীর্যে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে।

কবি পদ্মাবতীর সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেছেন। কবির সাহিত্য-জীবনে এই আবিষ্কারের দ্বিমুখী তাৎপর্য আছে। প্রথমত, নবীন ছন্দের এই উপলব্ধি তাঁর কাব্যসৃষ্টির দ্বারোদ্ঘাটন করল। দ্বিতীয়ত, নাটকের সংলাপ হিসেবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা জন্মাতে লাগল। পরবর্তীকালে নাটকে এই ছন্দের সংলাপ অপরিহার্য বলে তাঁর মনে হয়েছে। তবে পদ্মাবতীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার পরীক্ষা-নিরীক্ষামাত্র, কোন শিল্পরূপে তা ধন্য হয় নি। গদ্য ও কবিতাসংলাপ যে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে এ নাটকের কবিতা-সংলাপ সে দিকে দৃষ্টি রাখে নি। কবিতার ভাষা মানুষের আবেগোচ্ছ্বাসকে বেশি প্রকাশ করতে পারে, বিশেষ করে মানবানুভূতি ও আবেগের মধ্যে এমন সূক্ষ্মতা ও অনির্বচনীয়তা আছে গদ্য যার নাগাল পায় না। কবিতার ভাষা পাঠককে সে রাজ্যে পৌঁছে দেয়। সে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা কবির তখনও হয়েছে বলে মনে হয় না।

পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কয়েকটি পাত্র-পাত্রী অংশত কথা বলেছে। কঞ্চুকীর মুখেই তিনি প্রথম এই ছন্দোবদ্ধ সংলাপ বসিয়েছেন। শচী, নারদ, মুরজা দু-একবার এই ছন্দের ব্যবহার করেছে। কিন্তু প্রধানত কলিই এই ছন্দে কথা বলেছে। অবশ্য সেও শুধুমাত্র কবিতায় কথা বলে নি, গদ্য ভাষার আশ্রয়ও নিয়েছে। সম্ভবত কলির কঠিন নিষ্ঠুর, চক্রান্তপ্রবণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার জন্য এই অভিনব ছন্দভঙ্গি প্রয়োগ করার ইচ্ছা কবির ছিল। কিন্তু এই কাল পর্যন্ত কবি শিল্পসৌন্দর্যে তাঁর উদ্দেশ্যকে ধরে রাখতে পারেন নি।

পদ্মাবতী নাটক হিসেবে শর্মিষ্ঠার চেয়ে পরিণত, কিন্তু সে পরিণতির পরিমাণ যৎসামান্য। পদ্মাবতীতেও কবি সংস্কৃত নাট্যরাজ্যে পরিক্রমণ করেছেন। একটি বিদেশী কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলার

নিকটবর্তী হবার সাধনা একটি বাইরের ব্যাপার হয়ে থেকেছে আদৌ সিদ্ধিতে পৌঁছায় নি।

[১]"Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Sometime ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first act is finished."

—[গৌরদাস বসাককে লেখা পত্রাংশ]

[২]প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের "পদ্মাবতী" প্রত্যাশিত সমাদর পায় নি। লিখিত হবার কয়েক বৎসর পরে এই নাটকটি যখন প্রথম অভিনীত হয়েছিল তখন সমসাময়িক কোন কোন পত্র (যেমন "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়") এ নাটকের কাহিনী-ভাগের নিন্দা করেছিল। [বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।] যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সব দিক থেকে নিকৃষ্টতর রচনা "শর্মিষ্ঠা" নিয়ে প্রচুর উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলেন, অথচ এই নাটকটি সম্বন্ধে কোন উৎসাহ দেখান নি। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর "শর্মিষ্ঠা"কেই শ্রেষ্ঠতর নাটক বলে স্পষ্টতই অভিহিত করেছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসুও এই নাটকটিকে শর্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারীর তুলনায় দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন, "নাটকীয় লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে পদ্মাবতী মধুসূদনের অপর দুইখানি নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

[৩]গৌরদাস বসাককে লেখা মধুসূদনের পত্রাংশ।

[৪]"উচ্চশ্রেণীর পুরুষ-চরিত্রগুলির ভাষা সংস্কৃত, মধ্যমশ্রেণীর পুরুষ ও মেয়েদের ভাষা 'শৌরসেনী'-আদি প্রাকৃত। চাকরাণী বা খুব নিচু-শ্রেণীর লোকদের ভাষা ছিল 'মাগধী', 'পৈশাচী' প্রভৃতি।"

—[মনোমোহন ঘোষ : প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা]

[৫]বৈদ্যনাথ শীল : বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা

[৬]এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের নিম্নোদ্ধৃত বিশ্লেষণ তাৎপর্যবহ বলে মনে হবে। নাটক হিসেবে এদের আবেদন যে কত পৃথক, এমন কি বিপরীত প্রান্তবাসী সে কথা মেনে নিলেই এই উভয় ভূখণ্ডে নাটক নামে প্রচলিত রচনাগুলির স্বরূপ-লক্ষণ চিনে নেওয়া যাবে।—"ভারতীয় আদর্শের কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে 'রস'ই ছিল মুখ্য, মানুষের জগৎ ছিল গৌণ। মানুষেরই যে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সর্ব্ব মানুষের মধ্যে সংস্কাররূপে

বিরাজমান—মানুষের সেই জীবনকে, তাহার সেই রক্তমাংসঘটিত হৃদয়-সংবেদনাকে গৌণ করিয়া, সে নাটকে একটি নির্ব্বিশেষ 'রস'-বস্তুর দিকেই দৃষ্টি রাখা হইত। য়ুরোপে তাহা হয় নাই…উৎকৃষ্ট নাটকের (য়ুরোপীয় মতে—ক্ষেত্র গুপ্ত) প্রধান লক্ষণ এই যে, নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে, মানুষের জীবন; ভাবের বা চিন্তার জীবন নয়—নিয়ত আবর্ত্তমান, সৃষ্টির চক্রের ঘূর্ণাবেগ-তাড়িত, দেহ-মন-প্রাণের উৎক্ষেপ-আক্ষেপময়, গতি-শক্তিমান জীবন। অর্থাৎ, সৃষ্টির নিগূঢ় উৎস হইতে যে দুর্ধর্ষ প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে একটি বিরাট কর্ম্ম-যজ্ঞশালায় পরিণত করিয়াছে—মানুষের মধ্যেও সৃষ্টির সেই প্রাণধারা যে-জীবনকে নিত্য গতিমান ও বেগবান রাখিয়াছে—সেই জীবনের রাগ-বিরাগ, আশা-দুরাশা সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির দ্বন্দ্ব যে অপূর্ব রসরূপে মানুষের হৃদয়গোচর হয়—নিজেরই দেহ-মন-প্রাণের প্রবল অথচ অবশ ঘূর্ণাস্রোতে সে চকিতে যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহা ভাবজীবন বা মনোজীবনে সম্ভব নয়, তাহা ওই প্রবৃত্তিময় জীবনেই সম্ভব; নাটকের রস এই রহস্যের রস, তাই নাটক এই জীবনেরই দৃশ্য-রসরূপ।"

—[নাটকীয় কথা : সাহিত্য-বিচার]

৭রবীন্দ্রনাথের "শকুন্তলা" প্রবন্ধ ("প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থ) দ্রষ্টব্য।

৮রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার মধ্যে কিঞ্চিৎ তাত্ত্বিকতা প্রবেশ করলেও এক যুগের মহাকবির অন্তর্দৃষ্টিতে অপর যুগের মহাকবির সৃষ্টি-তাৎপর্য যে অনেকখানি ধরা পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ "প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যান দিয়েছেন। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ থেকে এখানে সামান্য একটু উদ্ধৃত হল, "শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটা নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখিলাম; সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতামৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং সৌন্দর্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিশীর্ণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে। প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত। যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী। এই সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য হইতে মুক্তি পাওয়াই ভালো; ইহা চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি

নাই ; অপরাধমত্ত গজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল ; আলোড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল। বাকি রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা তপস্যার দ্বারা, সেই স্বর্গ যখন জিত হইল তখন আর-কোনো শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।" মধুসূদনের পক্ষে কালিদাসের কাব্যের অন্তর্দেশস্থ এ জাতীয় জীবনচেতনায় পৌছান খুব সহজ ছিল না। তাঁর মনের তারগুলো মূলত অন্যসুরে বাঁধা ছিল।

[৯]এ প্রসঙ্গে সাহিত্যশাস্ত্রবিদ্ হাড্‌সনের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"The special difficulty of the denouement is now apparent. The problem of the dramatist will always be, how to keep the interest alive after the spectators have become aware that the resolution has begun and that the current of events have definitely set in towards a catastrophe. We can now understand why Fielding anathematised "the man who invented the fifth acts", and why...the tendency with many modern playwrights is to extend the rising action and reduce the resolution to their utmost possible limits." মধুসূদনও সম্ভবত ঐ একই কারণে অনুরূপ গঠনরীতির ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

[১০]..."মাইকেল শেক্‌সপীয়ারের কমেডীর শৈলীতে নাটকটির আরম্ভ করিয়া ট্রাজেডীতে সমাপ্ত করিয়াছেন। তাই এই দুই শৈলীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিভেদ বা বিরোধ আছে, তাহাই রসাভাস ঘটাইয়া নাটকটির সৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছে।" —[বৈদ্যনাথশীল : বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা]

[১১]এ বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

[১২]নায়ক-লক্ষণ বিবৃত করতে গিয়ে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রবিদেরা কয়েকটি শ্রেণীতে তাদের ভাগ করেছেন। কীথের ভাষায় সেই শ্রেণীগুলির পরিচয় নিম্নরূপ, "...all are noble or self controlled (ধীর), a characteristic not universally found in heroines, but they are distinguished as light hearted or gay (ললিত), calm (শান্ত), exalted (উদাত্ত) and haughty or vehement (উদ্ধত)। ধীরোদাত্ত

নায়ক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "…The exalted hero is a character of great strength and nobility, firm of purpose, but free from vanity forbearing and without egotism"—[The Sanskrit drama]। অবশ্য প্রথম অঙ্কে বিদূষকের সঙ্গে কৌতুকাচরণে ইন্দ্রনীলের যে লঘুতার পরিচয় আছে তা ধীরোদাত্ত অপেক্ষা ধীরললিত নায়কেরই স্বভাবসঙ্গত।

[১৩]পদ্মাবতীর চরিত্রকল্পনার প্রশংসা করে যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, "যেখানেই মধুসূদন পদ্মাবতীকে অবতারিত করিয়াছেন, সেখানেই তাহার সরলতার ও মাধুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।…কোমলতা ও করুণা ব্যতীত পদ্মাবতীর চরিত্রে আর কোন উল্লেখযোগ্য গুণ নাই। হিন্দু বালিকার চরিত্রে আর কি বা থাকা সম্ভব?" —[মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত।]

[১৪]মেঘনাদবধ কাব্যে দেশীয় কাহিনীতে ভারতীয় দেবদেবীর চরিত্রাঙ্কন করতে বসেও তিনি গ্রীক-ভাবনার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। সেখানে কবি গ্রীক-চিন্তার দ্বারা আরও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন বোঝা যায়।

[১৫]পৌরাণিক অভিধান: সুধীরচন্দ্র সরকার এবং The Gods of the Greeks: Carl Kerenyi

[১৬]বীরাঙ্গনা কাব্যের নারীচরিত্রগুলিতে প্রবৃত্তিপ্রধান চরিত্রসৃষ্টির এই ধারা বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে এবং মৌলিক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

[১৭]The style is neat and colloquial (perhaps in some places a little too much so)…"

—[কবিকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্রাংশ]

[১৮]"পদ্মাবতীর ভাষা অনেকাংশে শর্মিষ্ঠার ভাষা অপেক্ষা নাটক রচনার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইয়াছে। ইহা সরল এবং অপেক্ষাকৃত কৃত্রিমতাশূন্য।" —[মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত]

চতুর্থ অধ্যায়

একেই কি বলে সভ্যতা
বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ

মুক্তি : কৌতুকের রাজ্যে
আত্মনিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টিতে

॥ এক ॥

১৮৫৩ সালে বাংলাভাষায় প্রথম মৌলিক প্রহসন লিখলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এই ক্ষুদ্র নাটিকাটির নাম 'বাবু'। রচনা হিসেবে এটি একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু প্রথম যে মৌলিক প্রহসনটি কিছু নাট্যোৎকর্ষের পরিচয় দেয় এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে তা হল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব'। ১৮৫৪ সালে প্রহসনটি প্রকাশিত। মধুসূদনের প্রহসন দুটির রচনাকাল ১৮৫৯ সালের মধ্যভাগ এবং প্রকাশকাল ১৮৬০ সাল। প্রহসনকাররূপে মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলা প্রহসনকে সামান্যতা থেকে উদ্ধার করেছে। দেশীয় রীতির স্থানে যুরোপীয় আদর্শের নিঃসংশয়িত আমন্ত্রণ ঘটেছে তাঁরই সাধনায়।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে দুই শ্রেণীর কৌতুক-নাটকের (তথা ব্যঙ্গনাটকের) কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এরা হল প্রকরণ ও প্রহসন। প্রকরণের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এ, বি, কীথ বলেছেন—

> "The bourgeois comedy, Prakarana, is a comedy of manners of a rank below royalty · The subject matter is to be framed at his good pleasure by the poet. The hero should be a Brahmin, minister or merchant, who has fallen on evil days and is seeking through difficulties to attain property, love, and the performance of duty, in which he at last succeeds.…"

প্রহসন সম্পর্কে কীথ বলেছেন—

> "The farce, Prahasana,...has every sign of popular origin and vogue. The subject is the poet's invention ; it deals essentially with the tricks and quarrels of low characters

of every kind. There is but one act...the comic sentiment predominates.")

বাংলা নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে প্রহসন কথাটি কৌতুক ও ব্যঙ্গরসাত্মক সর্বাবধ নাটককে বোঝাবার জন্যই প্রযুক্ত হয়ে আসছে।

ইংরেজী সাহিত্যেও Farce, burlesque, extravaganza এবং comedy নামক লঘুরসের নাটকের বিভিন্নরূপ প্রচলিত। Farce-য়ে ঘটনা-সন্ধিই প্রধান। চরিত্র এবং সংলাপ ঘটনাসন্ধির অসম্ভব অবাস্তব কৌতুকের উপর নির্ভর করে। এই কৌতুকও আবার স্থূলতা এবং রুচিহীনতায় পরিপূর্ণ।[১] কোন সামাজিক চেতনা এই জাতীয় নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত না। Burlesque-য়ে সমকালীন নাট্যরচনা, রঙ্গমঞ্চের বিশেষ অবস্থা, জনসাধারণের স্বভাব, বিখ্যাত ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে নাট্যাকারে তীব্র বিদ্রূপ করা হত। উনবিংশ শতাব্দীর Burlesque-য়ে উপরন্তু সঙ্গীতবাহুল্য এবং শব্দবিভ্রম সৃষ্টি করে জনমনোরঞ্জনের চেষ্টা চলেছিল। তুলনায় Extravaganza-এর তীব্রতা কম, ব্যক্তিগত আক্রমণও চোখে পড়ে না। এই রূপরীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে দায়িত্বহীন লঘু কৌতুকের উচ্চহাস্যের সৃষ্টি করে। কথার খেলার সংযোগে একটা বুদ্ধির দীপ্তি তার সঙ্গে যুক্ত হয়। কমেডি এদের তুলনায় সাহিত্য হিসেবে মূল্যবান। মানবজীবন এবং মানব-চরিত্রের লঘু কৌতুকের দিকটি কমেডিতে ভাষারূপে বদ্ধ হয়।[২] Encyclopaedia of literature (vol 1)-য়ে বলা হয়েছে।

"But comedy at least depends primarily on verbal humour and only secondarily, if at all, on physical effects. It therefore has value as literature, as distinct from spectacles which rely largely on mime, buffoonery, burlesque, dancing or music."

বিষয়ানুসারে কমেডিকে comedy of manners, comedy of character, comedy of intrigue প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। রূপায়ণের দিক থেকে এদের ব্যঙ্গাত্মক, রোমান্টিক, সামাজিক, ভাবপ্রবণ, বস্তুতান্ত্রিক, উদ্ভট-কাল্পনিক প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণী কৌতুকরাজ্যের অধিবাসী।

বাংলা নাটকে কৌতুকরসের দিকে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা প্রথমাবধিই লক্ষিত হয়েছে। লেবেডফের রঙ্গমঞ্চে দুটি ইংরেজী কমেডির[৩] অনুবাদ হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চ এবং এখানে অভিনীত নাটকের সঙ্গে পরবর্তী বাংলা নাট্যধারার কোন সম্পর্ক না থাকায় ইংরেজী কমেডির আদর্শে আমাদের প্রহসনের জন্ম হয় নি।

১৮২২ এবং ১৮২৮ সালে যথাক্রমে সংস্কৃত প্রহসন 'হাস্যার্ণব' এবং 'কৌতুক সর্বস্ব নাটকের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল (দ্বিতীয়টির আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়)। নিয়মিত নাট্যরচনা আরম্ভ হয় অনেক পরে ১৮৫২ সালে। কাজেই সংস্কৃত প্রহসনের এই অনুবাদ প্রত্যক্ষ উত্তরসূরীর ধারা সৃষ্টি করতে পারে নি।

বাংলা প্রহসন সংস্কৃত প্রহসনের হুবহু অনুসরণেও গড়ে ওঠে নি। অবশ্য সংস্কৃত কাঠামোটি একেবারে অস্বীকার করবার উপায় এর ছিল না। বাংলা প্রহসনে সমকালীন সমাজজীবনের ভাব ও আদর্শসংঘাতের প্রতিফলন পড়েছিল। মধুসূদনের পূর্বেই বিধবাবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা এবং কলকাতাবাসী 'বাবু'দের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রহসনের মাধ্যমে ধিক্কৃত হয়েছে। সংস্কৃত প্রকরণ কিংবা প্রহসনে প্রতিনিধিত্বমূলক সামাজিক সমস্যার চিত্রায়ন বড় প্রকট ছিল না, ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে সমাজচিত্র অঙ্কনই ছিল লক্ষ্য। কোন বিশিষ্ট সমাজ-সমস্যার উপস্থাপন এবং কশাঘাতের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে নবচেতনা সঞ্চারের চেষ্টা প্রথমাবধিই বাংলা প্রহসনকে উদ্দেশ্যমুখী করে তুলেছিল। বাংলা প্রহসন জন্মকাল থেকেই এই বিশিষ্টতা দেখিয়েছে। কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে সংস্কৃত প্রকরণ-প্রহসনের সঙ্গে মধুসূদন-পূর্ব বাংলা প্রহসনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজী কমেডি-বারলেস্ক-ফার্স জাতীয় রচনার সঙ্গে এই সব প্রহসন রচয়িতার বিশেষ পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না।

প্রাক্-মধুসূদন বাংলা প্রহসনের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা ছিল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'। এই কালের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রহসন হিসেবে এই রচনাটিকে গ্রহণ করা চলে। কৌলীন্য প্রথাকে ব্যঙ্গ করে নাটকটি রচিত। নব্য মানববাদী চেতনায় নাট্যকার উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। শুধুমাত্র ফরমায়েসী রচনা এটি নয়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেও কৌলীন্য প্রথাকে পরিহার্য অনাচার বলে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। রচনাটিতে অকৃত্রিম বিশ্বাসের উত্তাপ আছে। এ জাতীয় সমাজচেতনা এবং উদ্দেশ্যমুখিতা

সংস্কৃত প্রকরণ বা প্রহসনে ছিল না। কিন্তু রচনাটির ভঙ্গি সম্পূর্ণত সংস্কৃতরীতির বশীভূত। নাটকটির প্রারম্ভে নান্দী-সূত্রধর-নটির প্রসঙ্গটি রীতিসম্মতভাবেই আমন্ত্রিত হয়েছে। সমগ্র রচনাটিকে রামনারায়ণ সংস্কৃত-রীতি অনুযায়ী ছয়টি অঙ্কে বিভক্ত করেছেন। এই নাটকের হাস্যরসে স্থূলতা আছে—স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ধরনে কৌতুকরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষিত ছিলেন না। নব্য রুচি তাঁর ব্যক্তিত্বের অঙ্গ হয়ে পড়ে নি। ভারতচন্দ্র-কবিওয়ালা-ঈশ্বর গুপ্তের রুচি ও রসবোধের ধারায়ই তাঁর আবির্ভাব। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত হাস্যরসের প্রত্যক্ষ অনুসরণে তাঁর কৌতুকসৃষ্টি যে রূপ ধারণ করেছিল তা পরবর্তী কালের ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবজাত হাস্যরস থেকে স্বরূপত ভিন্ন।[৪]

একখানি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্কৃত প্রহসনের পরিচয় নিলে প্রথম পর্বের বাংলা প্রহসনের সঙ্গে এর রূপগত সাদৃশ্যের ধারণা জন্মাতে পারে। জগদীশ্বরের 'হাস্যার্ণব' সংস্কৃত প্রহসনগুলির মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[৫] রাজা অন্যায়সিন্ধু দুঃশাসনের সমুদ্র বিশেষ। তার রাজ্যে চরম অনিয়ম চলছে—ব্রাহ্মণদের বদলে চণ্ডালেরা জুতা তৈরী করে, স্ত্রীরা সতীত্বে অবিচল, স্বামীরা একনিষ্ঠ, এবং সৎ ব্যক্তিরা পূজিত। রাজা মন্ত্রীর কাছে পরামর্শ চাইল কোথায় গিয়ে সে প্রজাদের চরিত্র সম্বন্ধে সার্থক জ্ঞানলাভ করতে পারবে। মন্ত্রী তাকে কুটনী-বন্ধুরার গৃহে যেতে বলল। বন্ধুরা কন্যা মৃগাঙ্কলেখাকে রাজার কাছে উপস্থিত করল। সভাপণ্ডিত জনৈক ছাত্রের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হল এবং তারা উভয়েই তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হল। বন্ধুরা অসুস্থ হয়ে পড়ায় এক হাতুড়ে ডাক্তার এল। তার চিকিৎসা ব্যাধির চেয়েও ক্ষতিকর। তাকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে হল। শল্যবিদ্ নাপিত, কোটাল সাধুহিংসক, অপদার্থ সেনাপতি রণজম্বুক প্রভৃতির আগমনে হৈ হুল্লোড় পড়ে গেল। উচ্চকণ্ঠ স্থূল হাস্যরসের অসদ্ভাব ঘটল না। দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা অনুপস্থিত। সভাপণ্ডিত এবং ছাত্রের মধ্যে মৃগাঙ্কলেখাকে লাভ করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল। এমন সময়ে প্রণয়ে নূতন প্রতিযোগীরূপে এল এক মুনি এবং তার শিষ্য। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধদ্বয় যৌথভাবে যুবতী মৃগাঙ্কলেখাকে লাভ করল। বিবাহ দিতে এসে পুরোহিত মহানিন্দকও বেশ্যাটির উপরে আংশিক অধিকার দাবি করে বসল। বৃদ্ধা বন্ধুরাকে নিয়ে তরুণ ছাত্রদ্বয়ের সন্তুষ্ট থাকতে হল।

দেখা যাচ্ছে এই প্রহসনে কোন কাহিনী নেই। রচনাটির বিভিন্ন অংশের

মধ্যে কার্যকারণগত কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় না। কোন কেন্দ্রীয় সমস্যা নেই। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনাসন্ধিকে এক স্থানে এনে হাজির করা হয়েছে। পাত্রপাত্রীদের নানা ধরনের চারিত্রিক অসঙ্গতি নিয়ে কিছু স্থূল রঙ্গ ও ভাঁড়ামি করতে চেয়েছেন রচয়িতা। কিছু ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব এই সব চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকবে। প্রহসনগুলির গঠনরীতি মোটামুটি একই রকম।

কুলীনকুলসর্বস্বে এই গঠনরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের এই নাটকে কোন কাহিনী নেই। একটি সামাজিক সমস্যা যে আছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু শুধু সমস্যা থাকলেই তা গল্প হয়ে ওঠে না। সমস্যাটিকে গল্পে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হন নি নাট্যকে রামনারায়ণ। কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি অবিবাহিত কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা। অবশেষে কুলীন বর জুটল। সে বর সবদিক থেকেই অপদার্থ। কিন্তু তার সঙ্গেই কুলপতি কন্যাদের বিবাহ দিল। ঘটনা সামান্য। প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকে কোন ঘটনাই বড় ঘটে নি। নানা প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনায় সমাজের নানা স্তরের মানুষের ব্যঙ্গাত্মক জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কয়েকটি চরিত্রের (যেমন ঘটক অনৃতাচার্য, বিবাহব্যবসায়ী বিবাহবণিক ও তৎপুত্র অধর্মরুচি, ফলারে বামুন উদরপরায়ণ মুর্খ পুরোহিত অভব্যচন্দ্র) স্থূল অতিরঞ্জন এবং সংলাপের ভাষা-ব্যবহারের কৌশল সাফল্যের সঙ্গে হাস্যরস পরিবেশন করেছে। কুলীন কন্যাদের চরিত্রচিত্রণে তর্করত্ন সার্থক, কিন্তু কৌতুকদৃষ্টি এই চরিত্র কয়টির মূল প্রত্যয় নয়। রহস্যনাটকে এদের উপস্থিতি একটি বেদনাকেন্দ্র রচনা করেছে। কিন্তু নাটকের অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রটি অতি ক্ষীণ। একটা উদ্দেশ্যমুখী মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্র রচনা করেছেন নাট্যকার। চিত্রগুলি শুধু বিচ্ছিন্নই নয়, গতিহীন এবং বাক্‌সর্বস্ব।[৬] নাটক হিসেবে অবশ্য কুলীনকুলসর্বস্বের দুর্বলতা অতি স্পষ্ট। ঘটনা, ঘটনার গতি ও সংঘর্ষ নাটকীয়তার প্রাণ। সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণে রামনারায়ণ এই রচনাটিকে ঘটনাবর্ত ও দ্বন্দ্ব থেকে দূরে রেখেছেন। কৌলীন্যপ্রথা এবং প্রথাবিরোধী মানবিকতার মধ্যে বলিষ্ঠ দ্বন্দ্বের যে অবকাশ এখানে ছিল তার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি দেন নি নাট্যকার। ফলে ঘটনা-দ্বন্দ্বের স্থানে বক্তৃতা এসেছে, প্রচার-ধর্ম অতিপ্রকট হয়ে সাহিত্য-রসাস্বাদে বাধার সৃষ্টি করেছে।

রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্ব প্রকাশের মাত্র পাঁচ বৎসর পরে মধুসূদনের প্রহসন দুটি রচিত হল। গ্রীক কমেডির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। প্রহসন লিখতে গিয়ে এরিস্টোফেনিসের কমেডির কথা তাঁর মনে হয়েছিল কিনা বলা কঠিন।[৭] গ্রীক কমেডি প্রসঙ্গে এরিস্টটলের মন্তব্য কবির ভালভাবেই জানা ছিল।[৮] সে পরিচিতি এত ব্যাপক যে ঠিক করে বলা যায় না কবি তার দ্বারা কিছুমাত্র উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা। এরিস্টোফেনিসের কমেডির সঙ্গে সাধারণভাবে মধুসূদনের প্রহসনের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তা কিছু প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত নয়। এই কমেডি-রচয়িতা সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন,

> "Aristophanic comedy is a brilliant fusion of poetry, fantasy and farce with political, literary and social criticism…Each play is built upon a leading idea propounded, debated and carried against opposition; the latter half, in a series of farcical scenes, displays the consequences of the main action with little dramatic development.
>
> —[Eric W. Handley.][৯]

এরিস্টোফেনিসের রাজনৈতিক, সামাজিক সমালোচনায় ব্যক্তিগত বিদ্রূপ প্রায়ই তীব্র হয়ে উঠত। একটা সুস্পষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার উপরে তাঁর এই ব্যঙ্গবোধের ভিত্তি ছিল। মধুসূদন এ বিষয়ে ভিন্নপথের পথিক। আসলে কবি ইংরেজী কমেডি অব ম্যানারস-এর আদর্শ অনুসরণ করতে চেয়েছেন। এরিস্টোফেনীয় নাট্যাদর্শের সঙ্গে যদি কোথাও সাদৃশ্য ঘটে থাকে তবে তা নেহাৎ কাকতালীয়। মধুসূদন নিজে এই রচনা দুটিকে ফার্স বলে একাধিকবার চিঠিতে অভিহিত করেছেন। ফার্সের কিছু কিছু লক্ষণ থাকলেও কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির বিশিষ্টতায় এরা কমেডি স্তরের অন্তর্ভুক্ত হবার উপযুক্ত।

বাংলা প্রহসনে মধুসূদনের অবদান গৌরবের। এক। সংস্কৃতানুসরণ থেকে তিনি ইংরেজী রীতির দিকে ফিরে তাকালেন। মধুসূদনের প্রহসনের পথ ধরেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাট্যসাহিত্য সংস্কৃত নাট্যজগতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করল। দুই। প্রচার-ধর্মের স্থানে প্রহসনে নাট্যসৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন। শ্রেণীগত আচার-আচরণের প্রতি ধিক্কার জানাতে গিয়ে ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকেও তিনি নাট্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

তিন। বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্রের স্থানে সুগ্রথিত গল্প এল। আত্যন্ত একটি দ্বন্দ্বের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট রইলেন নাট্যকার। বিবৃতি বক্তৃতার স্থানে এল ঘটনার প্রত্যক্ষতা। প্রহসনও যে নাটক মধুসূদনের প্রহসনের মধ্য দিয়ে সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

মধুসূদনের এই দুটি প্রহসনের সঙ্গে এ ধারার পূর্ববর্তী সেরা রচনা কুলীন-কুল-সর্বস্বের তুলনা করলে নিঃসন্দেহে এই প্রতীতি জন্মাবে যে এদের মধ্যেকার পার্থক্য গুণগত, শুধুমাত্র পরিমাণগত নয়। ফলে মধুসূদনকেই প্রকৃত পক্ষে বাংলা প্রহসনের প্রবর্তক বলে যখন তাঁর জীবনীকার দাবি করেন তখন তার মধ্যে তথ্যগত কিছু বিচ্যুতি থাকলেও, তার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী প্রহসন ধারায় মধুসূদনের রচনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অনুসরণের বাহুল্য সমালোচকেরা লক্ষ্য করেছেন। সমকালীন দীনবন্ধু মিত্র থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত এই দুই প্রহসনের আদর্শই বাংলা ভাষায় সর্বাধিক অনুসৃত হয়েছে। শুধু তাই-ই নয় বাংলা নাট্যসাহিত্যে উৎকৃষ্টতর প্রহসন রচিত হয় নি এবং বিশেষ করে "বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ" দেশকাল নিরপেক্ষ শিল্পোৎকর্ষের জন্য শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে।

॥ দুই ॥

মধুসূদন প্রহসন রচনায় যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা কি আকস্মিক? তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের কোন অংশে কি প্রহসনকারের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা ছিল? কবির প্রহসন রচনার পিছনে বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ছাড়া অন্য কোনরূপ আন্তরিক প্রেরণা ছিল কি?

মধুসূদনের সাহিত্যজীবনে একাধিকবার বহিরঙ্গ প্রেরণা তাঁর শিল্পী-অন্তরের সুপ্তিভঙ্গ ঘটিয়েছে। শার্মষ্ঠা রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা না-জানা মাইকেলের প্রথম বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করা, তিলোত্তমাসম্ভবে নব ছন্দের পক্ষীরাজে ত্রিভুবনবিজয়ের অভিযানেরও সূচনা হয়েছিল একান্ত বাইরেকার কারণে। বেলগাছিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই মধুসূদন রোমান্টিক কমেডির অলস প্রণয়ের অতীতকাল থেকে ব্যঙ্গবিদ্ধ ও হাস্যোজ্জ্বল বর্তমানে পদার্পণ করলেন। কিন্তু শুধুমাত্র ফরমায়েসী রচনার কাছ থেকে এ পরিমাণ সাফল্য আদৌ প্রত্যাশিত নয়। শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীতে নাট্যচর্চার যে পর্বে মধুসূদন পদচারণা করেছিলেন প্রহসনে হস্তক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে তাতে যুগান্তর ঘটেছিল। তাই অন্তরের নিদ্রিত

বাসনা ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধের পথ ধরে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজেছে এইরূপ মনে করা অসঙ্গত হবে না।

এই কৌতুকরসের স্বাদ আকস্মিকভাবে মধুসূদনের নাট্যরচনায় প্রবেশ করে নি। পদ্মাবতীর আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করেছি নাটকের রোমান্টিক প্রণয়াখ্যানের মধ্যে কৌতুকের সুর আস্বাদে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। পদ্মাবতী থেকেই হাস্যের প্রতি কবি কিছু আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন; কেন করেছিলেন সঠিকভাবে বলা কঠিন। সম্ভবত ক্লাসিক-রীতির নাটকের বিবর্ণতায় তিনি হাপিয়ে উঠেছিলেন। হয়ত কবি সরসতার মূল্যে জীবনকে জয় করতে চেয়েছিলেন। জীবনে এই প্রথম কবি আর্থিক-সামাজিক স্থিতিলাভ করেছিলেন। শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার পরে জীবনের পরম কাম্য সাহিত্যিক খ্যাতিও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। জীবনে এই পূর্ণ প্রসন্নতা সাহিত্যে হাস্যরূপে বিকীর্ণ হয়েছে। এইরূপ প্রত্যয় অসঙ্গত নাও হতে পারে। সুস্থ জীবনের পাদপীঠে দাঁড়িয়েও যে ট্রাজিক বেদনায় দীর্ণ হতে হয় তার উপলব্ধি মেঘনাদবধ কাব্য-কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনাকালেই স্পষ্টভাবে কবিচিত্তে ধরা দিয়েছিল। প্রহসন দুটির সর্বত্র হাস্য প্রসন্ন ও নির্দোষ কৌতুক না হলেও, সহজ হাস্যের সরসতা ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ভেদ করে এই দুটি রচনাকে মুহুর্মুহু প্রাণচঞ্চল করে তুলেছে। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালেও—কৃষ্ণকুমারী রচনার সময়েও—কবি হাস্যরসের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ট্রাজিক হাহাকারের পাশে কৌতুককেও অনেকখানি স্থান ছেড়ে দিতে হয়েছে কবিকে।[১০]

মধুসূদনের কাব্যগুলিতে হাস্য স্থান পায় নি। গাম্ভীর্যের তুঙ্গ শৃঙ্গে সেখানে কবির নিত্য বিহার, গভীরের অতলতায় তলিয়ে যাবার কামনা, কখনও বা রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যান। কিন্তু নিয়মিত নাট্য-সৃষ্টির যুগে প্রথম রচনা শর্মিষ্ঠার প্রস্তুতি অতিক্রম করেই তিনি জীবনের এই অন্য প্রান্তকে কিছু কিছু আমন্ত্রণ জানাতে চাইলেন।

হাস্য রস-রাজ্যের আর আটটির নবম প্রতিবেশী মাত্র নয়। করুণ, শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র ভয়ানকাদির মত এটিকে অন্য একটি ভাব (এবং রস) বলে আলঙ্কারিকেরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কিন্তু অপর আটটি ভাব ও রসের উৎস যেখানে হৃদয়, হাস্যের উৎস সেখানে মস্তিষ্ক,[১১] অপরের ভিত্তিতে যেখানে গাম্ভীর্য এবং গভীরতা, হাস্য সেখানে লঘু অসঙ্গতকে অঙ্গীকার করে নেয়। হাস্য নয়টির অন্যতম নয়, এটি একতম। একদিকে অষ্টরস, অন্যদিকে একা হাস্য।

মধুসূদন গভীর-গম্ভীর-বর্ণবন্ত-উচ্ছ্বসিত জীবনস্বরূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, তারই সোচ্চার শোভাযাত্রা তাঁর কাব্যরচনাবলীতে। নাট্য-রচনাগুলির সাক্ষ্য ছাড়া জানা যেত না কবির মনের এক প্রান্তে জীবন স্রোতের তীরে দাঁড়িয়ে হাস্যের ও ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপের প্রবণতাও ছিল।

মধুসূদনের প্রহসন দুটি নানা কারণে কবির সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

এক। এই দুটি রচনায় সর্ব প্রথম কবির শিল্পী-প্রতিভা বাহিরের সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। ঈশ্বর সিংহদের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারোদ্ঘাটনে ঘোষকের কাজ করেছিল, কিন্তু কবি কোনও বিশেষ রীতি ও আদর্শ অনুসরণের বাধ্য-বাধকতা অনুভব করেন নি। সংস্কৃতরীতি পরিহার করতে চেয়েও পূর্ববর্তী দুটি রচনায় যেন যান্ত্রিকভাবেই তার অনুবর্তন করেছেন কবি। এবারে ইংরেজী নাট্যরীতির জগতে স্বচ্ছন্দ পদচারণায় বাংলা নাটকে পূর্ণ নবত্বের হাওয়া প্রথম বইয়ে দিলেন মধুসূদন। মনের দিক থেকে কোন দ্বিধায় দীর্ণ না হয়ে প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি করলেন তিনি এখানে। কবির শিল্পী-সত্তা শর্মিষ্ঠায় জয়ীর সম্মান পেয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত মুক্তি পেল 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'-তে।

দুই। মধুসূদনের রচনাবলীর মধ্যে মাত্র প্রহসন দুটিতে তিনি সমকালের অধিবাসী। পৌরাণিক যুগ-পরিক্রমায় তাঁর আনন্দ শর্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতী (গ্রীক পুরাণ) নাটকে, তিলোত্তমা-মেঘনাদবধ-বীরাঙ্গনা কাব্যে শতধারায় বর্ষিত হয়েছে। ব্রজাঙ্গনার কল্পনারাজ্য অতীতের বর্ণাঢ্য দূরত্বের মায়াকে আশ্রয় করেছে, মায়াকাননের অপরিচিত রাজ্যও বর্তমান থেকে বহু দূরবর্তী। কৃষ্ণকুমারীতে অবশ্য কবি নির্দিষ্ট ইতিহাসের যুগে নেমে এসেছেন, কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে তারও ব্যবধান অল্প নয়। মধুসূদনের প্রায় প্রতিটি রচনায় তাঁর আধুনিক মন প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আমন্ত্রণে তিনি পথিকৃৎ। অথচ তিনি সদা অতীতচারী। একালের কণ্ঠে তিনি প্রাচীনের স্বর শুনিয়ে আস্বাদে আশ্চর্য বৈচিত্র্য এনেছেন।[১২] একমাত্র এই দুটি প্রহসনেই তিনি সমকালের জীবন ও সমস্যাকে আশ্রয় করেছেন। কবি কি সমকালীন সমাজ-পরিবেশের চিত্রাঙ্কনে ও সমাজসমস্যার মধ্যে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন নি? কিন্তু প্রহসন দুটির কোথাও কবির শিল্পীমনের এই অস্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন নেই। বরং প্রহসন লিখতে গিয়ে তাঁর অন্তরের যে পূর্ণ

জাগরণ ঘটেছিল 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' পড়বার পরে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

কবি তা হলে গম্ভীর রসের সামাজিক নাটক না লিখে লঘুরসের প্রহসন লিখলেন কেন? সম্ভবত এর একাধিক কারণ ছিল। প্রথমত, বাংলাদেশের সমকালীন জীবনে তরঙ্গিত আবেগ, প্রবৃত্তিসংক্ষোভ এবং কর্মচাঞ্চল্যের অসদ্ভাব ছিল। জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা ও হৃদয়াবেগের দিক থেকে য়ুরোপীয় চিত্ত-লোকের নৈকট্য আমরা লাভ করেছিলাম। কিন্তু জীবনের বস্তুভূমিতে তার উপযুক্ত পাদপীঠ তখনও নির্মিত হয় নি। মধুসূদনের মনের তারগুলি উঁচু-সুরে বাঁধা ছিল। পৌরাণিক জীবনের বর্ণাঢ্য স্ফূর্তি, বিপুল কর্মকোলাহল, বীর্যস্তম্ভিত ব্যক্তিত্ব, দানবাকৃতি মানবতা ও সমুন্নত মহাকাব্যিক মহিমায় তিনি নবজাত চিত্ত-ধর্মের প্রবলতাকে স্থাপিত করলেন। সমসাময়িক জীবনের ক্ষীণপ্রাণ স্তিমিত আবেগ এবং শ্লথগতির প্রতি এক তীব্র অনীহা তিনি বোধ করেছেন। যুগরস তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন, কিন্তু যুগের বাস্তব রূপে তিনি মুগ্ধ হন নি। এই দুয়ের মধ্যকার অসঙ্গতি সম্পর্কে কোন স্পষ্টবোধ কবির ছিল না। কিন্তু গূঢ় চেতনা তাঁকে ব্যাকুল করেছিল। আধুনিক হয়েও তাই তিনি অতীতচারী। কিন্তু পুরাণাশ্রয়ী ও অতীতমুখী হয়েও কবি পলায়নবাদী নন। সে-রাজ্যের উদ্দামতার মধ্যে মানবচিত্তের যে স্বপ্ন, ব্যক্তিত্বের যে উদ্বোধন, বিদ্রোহের যে বাণী, হৃদয়ের যে মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত তা ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোজীবনের তরঙ্গোদ্বেলতাকে ধরে রেখেছে। মধুসূদন প্রমীলা এবং বীরাঙ্গনার নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে স্ত্রী-চরিত্রের যে-কল্পনা করলেন তার বিশিষ্টতা ভাববার মত। হৃদয়ের মুক্তিই তাদের ব্যক্তিত্বের মূল বাণী। কিন্তু বিপরীতমুখী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তা আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে পারে, আপনার বলিষ্ঠ অস্তিত্বের ঘোষণা করতে পারে। একটা প্রবল রক্ষণশীল শক্তি হিসেবে মানুষের নৈতিক জীবনে সমাজের ভূমিকা যে কত বড় প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে সম্বন্ধে মধুসূদনের কোন স্পষ্ট ও গভীর ধারণা ছিল না। সমাজজীবনের সঙ্গে কোন-কালেই তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। বীরাঙ্গনার তারা ব্যতীত অন্যত্র নারী-চরিত্র অঙ্কনে সমাজচেতনা কোন বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে নি তাঁর রচনায়। আসলে জীবন ও মৃত্যুর বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি মানবচিত্তের মুক্তির বাণী পাঠককে শুনিয়েছেন। পুরাণের রাজ্যে তাই তাঁর সহজ পরিক্রমা। পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনায় এগুলিই ছিল বাধা—খুঁটিনাটি ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতার

অভাব, সমকালীন সমাজজীবনের উদ্দামতাহীন, উল্লাস-বিরল সমতাল এবং বিবর্ণতা। প্রহসনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বক্রদৃষ্টির চর্চা করায় সমাজ ও পরিবারজীবনের কোন বস্তুনিষ্ঠ পরিচিতি অত্যাবশ্যক নয়। কৌতুকহাস্যের উচ্চৈঃস্বর এবং ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা এর বিবর্ণতাকে ঘোচাতেও সাহায্য করে। মধুসূদন যখন সমাজ-ভূমিকায় পা দিতে চাইলেন তখন প্রহসনই তার যোগ্য ক্ষেত্র হল। দ্বিতীয়ত, শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীতে কবি পুরাণাশ্রিত যে কল্পরাজ্যে ভ্রমণ করেছেন তা মূলত ক্লাসিক সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে দৃষ্ট। পৌরাণিক পৃথিবীর ঠিক এই রূপের প্রতি কোন শ্রদ্ধা কবির ছিল না। এই রূপটা যেমন বীর্যহীন তেমনি কৃত্রিম। প্রহসন দুটিতে এসে কবি কৃত্রিম ক্লাসিকতার অনুবর্তন থেকে মুক্তি পেলেন। প্রহসন তাঁর কবি-প্রকৃতির সামনে নূতন দিগন্ত খুলে দিল। প্রহসনের সাফল্যের পরে সঙ্গত কারণেই তাঁর সৃষ্টিধর্ম সামাজিক বর্তমানের পথ ধরে অগ্রসর হতে পারত। কিন্তু তা হয় নি। তার জন্য কবির মনোধর্মের যে পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে তার দায়িত্বই সর্বাধিক। কিন্তু আর একটি কারণও ভাববার মত। পদ্মাবতী-রচনা শেষ হতে হতেই কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করে ফেললেন। এ যেন নিজেকে চেনা। প্রহসন যে নব আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তা অমিত্রাক্ষরের সঙ্গীতের স্রোতে ভেসে গেল। প্রহসন লিখতে লিখতে কবি সামাজিক নাটকের দিকে চোখ ফেরাতে পারতেন, বিশেষ করে যখন কৌতুকরসের কেন্দ্রেই কবির মন নিত্য আবর্তিত নয়। হাস্যের বর্ণে অনীহা ঘুচেছিল সমকাল প্রসঙ্গে, চর্চায় ও অধিকতর পরিচিতিতে নানাবর্ণের সম্পাতে তাকে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রহসন সমাদর পেল না। এবং কবি মধুসূদন (যিনি মূলত কবি, নাট্যকার নন) নব ছন্দের আলোয় নবজীবন পেলেন। কাজেই অনুরূপ অনুশীলনের প্রশ্নই আর রইল না। কবি সঙ্গীতের আবেগে এমন পৌরাণিক কল্পনায় গিয়ে পৌছলেন যেখানে অতীতের গাম্ভীর্য, মাহাত্ম্য, বীর্য ও প্রবলতা কৃত্রিম প্রণয়-লাস্যের নূপুর নিক্কনেই মাত্র আত্মবিক্রয় করে না। সামাজিক রচনার রাজ্যে ফিরে আসা আর হল না। তৃতীয়ত, প্রচলিত নাট্যচর্চায় (সংস্কৃতে—বাংলাদেশে সংস্কৃতই তখন অনুসরণযোগ্য আদর্শ;—এবং বাংলায়) পুরাণবিষয়ে গম্ভীর রসের নাটক লেখার রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রহসন সৃষ্টি করা চলত, গভীরতর কিছু নয়। 'বিধবাবিবাহ' প্রভৃতি দু-একটি ব্যতিক্রম থাকলেও এই সাধারণ ও প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য রীতির বিরুদ্ধতা কবি করেন নি। সামাজিক বিষয়ে কবি আরও চর্চা করলে হয়ত

প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করতে চাইতেন। কিন্তু নানা কারণে শুরুতেই এর সমাপ্তি ঘটায় সে সম্বন্ধে এখন আর কিছু বলার উপায় নেই।

মধুসূদন সামাজিক নাটক লিখলেন না, লিখলেন প্রহসন এবং তাতে সাফল্য অর্জন করলেন।

তিন। মধুসূদনের চলিতভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। কবিতায় তো বটেই গদ্যেও তিনি প্রধানত শব্দৈশ্বর্যপূর্ণ কবিত্ব ও সমুন্নত মহিমার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর জীবনদৃষ্টির সঙ্গত প্রতিফলন ঘটেছে এই মনোভাবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহজ রীতির গদ্যের প্রতি কবির কটাক্ষের কথাও শোনা যায়। কিন্তু প্রহসন রচনার সময়ে কবি কথ্যভাষার সমস্ত শক্তি এবং সৌন্দর্যকে নিঃসংশয়ে অনুভব করলেন। না হলে এমন নিঃশেষে তা আয়ত্ত করতে পারতেন না। অথচ এই ভাষারীতি মধুসূদনের রচনায় পূর্বে বা পরে চিহ্নমাত্র ফেলে নি।

চার। মধুসূদনের কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাঁর কবিদৃষ্টির একটি বিশিষ্টতার কথা বলেছিলাম।[১৩] কবি মূলত Relative Vision বা আপেক্ষিক দৃষ্টির অধিকারী। এই শিল্পদৃষ্টি জগৎ এবং জীবনকে নিজের চশমার মধ্য দিয়ে দেখতে শেখায়। কবির অধিকাংশ কাব্য কল্পনা সম্পর্কে এ কথা সত্য। কিন্তু সম্ভবত দীর্ঘকাল ক্লাসিকরসের চর্চার ফলে তিনি কতটা Absolute Vision বা নিরপেক্ষ দৃষ্টিও আয়ত্ত করেছিলেন। কাব্যের মধ্যে কতকগুলি চরিত্র-পরিকল্পনায় এবং বিশেষ করে প্রহসন দুটিতে কবির এই দৃষ্টি জয়ী হয়েছে। প্রহসন দুটিতে কবি নিজের বিশেষ আসক্তির ঊর্ধ্বলোকের একটি দৃষ্টিকেন্দ্রকে আয়ত্ত করেছেন।[১৪] তিনি চিন্তায় ও জীবনে নব্যরীতির উপাসক হলেও নব্যপন্থাকেই তার প্রথম প্রহসনের বিষয় করে তুললেন। শুধু তাই নয়। একেই কি বলে সভ্যতায় ব্যঙ্গের তীর নিজের আচার-আচরণের প্রতিও নিক্ষিপ্ত হয়েছে এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে।

পাঁচ। সমকালীন প্রহসন রচয়িতাদের তুলনায় মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সর্ব দিকে। রামনারায়ণপ্রমুখ প্রহসনকারেরা সমকালীন সমাজের কোন প্রথার সংস্কারকে তাঁদের এক একটি রচনার বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কুলীন-কুল-সর্বস্বে কৌলিন্যপ্রথাকে আহত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। কোন কোনটিতে আবার বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে উচ্চকণ্ঠ বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে নব্য জীবনবোধ এসেছিল। এর ফলে যে ভাব-সংঘর্ষের জন্ম হয়েছিল, যে-সব সমাজ-সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল বাংলা প্রহসনের উদ্ভব ও

বিকাশ ঘটেছে তারই পটভূমিতে। কিন্তু কোন প্রহসনকারই যুগসন্ধিকালের এই সংঘর্ষের সমগ্রতাকে প্রহসনে রূপ দিতে সাহস করেন নি, মধুসূদন পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি এবং সমাজজীবনের বাস্তব সমস্যাদির অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রথম যৌবন থেকেই তিনি হিন্দু পরিবার-জীবন থেকে দূরে ছিলেন, সমাজজীবনের কোন প্রত্যক্ষ সমস্যার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সেই যুগে য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাংলা তথা সারা ভারতে নব্য ও পুরাতনের যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তার বাস্তব প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা না পেলেও অন্তরের মূল সত্যটি কবি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় নব্যপন্থার বিকৃতি ধিক্কার পেল। আর রক্ষণশীলতার লাম্পট্যকে কশাহত করা হল 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'তে। দৃষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গবক্র, কিন্তু সত্যভেদে অভ্রান্ত। লেখক একই সঙ্গে দুটি প্রহসন লিখবার পরিকল্পনা কেন করেছিলেন ভাববার মত। দুটি প্রহসন মিলে একটা সমগ্র সত্য বলে কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল। যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিজের আচরিত জীবনটাকে আহত করার মত শক্তিশালী, অখণ্ড সত্যে তারই পূর্ণ অধিকার।

ছয়। প্রহসন দুটিতে কবি হাস্যরস সৃষ্টিতে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা শুধুমাত্র বহিরঙ্গ কৌশলজাত নয়। যে Absolute Vision-এর কিঞ্চিৎ অধিকার কবির ছিল এবং যে অকম্প্র নিষ্ঠায় সামগ্রিক সমাজচেতনার মর্মোদ্ঘাটনে তিনি তৎপর ছিলেন তার মধ্যে এক ধরনের detachment আছে। জীবনস্রোতের তীরে দাঁড়িয়ে দর্শকের নিরাসক্তি নিয়ে জীবনকে বিশ্লেষণ করা এবং কোন আদর্শ বা ভাবাবেগের অতিরেকে ভারসাম্যচ্যুত হলে তাকে হাস্যের তীরে বিদ্ধ করা এর লক্ষণ। যে কৌতুক বোধ থেকে শিল্পী নিজের জীবনাদর্শকে বর্ণ-বৈভব ও উল্লাসের প্রাচুর্য থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখতে পারেন, সেই মুক্ত পথিক-মন হাস্যের মূল্যে সত্যকে জয় করেন। প্রহসনের কবি সেই মনের অধিকার পেয়েছিলেন। এই রচনা দুটি তাই শুধুমাত্র শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে মূল্যবান নয়, কবির জীবনচেতনার একটি অভিনব দিকের যবনিকা চকিতে উদ্ঘাটন করায় মধু-চর্চার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এ পর্যন্ত সাধারণভাবে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' দুটি প্রহসনকে যৌথভাবে দেখেছি। স্বতন্ত্রভাবে এদের প্রত্যেকটির বিচারে প্রবেশ করার আগে বলা দরকার এদের নাট্যগুণ এবং

সাহিত্যিক উৎকর্ষ সমস্তরের নয়। প্রথম প্রহসনটিকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন বলে অনেকেই সেকালে অভিহিত করতে চেয়েছেন[১৫]। রামগতি ন্যায়রত্ন রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যই নব্যরীতির ধিক্কারকে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু ভক্তপ্রসাদদের কীর্তিকে অবাস্তব ও অসম্ভব বলতে চেয়েছেন। আবার অনেক বিশিষ্ট সমালোচক প্রহসন দুটিকে সমমূল্য জ্ঞান করেছেন[১৬]। কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হিসেবে এরা আদৌ সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র তুলনায় 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'র সাহিত্যিক উৎকর্ষ অনেক বেশি। প্রথম প্রহসনে ফার্সের উপকরণের পরিমাণ অধিক, গল্পগ্রন্থনে পূর্ণতা ও নিটোলতা আসে নি, চরিত্রচিত্রণ ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ও প্রচারধর্ম অতিক্রম করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে একক হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয় প্রহসনে বক্তব্যের সাধারণ কথা ব্যক্তিচরিত্রের বিশিষ্টতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি আদ্যন্ত পূর্ণ গল্পের মধ্যে ধরা পড়েছে। কিন্তু এরা অত্যন্ত কাছাকাছি সময়ের লেখা। এদের আঙ্গিকেও ঘনিষ্ঠ ঐক্য আছে। উভয় প্রহসনই দুই অঙ্কে এবং মোট চারটি দৃশ্যে বিভক্ত। উভয় প্রহসনের ঘটনাকালের মধ্যে নিবিড় ঐক্য আছে। আসলে প্রথম প্রহসনে ছিল তাঁর হাতেখড়ি। এই নূতন আঙ্গিকটি আয়ত্ত করতেই কবিকে প্রথমত কিছুটা দৃষ্টি দিতে হয়েছে। এবং এই সংক্ষিপ্ত সাধনাই দ্বিতীয়টিতে নিশ্চিত সিদ্ধিতে কবিকে পৌঁছে দিয়েছে।

॥ তিন ॥

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটির লক্ষ্য মদ্যাসক্তির প্রতি ধিক্কারবর্ষণ এরূপ কথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন[১৭]। কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ব্যঙ্গ নব্যবঙ্গের একটা বিশেষ প্রান্তের চিন্তা ও আচরণকে বিদ্ধ করার জন্য উদ্যত। মদ্যাসক্তি তার একটা আনুষঙ্গিক ত্রুটি মাত্র। কবি সমগ্রভাবে যুগসমস্যাটিকে ধরতে চেয়েছেন। রচনাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।[১৮]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই নব্য ও প্রাচীন পন্থীদের সংঘর্ষ খুবই তীব্র হয়ে উঠেছিল। ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের মধ্য দিয়ে নব-মানবচেতনা যুক্তিবাদ, ব্যক্তিগত আচরণের স্বাধীনতায় বিশ্বাস, প্রচলিত প্রথাদিকে অস্বীকার করবার প্রবণতা বেড়ে গেল। হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা রইল না। ধর্ম এবং পিতৃপুরুষের আচরণীয় কর্ম তাদের কাছে হেয় বলে প্রতিভাত হল। কেউ কেউ ধর্ম ত্যাগ করল, কেউ কেউ স্বধর্মের সীমায় অবস্থান করেই সর্ব

বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। এই নব্য সম্প্রদায়ের চিন্তা ও সাধনার মোট ফলাফল বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার রাজ্য থেকে বাঙালিকে নব্যচেতনায় সমুন্নত করায় এঁদের দান সর্বাধিক। সমাজসংস্কারমূলক নব কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড গড়ে তোলায় এঁদের অবদানের পরিমাণ স্বল্প নয়। এঁদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরা মনীষার জোরে নবযুগ গঠন করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আচার-আচরণে, বিশ্বাসে ও চিন্তায় এঁরা সর্বদা যুক্তি ও বিচারের পথ ধরে চলেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা অনেকেই উচ্ছৃঙ্খলতাকে নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর কর্মের মহিমায় আবৃত হয়ে পড়ে, সাধারণ স্তরের মানুষ অনুরূপ আচরণকে যখন আদর্শ বলে গ্রহণ করে তখন সর্বনাশ হয়। নব্যশিক্ষা এবং নবযুক্তিবাদ এমন এক উচ্ছৃঙ্খল তরুণ সমাজ সৃষ্টি করল যারা হিন্দুধর্মের প্রতি অবজ্ঞা এবং নিষিদ্ধ পান-ভোজনে আসক্তিকেই মনের মুক্তি বলে ধরে নিল, বারাঙ্গনা-সেবাকে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও মুক্তপ্রেমের নমুনা বলে চালাতে চাইল, মদ্যপান হয়ে দাঁড়াল সভ্যতার চরম আদর্শ। সেকালের বহু সাহিত্যে এর চমৎকার পরিচয় আছে। প্যারীচাঁদ মিত্র হিন্দু তরুণদের ধর্মবিরোধী মনোভাবেব জীবন্ত ছবি এঁকেছেন—

> "ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।"
>
> —[ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত্র]

শিবনাথ শাস্ত্রী আরও কিছু চরম উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

> "তাহারা রাজপথ দিয়া যাইবার সময়, মুণ্ডিত মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 'আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনের ছাদের উপরে উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি' এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।"
>
> —[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ]

মদ্যাসক্তি সেকালে সভ্যতার অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় এই প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তাঁর আত্মচরিতে—

"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে, এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদরপূর্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের সমাজসংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।"[১৯]

পুরাতন নীতিবোধ বিসর্জিত হয়েছিল, কিন্তু নূতন নীতিবোধের সন্ধান কয়জনই বা পেল। ভয় ভক্তি কমে যাওয়ায় সাধারণ স্তরের মানুষের লোভ ও পাপাসক্তি যেন সর্ববাধাশূন্য হয়ে উদ্বেল হয়ে উঠল। তাও চলতে লাগল নব্য-শিক্ষা ও সভ্যতারই পতাকা উড়িয়ে। পুরানো বেশ্যানুরক্তিই নূতন নামে প্রবল হয়ে উঠল, সভ্যতার অঙ্গ বলে তা বিবেচিত হতে লাগল।[২০] শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাহিড়ীর সমকালের বাংলা দেশের সামাজিক অবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন।

"তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোন সুহৃদ-গোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এইরূপ ব্যক্তিদের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত।"[২১]

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার কবি এই বিকৃত-রুচি কলকাতার কথা বলেছেন ছন্দোবদ্ধ ভাষায়—

"গিয়াছিনু কলিকাতা
যা দেখিনু গিয়া তথা
কি লিখিব তার কথা
হা বিধাতা এই হল শেষে।
ভদ্রলোকের ছেলে যত
কদাচারে সদা রত

সুরাপান অবিরত
কত মত কুচ্ছদেশে।
কাঙ্গালি বাঙ্গালী ছেলে
ভুলেও না বাংলা বলে
ম্লেচ্ছ কহে অনর্গলে
তেঁরিয়া হইয়া পথে চলে
কাছ দিয়া গেলে বলে
গোটু হেল্।…”

এই ঐতিহাসিক তথ্যের পটভূমিতে ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ বিচার্য।

নাগরিক কলকাতার এই বিকৃতির চিত্র মধুসূদনের প্রথম প্রহসনটিতে বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। নব্য-শিক্ষিত যুবকদের অত্যধিক মদ্যাসক্তি, নব্য সভ্যতার চর্চার নাম করে যথেচ্ছ ভোগবাসনা ও কুৎসিত কামবাসনাকে চরিতার্থ করবার চেষ্টাই এখানে ধিকৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত ধর্মধ্বজী বৈষ্ণবের অসাধুতা, পুলিশ প্রহরীদের অযোগ্যতা ও উৎকোচগ্রহণ প্রবণতার প্রতিও ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হয়েছে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অন্তঃপুরেব চিত্র, বারবণিতা, মুসলমান বাবুর্চি প্রভৃতির কথাও প্রহসনমধ্যে স্থানলাভ করেছে।

মধুসূদন সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যেকার প্রধান দুই শক্তির সংঘাতের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। কর্তামহাশয়ের ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং নবকুমার-কালীবাবুদের নব্যশিক্ষার আদর্শটি কত বিপরীত তা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। নববাবুদের মধ্যে আধুনিকতার বড় কথার অন্তরালে বিচিত্র অসঙ্গতি ও বিচ্যুতির দিকে প্রধানত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নববাবুর বক্তৃতাটি সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

“জেন্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারিস্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এ দেশের সোসিয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর। …জেন্টেলম্যান, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি

সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়। ...কিন্তু জেণ্টেলম্যান, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা ; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবার্টি হল্‌ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুশি, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যান, ইন দি নেম অব ফ্রীডম্‌, লেট্‌ আস্‌ এঞ্জয় আওয়ারসেল্‌ভস্‌ !" (দ্বিতীয়াঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

নববাবুর বক্তৃতায় যেমন অন্ধ পাশ্চাত্ত্যানুকারিতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এর শেষভাগে উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার অন্তরালে যে নীচ ভোগবৃত্তি লুকিয়ে আছে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। মদ্যমাংস এবং বারাঙ্গনা-সেবাই যে এদের আসল উদ্দেশ্য, সমাজসংস্কারের উচ্চ আদর্শ ভারত-উদ্ধার, নারীশিক্ষা প্রভৃতি কথার ফুলঝুরিই যে উদ্দেশ্যটির বাহিরে একটি রঙিন আবরণ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত তা জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার প্রেসিডেণ্টের 'ইসপীচে'র মধ্যেও অপ্রকাশিত থাকে নি। স্বাধীনতার অর্থ যে চরম ভোগলিপ্সা-কামনাপূর্তিজনিত চরম উচ্ছৃঙ্খলতা নববাবুর শেষ কথাগুলিতেই তা প্রকাশিত হয়েছে। আর আচরণে তাদের উদ্দেশ্য তো পূর্ণ প্রতিবিম্বিত।

একদিকে কর্তামশাই পুরাতন আদর্শে স্থির থাকতে চাইছেন। অন্যদিকে নবকুমারদের উচ্ছৃঙ্খলতা উঠেছে চরমে। নবকুমারদের উচ্ছৃঙ্খলতার উপরেই প্রহসনকারের ব্যঙ্গদৃষ্টির তীক্ষ্ণ আলোর সবটা পড়েছে। কর্তামশাইয়ের অবস্থিতি পটভূমি রচনা করেছে, দ্বন্দ্বের পরিবেশটি ফুটিয়ে তুলেছে। নব্য-সম্প্রদায়ের এই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নব্য-পুরাতনে সংঘাতের সামাগ্রক ফলাফলও কয়েকটা টুকরো ছবিতে যেন রূপ পেয়েছে। পারিবারিক জীবনের পুরাতন আদর্শে ভাঙন ধরছে, গৃহের অভ্যন্তরে তরুণীরা কর্তব্যপরায়ণতা থেকে চ্যুত হয়ে তাসখেলায় সময় কাটাচ্ছে, বৈষ্ণব বাবাজী উৎকোচের লোভে মিথ্যাচারে প্রস্তুত, পুলিশ কর্মচারী নিরপরাধকে গ্রেপ্তার করে ঘুষ খেতে চাইছে, ছলে-বলে-কৌশলে মানুষের উপরে উপদ্রব করে অর্থপ্রাপ্তি তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ; পিতার মতামতের বিরুদ্ধতাই শুধু নয়, পিতৃ-পরিচয় এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে কু-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য (কালীবাবুর কর্তামশাইয়ের কাছে পরিচয়দান লক্ষণীয়), এমন কি যার দৌলতে, স্ফূর্তি করার সুযোগ এসেছে অসাক্ষাতে তার নিন্দায়ও পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে কেউ কেউ (নবকুমারের অনুপস্থিতিতে কতিপয় বন্ধুর মন্তব্য)। আসলে বন্ধুত্ব, কর্তব্যবোধ, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি, কর্মে নিপুণতা প্রভৃতি মানবিক সদ্‌গুণাবলীর অবসান সূচিত হচ্ছে। পুরাতনের স্থানে নূতন সামাজিক

মূল্যবোধের আবির্ভাব ঘটে নি। ফলে ভঙ্গুরতা তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'য় নবসভ্যতার নামে বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার নেতৃত্বে বসেছে যে তরুণদল তাদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের কথা এ প্রসঙ্গে মনে না পড়ে পারে না। কবি নিজে নব্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন। য়ুরোপীয় রীতিনীতি শিক্ষাদীক্ষার অনুসরণের মধ্য দিয়েই মাত্র ভারতবাসী সাম্প্রতিক দুরবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁর মনে আবাল্য দৃঢ় ছিল। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, যুক্তিবাদ, সর্ববিধ কুসংস্কারের অবসান, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাকে অস্বীকার করা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভোগবাদ তাঁর কাছে অবশ্য অনুসরণযোগ্য মানবধর্ম বলে বিবেচিত হত। বৈরাগ্যের বাসনার জয়গান তিনি কোনকালে করেন নি। বাল্যকাল থেকেই ভোগের উৎসব-আলো জ্বালিয়েছেন জীবনে। কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করেন নি। পিতৃপুরুষের ধর্মত্যাগেও কিছুমাত্র দ্বিধা তাঁকে করতে হয় নি। মদ্যপানের অভ্যাস ছিল তাঁর অল্প বয়স থেকে, কোনরূপ সংযমই তিনি জীবনে আয়ত্ত করতে চান নি। প্রেম, বিবাহ, পত্নীত্যাগ প্রভৃতি প্রশ্নেও তরঙ্গিত অস্থিরতা দেখা গেছে তাঁর চরিত্রে। নবকুমারের চরিত্রে যে সব বিচ্যুতি প্রকট তার অধিকাংশই মধুসূদনের নিজের চরিত্রেও বর্তমান ছিল।[২২] অবশ্য বেশ্যাসক্তি জাতীয় কোন দুর্বলতা তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র ছিল না।[২৩]

নবকুমারের চরিত্রের মধ্যে স্বয়ং কবির আত্মপ্রতিফলন ঘটেছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নয়। নবকুমারের চরিত্রের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মধুসূদনের সাদৃশ্য আছে। নবকুমারের বেশ্যাসক্তি মধুসূদনে নেই। আর মধুসূদনের প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি থেকে নবকুমার বঞ্চিত। তবে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নেতৃত্বপদ লাভ করার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে নবকুমার সাধারণের কিছু ঊর্ধ্বে। তবে মধুসূদনের ন্যায় অত্যুচ্চ প্রতিভার সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। নবকুমারের চরিত্রে শ্রেণী-স্বভাব যতটা প্রকট, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ততটা নয়। শ্রেণীর পরিচয়ে মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা ধরা অসম্ভব। তবুও নবকুমারের মধ্য দিয়ে যে ধরনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক জীবনাদর্শের প্রতি তিরস্কার-বাণী উদ্যত করেছেন কবি, তিনি

নিজে ছিলেন তার এক প্রধান প্রতিনিধি। নবকুমারের মাধ্যমে তাঁর আত্মতিরস্করণ ঘটেছে।

নিজেকে ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু করা উচ্চস্তরের সাহিত্যিক প্রতিভার লক্ষণ। রচয়িতার মানস-উৎকর্ষের নিদর্শন আছে এর মধ্যে। জীবন-স্রোতে তরঙ্গিত ও প্রবাহিত যাত্রীর চোখে থাকে আবেগের উদ্দামতা, কল্পনার ও উপভোগের ও উপলব্ধির প্রাচুর্য এবং প্রবলতা। কিন্তু কবি যেখানে তটস্থ, সেখানেই তিনি দর্শক। উজ্জ্বল বর্ণালীর মোহ সেখানে মাঝে মাঝে ছিন্ন হয়ে যায়। আবেগাকুলতার অন্তরালের বিবর্ণতা, আদর্শবাদের পর্দায় ঢাকা বিকৃতি তীরে দাঁড়ানো ব্যক্তির চোখে পড়তে পারে, মজ্জমান বা ভাসমান ব্যক্তি উপভোক্তা, বিচারক নয়। মধুসূদনের মধ্যে ভোক্তা এবং কালগতিতে ভাসমান এবং যুগের পরিচালক-সত্তার পাশে যে দ্বিতীয় এক দর্শক-সত্তা ছিল এত স্পষ্ট করে তা অন্যত্র বোঝা যায় নি। ব্যর্থতা ও কাম্যলোকে পৌছবার অসামর্থ্য চতুর্দশপদীতে যে হাহাকার তুলেছে তা উপভোক্তা ব্যক্তির, দর্শকের নয়। এখানে তা ব্যঙ্গহাস্যের জন্ম দিয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন পথপার্শ্বে দাঁড়াবার জন্য কিঞ্চিৎ স্থান করে নেওয়া। এদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। একেই কি বলে সভ্যতায় কবির দর্শক-সত্তার এই জাগরণ (মধুসূদনের সমগ্র কাব্য-জীবনে যা মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রেই ঘটেছে) সম্পর্কে কবি কতটা সচেতন ছিলেন বলা যায় না। কিন্তু এটি ঘটেছে এবং এখানেই এই ক্ষুদ্র প্রহসনটির একটি প্রধান গৌরব।

॥ চার ॥

'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রসঙ্গে এমন অভিযোগ করা হয়েছে যে রচনাটিতে সোজাসুজি একটা সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে বলেই কোন বিশেষ শিল্পসৌন্দর্যের দাবি এর নেই।[২৪] কিন্তু এই অভিযোগে ত্রুটির কেন্দ্রটি বিদ্ধ করা যায় নি। নাট্যকার এখানে সমস্যাটিকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন, একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীরূপ দিতে পারেন নি। সেখানেই প্রহসন হিসেবে এর প্রধান ত্রুটি। বাংলা প্রহসনের এত দিনের অভ্যাস এই চিত্রাত্মক নকশাধর্ম—মধুসূদন সব দিক থেকেই উন্নততর রীতির প্রবর্তন করলেও এই একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র এই-ই একমাত্র দুর্বলতা।

প্রহসনটির গঠনরীতিতে যে বিস্ময়কর নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায় গল্পগঠনের ব্যর্থতায় তা অনেক সময়ে চোখে পড়ে না। প্রথমে এর গঠন-রীতির বিশিষ্টতার একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

নাটকটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য। পূর্ববর্তী নাটক দুটিতে কবি অঙ্কবিভাগ করতে গিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেছেন। প্রধানত স্থানগত ঐক্য বোঝাবার জন্য অঙ্কের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। দৃশ্যে দৃশ্যে কালগত পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু স্থানগত কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নেই। কোন দৃশ্যে রাজসভা, কোন দৃশ্যে উদ্যান, কোন দৃশ্যে পথ এরূপ থাকলেও, রাজ্য থেকে পার্বত্যপ্রদেশে বা রাজ্যান্তরে গমন করতে হলে অঙ্কের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র দুটি অঙ্কের পরিকল্পনা কেন করলেন নাট্যকার? প্রথম গর্ভাঙ্কে নবকুমারবাবুর গৃহ, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নিকটের রাজপথ। এরা একই অঙ্কের অন্তর্গত। এদের মধ্যে স্থানগত মিল নেই। দ্বিতীয় অঙ্কের দুটি দৃশ্যের অনুষ্ঠানও স্বতন্ত্র। একটিতে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা, অপরটিতে নবকুমারের গৃহ। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে যেমন স্থানগত সাদৃশ্য আছে, তেমনি আছে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের মধ্যে। তাই অঙ্কবিভাগে স্থানগত নৈকট্য দ্যোতিত হয় নি। আর এই নাটিকার চারটি দৃশ্যেই কালগত নৈকট্য আছে, সেদিক থেকেও অঙ্কবিভাগ তাৎপর্যহীন। তবে অঙ্কবিভাগ কেন করলেন কবি?

নাটকের প্রথম দুটি দৃশ্যে ঘটনার প্রস্তুতি, শেষের দুটি দৃশ্যে তার ফলাফল দেখান হয়েছে। একথা মনে রেখে কি কবি রচনাটিকে দুটি অঙ্কে বিভক্ত করেছেন? আসলে রচনাটির চারটি দৃশ্য মিলে একটিই অঙ্ক। এদের মধ্যে স্থান, কাল ও ঘটনাগত পারম্পর্য ও নৈকট্য সুন্দর ভাবে চিত্রিত। দুই অঙ্কে এদের বিভক্ত করে দেখবার কোন যুক্তি নেই। চারটি দৃশ্যই এক অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য।

প্রহসনের চারটি দৃশ্যে কালগত ঐক্য সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যের অনুষ্ঠান বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে। [কর্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা বাপু, এত সকালে যাবে কেন? (১।১)] দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনা সন্ধ্যার পরে ঘটেছে। [প্রথম

মুটিয়া। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়িয়ে থাক্তি হবে? (১।২)] তৃতীয় দৃশ্যের কাল রাত ন'টা। [মহেশ। (ঘড়ি দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকি আছে ···।(২।১)] চতুর্থ দৃশ্য আরও কিছু পরের ঘটনা। তবে রাত দশটা এগারোটার বেশি হবে না। কারণ বাড়ির কর্তার খাওয়া তখনও হয় নি। দেখা যায় মোট পাঁচ-ছয় ঘণ্টার মধ্যে এ প্রহসনের ঘটনাকাল সীমাবদ্ধ। কালগত এই সংহতির একটা প্রভাব পাঠকদর্শকের মনের উপরে পড়বেই। গ্রীক নাটকের কালগত ঐক্যের বোধে কবিচিত্ত অনুশীলিত এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়।

দৃশ্যে দৃশ্যে ঘটনাগত পারম্পর্যও ব্যাহত হয় নি। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নবকুমারের বাবার কাছ থেকে প্রতারণা করে সভায় যাবার অনুমতি আদায় করা হল। কর্তা সন্দেহ করলেন। বাবাজীকে পাঠালেন ছেলের উপরে গোয়েন্দাগিরি করতে। দ্বিতীয় দৃশ্যে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নিকটে পথের উপরে বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা। বাবাজী-সার্জেণ্ট-চৌকিদার সংবাদ কিংবা বারবিলাসিনীদ্বয়ের দ্বারা বাবাজীর অপমান নববাবুদের জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্র হিসেবে তাদের উপস্থিতি। কিন্তু কবি জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার পরিবেশটি এর দ্বারা ঘনীভূত করে তুলেছেন। বাবাজীব চোখের উপর নিষিদ্ধ মাংস ও বারাঙ্গনাদের আগমন ঘটানো হয়েছে। এর ফলে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার যেন এক একবার বাবাজী তথা দর্শক-পাঠকদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। পর মুহূর্তে আবার তা না-জানা রহস্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। দৃশ্যের শেষভাগে নববাবু-কালীবাবুর আগমন, বাবাজীর কাছে ধরা পড়ে যাওয়া, বাবাজীকে বশ করার পরামর্শ দৃশ্যটির পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা দূর করেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জ্ঞান-তরঙ্গিনী সভার উৎসব। এখানেই বলা যেতে পারে নাট্যঘটনার ক্লাইম্যাক্স। নব্য সভ্যতার ছদ্মবেশী চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগ-বিলাসিতা এই দৃশ্যে চাতুর্যের সঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যটিকে বলা যেতে পারে "fall of action"। পূর্ববর্তী দৃশ্যের তীব্রতা লোপ পেয়েছে, কিন্তু তার সুরের অনুরণন সমানে চলেছে। এই দৃশ্যের প্রথমাংশে অন্তঃপুরিকাদের তাস খেলার চিত্রে ঘরোয়া পরিবেশটি শুধু প্রাণবন্ত করে তোলা হয় নি, কলিকাল যে গৃহস্থের সংসারেও প্রবেশ করেছে তার ইঙ্গিত দেওয়া

হয়েছে। [গৃহিণী। ওমা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটি বিছানা পাড়তে গেল, তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না। (২।২)] দৃশ্যটির পরবর্তী অংশে মদোন্মত্ত নবকুমারের বাড়ি ফিরে হল্লা করার মধ্য দিয়ে, নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে। ঘটনাগত পারম্পর্য নিপুণতার সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে। মূল ঘটনার বাইরের যে চিত্র এসেছে তার মধ্যে বাবাজীর পুলিশী অভিজ্ঞতাই কিছুটা বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। অপরাপর খণ্ডাংশের সঙ্গে নবকুমারদের জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সম্পর্ক বড়ই নিকট। তাই এ নাটকে ঘটনাগত ঐক্য নেই এ অভিযোগ আনা যায় না।

এ নাটকে যে অভাব সবচেয়ে বেশি প্রকট তা হল কাহিনীর অভাব। ঘটনাবলী এখানে কাহিনী হয়ে ওঠে নি। নবকুমারেরা জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নাম করে মদ-মাংস-বারাঙ্গনা নিয়ে হৈ-হল্লা করে। এই ব্যাপারটি পরিবারের অন্য সকলের অজ্ঞাত ছিল এমন নয়, শুধু কর্তা এবং গিন্নি এর সংবাদ রাখতেন না। কর্তার কাছ থেকে ব্যাপারটিকে গোপন করল নবকুমার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ফাঁস হয়ে গেল। একে ঠিক কাহিনী বলা যায় না।

একজন ঐতিহাসিক সমাজের যে চিত্র আঁকেন এবং একজন গল্পকার যে সমাজচিত্র ধরে রাখেন তাদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। প্রথমটি ব্যক্তিত্ব দ্বারা সীমিত নয়; দ্বিতীয়টি কতকগুলি পাত্রপাত্রীর ব্যক্তি-লক্ষণের মধ্যে প্রতিফলিত। প্রথমটির ন্যায় তা সাধারণ সমাজ-কথা নয়, তা বিশেষ মানুষের সঙ্গে জড়িত হয়ে বিশিষ্টতা পেয়েছে। পাত্রপাত্রী যত ব্যক্তিরূপে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সাহিত্য হিসেবে তত তার মূল্য বাড়ে। আর ব্যক্তিক বিশিষ্টতা এবং স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে তার মূল্য কমে যায়। কারণ ইতিহাসের লক্ষ্য ব্যক্তি-বিশেষ নয়, সমাজ। আবার সমাজে প্রবহমান নিত্যকার ঘটনাবলীর বিবরণ নিয়ে কাহিনী হয় না তার চাই বিশেষ ঘটনা। চরিত্রচিত্রণ এবং বিশেষ ঘটনা এই দুয়ের সমন্বয় হলেই সমাজচিত্র পূর্ণাঙ্গ কাহিনীরূপ ধারণ করতে পারে।

একটি কাল্পনিক উদাহরণ নেওয়া যাক। উনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত তরুণশ্রেণী মদ্যপান-বারাঙ্গনাসেবার মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজজীবনকে বিপর্যয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। এটি একটি ঐতিহাসিক-সামাজিক সংবাদ। কিন্তু কোন লেখক রাম নামক সেকালের জনৈক নব্যশিক্ষিত যুবকের মদ খেয়ে

হল্লা এবং বেশ্যা-গমনের কুৎসিত চিত্র ভাষায় ধরে রাখলেন। এই রচনাটিতে চরিত্রচিত্রণের চেষ্টা আছে। একে নকৃশা বলা যেতে পারে। কাহিনীতে পৌঁছতে হলে আরও এক ধাপ অগ্রসর হতে হবে। রামের মদ ও বেশ্যাসক্তির একটা বিশেষ উত্তেজনাকর ঘটনাকে তুলে ধরতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে—(এক) রাম ছাড়াও আরও দু-একটি সংশ্লিষ্ট চরিত্রকে (যেমন তার লাঞ্ছিতা স্ত্রী, একটি বিশেষ বারাঙ্গনা প্রভৃতি) কিছুটা বিশিষ্টতা এবং প্রাধান্য দিতে হবে। (দুই) রামের ঐ বিশেষ অনাচারের ঘটনাটি বাধাহীনভাবে চরিতার্থ না হয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠবে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'য় চরিত্র আছে। চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা শ্রেণীস্বভাব প্রকট হলেও অনায়াসে তা ঐতিহাসিক সমাজচিত্রকে নকৃশায় উন্নীত করেছে। কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ গল্প হয়ে ওঠে নি। কারণ—

এক। নববাবুর প্রাত্যহিক মদ্যাসক্তি ও বারাঙ্গনাগমনের চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। তাব চরিত্রগত এই অভ্যাস এখানে এমন কোন বিশেষ ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করে নি যার উত্তেজনা, যার অজ্ঞাতপূর্ব পরিণতি ঔৎসুক্য আদ্যন্ত বজায় রাখতে পারে।

দুই। নববাবুর কার্যে প্রকৃত প্রতিবন্ধকতা আসে নি। বাধা যা ছিল প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রায় সমাপ্তি ঘটেছে। বাবাজীর উপস্থিতি কোন প্রকৃত বাধার সৃষ্টি করেনি। পরবর্তী দৃশ্য-বাধাহীন। ফলে একটা নিস্তরঙ্গ সরল রেখার প্রাত্যহিকতা এ নাটকের ঘটনাপারম্পর্যে অনুভূত হয়েছে। সংঘর্ষ-প্রাণ বৃত্তরূপ প্রকাশ পায় নি।

তিন। নব ছাড়া অপর কেউ ঘটনাবলীতে প্রাধান্য পায় নি। একাধিক মুখ্য পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও চরিত্রপ্রবণতা কাহিনীর জন্ম দেয়। এই প্রহসনে তা প্রথমাবধি রক্ষিত না হওয়ায় এর গল্পরূপ শিথিল হয়ে পড়েছে।

গল্পগঠনের অসামর্থ্য 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রধান দুর্বলতা। কিন্তু এ নাটকে কবি তাঁর পূর্ববর্তী দুটি নাটকের অনাটকীয় বর্ণনা-বিলাসকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। এ নাটক আদ্যন্ত কর্মমুখর। এই প্রথম বাংলা নাটক বিবৃতি-বর্ণনাকে গৌণ করে প্রত্যক্ষ কর্মচাঞ্চল্যকে মুখ্য করে তুলল। য়ুরোপীয় আদর্শ প্রথম জয়যুক্ত হল প্রহসনের রাজ্যে পদার্পণ করে। এ নাটকে কর্তাকে প্রতারণা, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নামে হুল্লোড়, ঘরে ফিরে নবর মাতলামী, বাবাজীর সিকদার বাগানের নানা অভিজ্ঞতা ঘটমান প্রত্যক্ষতা নিয়ে এসেছে।

নাটকীয় কর্ম দ্বন্দ্বপ্রাণ। দ্বন্দ্বহীন কর্ম তরঙ্গহীন প্রাত্যহিক সমতলের মত। নাট্যরস সেখানে আশ্রয় পায় না। আবার ঘটনা-নিরপেক্ষ শুধুমাত্র আদর্শের দ্বন্দ্ব, মানস-সংঘাত নাটকীয় নয়। নাট্যরচনা প্রধানত ঘটনাসংঘর্ষকে কেন্দ্র করবে—মানসসংঘাত ও আদর্শ-দ্বন্দ্ব একে অবলম্বন করেই মাত্র নাট্যমধ্যে স্থান পেতে পারে। একেই কি বলে সভ্যতা আদ্যন্ত ঘটনাসংঘর্ষে চঞ্চল। প্রথম দৃশ্যে নব ও কালী মিলে কর্তাকে প্রতারিত করেছে। কর্তার আদর্শ ও জীবনবোধের সঙ্গে নবদের ভোগবাসনার দ্বন্দ্ব এই কার্যের ভিত্তি। বৈষ্ণব বাবাজী ও বারবিলাসিনীদের আলাপ নেহাৎ কৌতুকপ্রাণ হলেও এদের জীবনদৃষ্টির পার্থক্য ও রুচিবোধের বৈপরীত্যের প্রতিক্রিয়ায় নাট্যসুলভ চাঞ্চল্য লাভ করেছে। সার্জেন্ট-বাবাজী সংবাদে অত্যাচারী অত্যাচারিতের চিরন্তন সংঘাত রূপ লাভ করেছে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার হৈ হুল্লোড় এবং ভোগোৎসবের মধ্যে সংঘাতের স্বাভাবিক অবকাশ ছিল না। মধুসূদন নবর বিরুদ্ধবাদী একদল সভ্যের আমদানী করে স্বল্পস্থায়ী হলেও দ্বন্দ্বের পরিবেশ রক্ষা করেছেন। শেষ দৃশ্যে কর্তা ও নবর আদর্শসংঘাত ঘটনারূপে বদ্ধ হয়েছে। এই কারণে প্রহসনটি কোথাও বিবর্ণ মনে হয় না, বরং এর উপভোগ্যতা যে সাধারণ স্তরের অনেক উর্ধ্বে তা স্বীকার করে নিতে হয়।

কিন্তু একটি বিচ্যুতি প্রথম শ্রেণীর সাফল্য থেকে প্রহসনটিকে বঞ্চিত করেছে। নাটকের এই টুকরো টুকরো ঘটনাদ্বন্দ্বগুলি যদি একটি কেন্দ্রে আবর্তিত হত তাহলে রচনাটির উৎকর্ষে কোথাও বাধা থাকত না। যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব এই প্রহসনের পটভূমিতে আছে তা ঘটনারূপ পেয়েছে প্রথম ও শেষ দৃশ্যে। অপর দুটি দৃশ্যে অঙ্কিত দ্বন্দ্বের সঙ্গে এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যে গল্প না থাকার অভিযোগ করেছি তার অন্যতম কারণ মিলবে এখানে। একটি কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব—তার উৎপত্তি ও বিকাশ ও পরিণতি ঘটনাকে গল্পে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। বর্তমান প্রহসনটি সে সাহায্য থেকে বঞ্চিত।

দ্বন্দ্বাত্মক ঘটনার প্রত্যক্ষতা, কালগত নৈকট্য এবং দৃশ্যে দৃশ্যে ঘটনাগত পারম্পর্য একেই কি বলে সভ্যতার নাট্যরস বর্ধনে সহায়তা করেছে। তা ছাড়া কবির অতন্দ্র দৃষ্টি নানা কৌশলে নাটকীয়তা বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করেছে চারটি দৃশ্যের প্রায় সর্বত্র।

এক। যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ ভণিতা বাদ দিয়ে একটি

অর্ধব্যক্ত সমস্যা নাটকীয় দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। [কালী। বল কি? নব। আর ভাই বলবো কি?] সমকালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই জাতীয় নাট্যারম্ভ বৈপ্লবিক বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রে কখনো কখনো এবং দ্বিজেন্দ্রলালে বেশ কয়েকবার এরূপ নাট্যসূচনা দেখেছি, কিন্তু মধুসূদনের প্রহসনেই তার সূত্রপাত।

দুই। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বাবাজী যখন বলল "এই দেখছি এক-জন ভদ্রলোক এ দিকে আসছে…" ঠিক তখনই জনৈক মাতালের প্রবেশ নাট্যরসের সঙ্গে ব্যঙ্গরসের চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়েছে। ভুল করে এক বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়েছে সে, মাতালের কাছে গালাগালি খেয়েছে, বার-বিলাসিনীদের দ্বারা অপমানিত হয়েছে, তারপরে যখন দূরে আলো দেখে আশান্বিত হয়ে উঠেছে ["· হেঁ্য, ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিল আসান আস্চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—"] তখনই পুলিশ সারজেণ্টের রূপে সবচেয়ে কঠিন বিপদ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

এই দৃশ্যের পরবর্তী অংশ বাবাজীকে দর্শক হিসেবে দাঁড় করিয়ে কয়েকটি টুকরো ঘটনাকে এমন কৌশলে সাজিয়েছেন মধুসূদন যাতে নাটকীয় কৌতূহল বিশেষ ভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। যে বাড়িটিকে চৌকিদার জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বাড়ি বলে নির্দেশ করে গেল প্রথমে মুসলমান বাবুর্চি হোটেল-বাক্স নিয়ে সেখানে প্রবেশ করল। বাড়িটির অজ্ঞাত অভ্যন্তর বাবাজীর কাছে যেন রহস্যের খাসমহল। দরওয়ান দরজাটি একটু খুলল, খাবার নিয়ে বাবুর্চিরা ভেতরে প্রবেশ করল। এ ঘটনায় বাবাজীর বিস্ময় লক্ষণীয়। [বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাক্স? উঃ, থু, থু, রাধেকৃষ্ণ! আমিতো এ জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্চি না] তার পরমুহূর্তেই এল বেল ফুল আর বরফওয়ালা। এবং অনতিবিলম্বে যন্ত্রীগণ সহ নিতম্বিনী ও পয়োধরীর প্রবেশ। দরওয়ান সাদরে তাদের অন্দরে আমন্ত্রণ করে নিল। প্রথমে নিষিদ্ধ মাংস দেখে বাবাজীর উত্তেজনা যেখানে উঠেছিল, বরফ-বেলফুলে তা দূর হয় নি, তবে কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছিল মাত্র, বারাঙ্গনাদের আগমনে তা চরমে পৌছল। উত্তেজনা ও ভাবাবেগের এই উত্থানপতন দৃশ্যটির নাট্যাস্বাদ বাড়িয়ে তুলেছে।

তিন। নব প্রস্তাব করল পয়োধরী-নিতম্বিনীর নাচের। কিন্তু সকলের অনুরোধে আগে সভাপতি নববাবুর ইস্পীচ হল। বাঈজী-নৃত্যের বদলে

হল সভাপতির বক্তৃতা। এর মধ্যেকার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের সুরটি একটু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে। আসলে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় ঐ দুই পদার্থ-ই নিকট জ্ঞাতি, একের সঙ্গে অন্যের বদল। তাই অসঙ্গত নয় এদের কাছে। কিন্তু শিক্ষিত দর্শক-পাঠকের কাছে এরা দুই স্বতন্ত্র এবং যোগসূত্রহীন রাজ্যের অধিবাসী, ফলে একটা বৈপরীত্যের বোধ তার মনকে আলোড়িত করতে থাকে।

চার। প্রথম অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে সারজেণ্টকে ঘুষ দিয়ে বাবাজী বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে বলেছে "ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন ব্যাটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে ...।" কিন্তু তার নিজেরও যে ঐ রোগ আছে তা ধরা পড়ল পরের দৃশ্যে। নাটকীয় সমান্তরাল বোধের (Dramatic parallelism) একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর নিদর্শন হিসেবে একে গ্রহণ করা চলে।

পাঁচ। শেষ দৃশ্যে কর্তার কাছে নবর কীর্তি যখন ফাঁস হয়ে গেল তখন মদোন্মত্ত নবর মুখ থেকে কর্তার কথার পিঠে পিঠে যে ভাষা বেরুচ্ছিল তার অসংলগ্নতাই যথেষ্ট নাটকীয় হয়ে উঠেছে। অসঙ্গত অসংলগ্নকে নাটকীয়তার স্তরে উন্নীত করা সহজ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।

॥ পাঁচ ॥

চরিত্রসৃষ্টির দিকে প্রহসনের কতকগুলি সাধারণ সীমাবদ্ধতা থাকে। জীবনের সমগ্রতা দেখাবার লক্ষ্য থাকে না বলেই চরিত্রগুলির একটা বিশেষ আংশিক পরিচয় এখানে প্রকাশ পায়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে না। সাহিত্যিক চারিত্রসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি বিচিত্রমুখী জটিলতা বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়কে আত্মসাৎ করে গড়ে ওঠে। প্রহসনে সে সুযোগ বড় নেই। বিশেষ করে যে সব প্রহসনে সমাজসমালোচনাই লক্ষ্য সেখানে মুখ্য চরিত্রগুলি প্রায়ই শ্রেণী চরিত্র হয়ে ওঠে, সামাজিক বিভিন্নশ্রেণী ও গোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও সাধারণ মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র চরিত্রগুলি সম্বন্ধে এই সাধারণ মন্তব্যগুলি প্রযোজ্য। কিন্তু তবুও কর্মে ও কথায় সব চরিত্রই এত বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে যার শিল্পোৎকর্ষ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে স্বীকার্য। চরিত্রগুলির শ্রেণীলক্ষণ প্রাধান্য পেলেও ব্যক্তিলক্ষণও একেবারে অবহেলিত হয় নি।

বিশেষ করে সংলাপের ভাষায় একই শ্রেণীভুক্ত চরিত্রগুলির অন্তরের সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিকে চমৎকার ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমকালীন বাংলা নাটকের মানানুযায়ী এ সৃষ্টি অমূল্য, চিরকালের দরবারে পৌঁছে দেবার পাথেয় এর আছে।

নবকুমার, কালী এবং জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অন্যান্য সভ্যবৃন্দ একই গোষ্ঠীর মানুষ। এদের মনোভাবে এবং মতবাদে ঘনিষ্ঠ মিল আছে। নবর বক্তৃতায় এই শ্রেণীর 'জীবনদর্শন' প্রকাশ পেয়েছে। মদ্যপান, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথাকে সরবে অস্বীকার, নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, নবসভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে বারাঙ্গনা সেবায় এদের সকলের আসক্তি প্রায় একই রূপ। এদের ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিটি, ইংরেজী শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের অনর্গল ব্যবহার, বিশেষত 'ওলড্ ফুল', 'মরাল করেজ', 'সুপরষ্টিসন', 'লিবরটি', 'ইন্ দি নেম অব ফ্রীডম', 'রিফরম' প্রভৃতি কথাগুলির ছড়াছড়ি একটা মেজাজের সৃষ্টি করেছে। একটা শ্রেণীর চরিত্র ভাষায় এমনি ধরে রাখার নিদর্শন সহজলভ্য নয়। এদের সংলাপের সাফল্য যে ভাষার এই রুচিহীন মিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্রও তা লক্ষ্য করেছিলেন।

> "To give any adequate idea of this clever little work by translated extracts would be entirely impossible, because half the fun lies in the absurd jargon interlarded with English words and the cant of debating clubs in which the characters speak".
>
> —[The Calcutta Review, 1871]

খুব অল্প অবকাশে চৈতন, শিবু, বলাই, মহেশের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের কতকাংশ ধরে রেখেছেন মধুসূদন। বলাই নবর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করে। এ ব্যাপারে মহেশের সক্রিয় সমর্থন আছে তার দিকে, বরং বলাইয়ের তুলনায় সে আরও উচ্চকণ্ঠ। নবর বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে নিন্দা করতে কিংবা তার অনুপস্থিতির সুযোগে অপরকে সভাপতি করে কার্যারম্ভের প্রস্তাবে মহেশের তৎপরতা প্রকাশ পেয়েছে। চৈতনের কিন্তু নবর নেতৃত্বে আস্থা আছে। শিবুর চরিত্রটি বেশ কৌতুকপ্রদ। নবর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু কোন মতবাদ বা বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকার মত মানস স্থিতিস্থাপকতা তার নেই। তার

প্রথম মন্তব্য, "যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখাপড়া বেশ জানে।" কিন্তু বিপক্ষদলের দ্বারা সহজেই সে প্রভাবিত হয়েছে। নবর শ্রেষ্ঠত্বে তার বিশ্বাসে দ্রুত ফাটল ধরেছে। ফলে সে দ্বিতীয়বার যখন মুখ খুলল তখনই নবকে বাদ দিয়ে সভার কাজ শুরু করার প্রস্তাব করেছে, "আমাদের তো কোরম্ হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম আরম্ভ করা যাউক্ না কেন?" শিবুই নবর সভাস্থলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্রুদ্ধভাবে আক্রমণ করেছে। ("দ্যাট্‌স এ লাই।") শিবু মাত্র পাঁচবার মুখ খুলেছে। দুচারটি শব্দের বেশি একবারও উচ্চারণ করে নি। কিন্তু তার মানসিক ভারসাম্যহীনতা এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। অতিদ্রুত মত পরিবর্তন, অসংযত উত্তেজনা, দু-এক গেলাস পান কবার পরেই নব্য সভ্যতার আববণ হারিয়ে ভেতরের অসজ্জিত ইতরতার আত্মপ্রকাশে, (মহেশের প্রতি)—ও শালা, তুই ঘুমুচ্ছিস না কি?), এবং চৈতনের উচ্চারিত 'সাকী' শব্দটির সূত্র ধরে হঠাৎ এক কলি গেয়ে ওঠাব ("গর ইয়াব নহো সাকী") শিবুর চরিত্রটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

কালী এবং নবকে ভালভাবে চিনবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। এদের ব্যক্তিস্বভাবেব পার্থক্যটি কোথাও অস্পষ্ট থাকে নি। কালীর তুলনায় নব অনেক বেশি উজ্জ্বল। কালী কৌশল-উদ্ভাবনে নবর চেয়ে অনেক পেছনে। কর্তাকে প্রতারিত করবার পন্থাটি নবর আবিষ্কার। বাবাজীকেও সোজাসুজি ঘা কতক দিয়েই সে বিদায় দিতে চেয়েছিল। ঘুষ দেবার পরিকল্পনা নবকুমারেব। অবশ্য কথার খেলায় কালীর জুড়ি মেলা ভার। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা-গীতগোবিন্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে অবশ্য তার জিহ্বা এবং স্মরণশক্তি প্রায় বিদ্রোহ করে বসে ["ধব-শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর-বিন্দাদূতীর গীত—"]। কিন্তু শব্দের কারচুপিতে এবং ভাবনা ও ভাষার লঘুতায় কৌতুক-সৃষ্টিতে তার বিশিষ্টতা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। নবকুমার পান খেয়ে তাকে মুখের গন্ধ দূর করতে বলল। তার উত্তরে কালী বলেছে, "আমি ভাই পান তো খেতে চাইনে, আমি পান কত্তে চাই।" নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে কালী যা বলেছ তাতে নিরাসক্ত নির্লজ্জতার সঙ্গে রসিকতা সমন্বিত হয়েছে। ["কি পরিচয় দেবো, বলো দেখি ভাই? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বল্‌বো যে আমি বিএরের মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই।"]

তুলনামূলকভাবে নবকুমারকে কিছু বেশি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। নবকুমারের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে মহেশ যে মন্তব্যই পেছনে করুক না কেন, তার নেতৃত্ব জ্ঞানতরঙ্গিনীর সভ্যবৃন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাতে সন্দেহ নেই। সে ধীরভাবে ভাবতে পারে, বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে সুকৌশলে উদ্ধার পেতে পারে। কর্তার চরিত্রের দুর্বলতা সে জানে, কালীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে এবং জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যানে সেই বৈষ্ণবী দুর্বলতার সুযোগ সে গ্রহণ করেছে। বাবাজীর দুর্বলতা কোথায় তাও তার জানতে বাকি নেই। কালীর কথামত অধৈর্য উত্তেজনায় বাবাজীকে মেরে মুখবন্ধ করতে সে চায় নি, কৌশলে টাকা ঘুষ খাইয়ে তাকে বশ করেছে। কালীর "মেমরি" নিয়ে সে ঠাট্টা করেছে, নবর নিজের মেমরি যে অনেক ভালো তা এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। কিন্তু নব এবং এই শ্রেণীর চরিত্রের বিকৃতিই কবি দেখাতে চেয়েছেন, তার ব্যক্তিত্বের গৌরব তাই অস্পষ্ট এবং অস্ফুট থেকে গিয়েছে। গৌরবের দিকটিকে আরও কিছু গুরুত্ব দিলে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বের পতনজাত ট্র্যাজিক সুর এর ব্যঙ্গরসকে অনেকখানি সমুন্নতি দিত। 'সধবার একাদশী'তে দীনবন্ধু অনুরূপ চেষ্টাই করেছিলেন। নবকুমারের চরিত্রের বিকৃতিই এই রচনার বিষয়বস্তু। নবকুমার চরিত্রের অন্ধ বিলাতি-আনার প্রতি মধুসূদন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এই ব্যাধি ইয়ং বেঙ্গলদের শ্রেণীগত চরিত্রধর্ম হলেও নবকুমারের কর্মে ও কথায় বিশেষ করে তার পরিচয় আছে। সে ভাড়া করা খেমটা নাচকে বিলিতি বল্ নাচ বলে অভিহিত করে। ["কম, ওপেন্ দি বল্. মাই বিউটিস্।"] বারাঙ্গনাকে বিলিতি রীতিতে আহ্বান জানায়, ["ও পয়োধরি, তুমি ভাই আমার আরম্ নেও।"] বাড়িতেও তার এই দৌরাত্ম্য চলে। ["সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?"]

নবর চরিত্রে পাঁচ ঘণ্টায় কোন বিকাশ দেখাবার চেষ্টা নিশ্চয়ই মধুসূদন করেন নি। কিন্তু তার মুডের পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথমে তার সতর্ক কৌশল চোখে পড়ে। একটু ভীতিও তার সঙ্গে জড়িত আছে বলে মনে হয়। কালী প্রথম থেকেই বেসামাল। তার পাশে নবর আচরণের কিঞ্চিৎ আত্মশাসন তথা বুদ্ধিনির্ভরতা স্পষ্ট ধরা যায়। কিন্তু জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় প্রবেশের পরেই সে অন্য রূপ ধারণ করে। আর তা চরম উন্মত্ততায় আত্মপ্রকাশ করে শেষ দৃশ্যে। সেখানে কর্তার গালাগালিতে তার মুখ থেকে যেসব বাক্যাংশ বেরিয়ে এসেছে তাতে চরম অসংলগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে।

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বহু উচ্চারিত এই বাক্যাংশগুলি তার অসারপ্রায় মস্তিষ্কে কতকগুলি গ্রন্থির সৃষ্টি করেছিল। কর্তার তর্জনগর্জনের মুখে গ্রন্থি খুলে অসঙ্গত অসংলগ্নভাবে সেই কথাগুলিই যেন প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপ রচনার এই সাফল্য নিঃসন্দেহে উচ্চ ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়।

কর্তার চরিত্র অনেকটা মামুলী। তবে বৈষ্ণব ভাবালুতার আধিক্য তার ব্যক্তিত্বেও খানিকটা বর্ণসম্পাত করেছে। বৈষ্ণব ভক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের পরিচয় দিতেই তিনি এতটা বেসামাল হয়ে পড়লেন ["তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হন?"] যে ঐ এক অস্ত্রে সহজেই নবকুমারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। সাময়িকভাবে কর্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে প্রতারিত করায় তাঁদের আর কোন অসুবিধাই হল না। তার উপরে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় আলোচ্য বিষয়রূপে যখন শ্রীমদ্ভাগবত এবং গীতগোবিন্দের নাম করা হল তখন তিনি ভাবে একেবারে গদগদ হয়ে পড়লেন ["জয়দেব ? আহা, হা কবিকুলতিলক, ভক্তিরসসাগর।"]।

বৈষ্ণব বাবাজীটি কিন্তু একটি তুলসী বনের বাঘ। হাতে যতই মালা জপ করুক এবং মুখে যতই রাধেকৃষ্ণ বলে বলে ভাববিহ্বল হয়ে পড়ুক বারবিলাসিনীদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে তার বাধা নেই। ["আহা হা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এরা কে ? হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।" (একদৃষ্টে অবলোকন।)]। তার উপরে ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা বলতেও তার দ্বিধা নেই। ["কালী। আমি বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক হয়েচি। শালা এদিকে মালা ঠকঠক করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কইতে স্বীকার পেলে ? শালা কি হিপক্রীট।"]।

সিকদার পাড়া ষ্ট্রীটে নানা জাতের অনেক লোকের দেখা মেলে। তাদের চরিত্রগুলি গৌণ এবং টাইপজাতীয়। কেউ মাতাল, কেউ ঘুষখোর পুলিশ সারজেন্ট, কেউ হোটেলের মুসলমান বাবুর্চি, আর কেউ কেউ পাড়ার বার-বিলাসিনী। এই পরিচয়ের মধ্যেই এদের চরিত্রলক্ষণ নিহিত। মধুসূদন এদের শ্রেণীস্বভাবকে জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুসলমান বাবুর্চির ভাষায় পূর্ববঙ্গের উচ্চারণভঙ্গি, ["ও দরওয়ানজী। এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে ?") বাস্তবতার বিভ্রম এনেছে নির্ভুল ভাবে। মাতালের

কথায় তার মানস ভারসাম্যহীনতা প্রতিফলিত। কবি যদি মাতাল বলে এর পরিচয় নাও দিতেন তবুও এর কথার ভঙ্গিতে, ভাবনার কথঞ্চিৎ বিকৃতিতে সে পরিচয় মুদ্রিত করে রেখেছেন।

বাবাজী সিকদার পাড়ার একটি বাড়ির দরজায় ঘা দিলে। তখন "(নেপথ্যে) তুমি কে গা? কাকে খুঁজচো গা?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বাড়ী?

(নেপথ্যে) ও পুঁটি! দেক্‌তো লা, কোন বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।" এই নেপথ্য-চারিণী যে বারাঙ্গনা জাতীয় স্ত্রীলোক তা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। একেই বলে খাঁটি নাটকীয় সংলাপ।

পুলিশ সারজেণ্টের ভাষাটি ইংরেজী এবং বিকৃত উচ্চারণের হিন্দীর এক বিচিত্র মিশ্রণ। তার চরিত্রের রূঢ় ঔদ্ধত্য, বিচারহীন দম্ভ, ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা ["হোল্ড ইওর টং ইউ ব্ল্যাকব্রুট" "চুপরাও ইউ ব্লাডি নিগর"] ও উৎকোচপ্রবণতার সঙ্গে কৌতুককরতার ("বলপূর্বক মাল্য গ্রহণ করিয়া গলায় পরিধান") হা, হা, হা, হা,। বাপরে বাপ, হাম বড়া হিন্দু হুয়া রাঢে কিস্‌ডে হা, হা, হা"। চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে সংলাপের ভাষায় এই বিশিষ্টতায়।

দুটি বারবিলাসিনীর যে চিত্র এই দৃশ্যে ধরা পড়েছে তা সংক্ষিপ্ত কিন্তু জীবন্ত। এমন কি পয়োধরী-নিতম্বিনীর তুলনায় এদের ভূমিকা অনেক উজ্জ্বল। এদের দুজনের ভাষায় এবং আচরণে বারাঙ্গনার নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, এবং রুচিহীন রসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, এদের দুজনের চরিত্রের মধ্যে সামান্য পার্থক্যের ইঙ্গিত করেছেন নাট্যকার। প্রথম বারাঙ্গনার গুরো নামক ব্যক্তির প্রতি সত্যকার দুর্বলতা আছে। "এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে চক্ষের জলে করে" ছাড়লেও এবং সেই অপদার্থ বিশ্বাসঘাতক লোকটার "মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ" ঝেড়ে শ্রাদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করলেও সে যে তা পারবে না তাতে সন্দেহ নেই। ["দ্বিতীয়। তুই পারবি, তা হলে আর ভাবনা কি?"]। দ্বিতীয় বারাঙ্গনার হৃদয় এ ব্যাপারে যথেষ্ট কঠিন ["আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম"]।

নবকুমারদের পরিবারের মেয়েদের যৌথজীবনের এক টুকরো এই প্রহসনে রূপলাভ করেছে। গিন্নির চরিত্রের সঙ্গে তরুণী মেয়ে ও বউদের দলের চরিত্রের পার্থক্য স্বল্প অবকাশে ধরে রেখেছেন কবি। গিন্নির মধ্যে চিরকালীন

আশঙ্কাতুর অবুঝ মাতৃহৃদয়কে কবি দেখেছেন। জীবনাদর্শের দিক থেকে তিনি স্বভাবতই রক্ষণশীল, কলিকালের মেয়েদের অলসতা ও কর্তব্যবিমুখতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চবাক। তরুণীরা সংসারের কাজে ফাঁকি দিয়ে তাসের আড্ডায় জমতেই বেশি পছন্দ করে। মেয়েদের তাস খেলা, ঝগড়া, একটু আদিরসাত্মক রসিকতা আমাদের বিস্মিত করে কবি কোথা থেকে পেলেন এই অভিজ্ঞতা। অবশ্য ভাইবোনদের সম্পর্ক নিয়ে যে জাতীয় রসিকতা করা হয়েছে সমকালীন সমাজের নৈতিক রুচিবিকারের কথা সাধারণ ভাবে মেনে নিয়েও তাকে অস্বাভাবিক বলেই সিদ্ধান্ত করতে হবে, তবে অন্তঃপুরিকাদের ভাষাটি পর্যন্ত কবি নিঃসংশয়িত ভাবে আয়ত্ত করেছেন। মেয়েদের একটা দল হিসেবে দেখেছেন কবি। তাদের স্বাতন্ত্র্যের দিকে বড় দৃষ্টিপাত করেন নি। তবে নবর স্ত্রী হরকামিনীর একটি মাত্র মন্তব্যে তার বঞ্চিত নারীত্ব হাহাকারে আর্ত হয়ে উঠেছে। নব যখন বাড়িতে ফিরে মাতলামী করতে লাগল তখন নৃত্যকালী প্রভৃতি লুকিয়ে তামাসা দেখতে চাইল। হরকামিনী কিছু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল "আর আমার ওসব ভাল লাগে না।" প্রহসনটির শেষে হরকামিনীর সংলাপে গোটা রচনার নীতি নিষ্কাশনের চেষ্টা থাকলেও নিম্নোদ্ধৃত কথায় বেদনা অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে—["হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, তার সীমাই নাই। হে বিধাতা। তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন ?"]। হরকামিনীর বিবাহিত জীবনের এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে স্বামী-পরিত্যক্তা প্রসন্নর দুঃখের ইঙ্গিতও কবি করেছেন। ["তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না" ।·]। এই বঞ্চনা, বেদনা ও দীর্ঘশ্বাসকে কবি চকিত চমকে মাত্র ব্যক্ত করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে গোটা সমাজের অন্তরলোকের ব্যাধির দিকে আঙুল দেখানো হয়েছে। এই দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি; হলে রচনাটির মূল ব্যঙ্গ-কৌতুকজড়ানো আস্বাদে বিঘ্ন ঘটত, সিরিয়াস সমাজ-সমস্যা তথা ব্যক্তি-বেদনা রচনাটির জাতিকেই বদলে দিত।

"একেই কি বলে সভ্যতা"য় দুর্বলতা আছে, কিন্তু সংলাপ রচনায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে এর নিপুণতা অনস্বীকার্য। সমাজসমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন কবি, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত আচরণ ও প্রবণতাকেও ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। রচনাটি তাই কোনক্রমেই সামান্য নয়।

॥ ছয় ॥

"বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনের ভিত্তিতে সমাজবাস্তবতা আছে কিনা সে-বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন।[২৫] কিন্তু সমকালীন সমাজ-ইতিহাস এর বাস্তবতাকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করে। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন,

> "কেবল ইংরাজী শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দু-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; চরিত্রহীন, বকধর্ম্মী, প্রাচীন সম্প্রদায়ের কুব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পরস্বাপহরণ, সামাজিক প্রতিপত্তিব জন্য দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা-প্রতিপালন তাঁহাদিগের অনেকের নিত্য ব্রত ছিল। বাহিরে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও ইহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্রসমূহকে উপহাসমাত্র করিত। ইয়ং বেঙ্গলদিগের উপর ইহাদিগের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল; কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলগণ যে সকল পাপ কল্পনাও করিতে পারিতেন না, ইহারা তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন, 'বুড়োশালিখের ঘাড়ে রোঁয়া', এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।"
>
> —[মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত]

এই প্রহসনে সমকালীন বাংলায় গ্রামজীবনের একটি ব্যঙ্গাত্মক চিত্র আঁকবার চেষ্টা আছে। পল্লীসমাজের গভীর ক্ষতের উপরে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছেন লেখক।

প্রথমত, জমিদারীপ্রথার নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা এবং প্রজাশোষণের একটি সাধারণ পটভূমিতে এই প্রহসনের কাহিনীটি সৃষ্ট। ভক্তপ্রসাদ গ্রামের জমিদার। প্রজাদের নিকট থেকে চরম নিষ্ঠুরতা করে প্রাপ্য আদায় করতে সে সদা তৎপর। গরীব চাষীরা যখন অনাবৃষ্টির আক্রমণে পর্যুদস্ত তখনও খাজনার পাই পয়সাটি গুণে নিতে ভক্তপ্রসাদের দ্বিধা হয় না। ['ভক্ত তোদের ফসল হোক আর না হোক তাতে আমার কি বয়ে গেল।'] জমাদারের লাঠি তার স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়োজিত। হানিফের মত গরীব চাষীই শুধু নির্যাতিত হয় না, দেবোত্তর সম্পত্তি পর্যন্ত তার লোভের হাত প্রসারিত। ["যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভুমি ছিল তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআপ্ত হয়ে গিয়েছে"।]।

দ্বিতীয়ত, জমিদারের অর্থনৈতিক শোষণই বহু অঞ্চলে প্রজাসাধারণের একমাত্র বিপদের কারণ হত না, অর্থ, প্রভুত্ব ও ক্ষমতার বলে তার লাম্পট্য গ্রামবাসীদের সর্বদা সন্ত্রস্ত করে রাখত। জমিদার ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্যকে কেন্দ্র করেই এই প্রহসনের কাহিনী গঠিত হয়েছে। হানিফের স্ত্রী ফতিমাকে ভোগ করবার চেষ্টা নিয়েই এর গল্প। কিন্তু এটিই একমাত্র ঘটনা নয়। ভক্তপ্রসাদের ভোগের উচ্ছিষ্ট বহু কুলবালাকে বারাঙ্গনার জীবন বহন করতে হয়েছে। ["গদা। আজ্ঞে, ঐযে ভট্‌চায্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্ত) তারপরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।"]। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিবাহিতা কিংবা কুমারীর প্রতি, তার কন্যা দৌহিত্রীর বয়সী মেয়েদের দিকেও তার লালসাপঙ্কিল হাত সর্বদা প্রসারিত।

তৃতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকে কেন্দ্র করে নব্য ইংরেজ শিক্ষায় কেউ কেউ যখন বাঙালির জীবনতটে আঘাত করতে লাগল তখন এই অর্থপিশাচ, লম্পট, ধনী ও ক্ষমতাবান জমিদার শ্রেণীর একটি নূতন রূপ আত্মপ্রকাশ করল। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের হাওয়া লাগল তাকে বিদেশী ম্লেচ্ছাচারের অনুকরণ বলে এঁরা আর্তনাদ করে উঠলেন। সনাতন ধর্ম রক্ষার ধ্বজাধারীরূপে এঁরাই নিজেদের জাহির করে বেড়াতে লাগলেন। এই উচ্চবিত্ত শ্রেণী নবীনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ তৈরী করলেন। সর্ববিধ রক্ষণশীলতা, মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস এবং যুক্তিবিরোধী কদর্যতা জাতীয় ঐতিহ্যের নামাবলীতে আবৃত হয়ে এঁদের পক্ষপুট আশ্রয় করল। শুধু তাই-ই নয়, সনাতন হিন্দুধর্মের এই রক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা, পাপাচার ও কামুকতার পরিচয় দিতে দ্বিধা করল না। ভক্তপ্রসাদের চরিত্রকে অবলম্বন করে সমাজব্যাধির এই কেন্দ্রেই আঘাত করতে চাইলেন মধুসূদন, প্রথমোক্ত দুটি দিক গৌণত এর সঙ্গে সম্পর্কিত হল।

তবে "বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে সামাজিক সাধারণচিত্রের প্রত্যক্ষতা শিল্পরূপে আবৃত হয়েছে দুটি কারণে ; (১) মুখ্য চরিত্রের ব্যক্তিলক্ষণ বেশ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করায়, (২) বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্রের স্থানে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প গঠিত হওয়ায়।

বুড়োশালিখের ঘাড়ে রোঁ সমাজ-সমস্যার ভিত্তিতে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু সামাজিক ব্যঙ্গ হয়ে উঠলেও এর সাহিত্যিক উৎকর্ষে বাধা কোথাও নেই। সমাজ-সমস্যাকে আত্মসাৎ করে গল্প গঠিত হয়েছে, চরিত্র সৃষ্ট হয়েছে।

চরিত্রহীন এক বৃদ্ধ জমিদারের একদিনের লাম্পট্যের কাহিনীতে ব্যাপক সমাজসত্যের ছায়া পড়েছে।

॥ সাত ॥

বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ-এর নাট্যাঙ্গিক লক্ষ্য করার মত। আগেই বলেছি 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় গল্পগঠনে ত্রুটি ছিল। নকশাধর্ম এর কাহিনীগ্রন্থনকে ব্যাহত করেছিল। কিন্তু বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁতে মধুসূদন সে বিচ্যুতি সহজেই কাটিয়ে উঠেছেন। একটি পূর্ণদেহ গল্পগঠনে সাফল্য অর্জন করেছেন।

গল্পটি জটিল নয়, প্রহসনের গল্পে জটিলতা প্রত্যাশিতও নয়। জীবনকে নানাদিক থেকে সম্পূর্ণ দেখবার দাবি প্রহসন করে না। তার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে একমুখী। তাই গল্পে জটিলতা আনবার চেষ্টা করলে তার পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা। বুড়োশালিখের ঘাড়ে রোঁ-এর কাহিনী বৃদ্ধ জমিদার ভক্তপ্রসাদের কামুক অনাচারের কাহিনী। গ্রামের সুন্দর মেয়ের রেহাই নেই তার লোভের কবল থেকে। সে মেয়ে বিবাহিতা অথবা কুমারী, হিন্দু অথবা মুসলমান যাই হোক না কেন। ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের এই সাধারণ পরিচয় কাহিনী নয়। হানিফের তরুণী স্ত্রী ফতিমাকে হস্তগত করা তার জীবনের বহুসংখ্যক লাম্পট্যকাহিনীর অন্যতম মাত্র। কিন্তু ঐ ঘটনাটি একতম হয়ে ওঠায় এখানে তা গল্প হয়ে উঠেছে। প্রহসনের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অর্থপিশাচ জমিদার ভক্তপ্রসাদ হানিফের অল্প খাজনা নিয়ে সম্প্রতি ছেড়ে দিতে রাজী হল। কারণ অনাবৃষ্টি ও হানিফের কঠিন দারিদ্র্য নয়, হানিফের স্ত্রী ফতিমার সৌন্দর্য—তাকে ভোগ করবার বাসনা। গদাধর এবং তার পিসি পুঁটি এই ব্যবস্থা করবার জন্য নিযুক্ত হল। দ্বিতীয় দৃশ্যে ফতিমাকে বশ করবার জন্য পুঁটির চেষ্টা, হানিফ, পুঁটি এবং বাচস্পতির (জমিদার ভক্তপ্রসাদ কর্তৃক নির্যাতিত জনৈক ব্রাহ্মণ) গোপনে পরামর্শ। শেষে ফতিমার সম্মতি। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে বৃদ্ধ লম্পট ভক্তপ্রসাদের সন্ধ্যাসমাগমের প্রতীক্ষা চমৎকার চিত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে শিবমন্দিরে ভক্তপ্রসাদ ফতিমার উপরে বলাৎকারের চেষ্টা করে। ছদ্মবেশী হানিফের হাতে প্রহৃত হয়। পূর্ব পরামর্শমত বাচস্পতি এবং হানিফ ভক্তপ্রসাদকে ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করে এবং এই সুযোগে বেশ কিছু অর্থ আদায় করে নেয়। ভক্তপ্রসাদ এতকাল গোপনে যে সব অপকর্ম করে চলেছিল

তার আবরণ খসে পড়ল। গুরুপাপে তার লঘু দণ্ড হল। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল লোকটার লাম্পট্য একটা বড় রকমের আঘাত খেল, তার মুখোস আর অক্ষত রইল না। একেই কি বলে সভ্যতার মত বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ মূলত চিত্রসমষ্টি না হয়ে, হয়ে উঠল গল্প। কারণ—

এক। ভক্তপ্রসাদের নিত্যকার লাম্পট্যের কাহিনীর একটি প্রতিনিধিত্ব-মূলক চিত্রমাত্র এখানে প্রকাশ পায় নি। ফতিমাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল তা তার লম্পটজীবনে একতম, বহু নৈশ অভিযানের মধ্যে মনে করে রাখবার মত বিশিষ্টতম অভিযান।

দুই। ভক্তপ্রসাদ-হানিফ-ফতিমার গল্পটির ভিত্তিতে একটি বিশেষ সমস্যা আছে। যে সমস্যা শুধুমাত্র সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত চরিত্রের টানাপেড়েনে তা তৈরী। একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা যা দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের রূপ ধরে দেখা দেয়, তাই-ই কোন কাহিনীর ভিত্তি তৈরী করতে পারে। Unity of Action বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝা যায় সমস্যার ঐক্য—এবং সে ঐক্য ঘটনাগত। একটি বিশিষ্ট ঘটনার সমস্যা নয়, একটা যুগের সমস্যা, একটা জাতির সমস্যা বা একটা ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনসমস্যায় ঘনপিনদ্ধ ঐক্য থাকে না। বিচিত্র ঘটনাসন্ধির সমবায়ের মধ্য দিয়ে সেই সব সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে। নাটকীয় কাহিনীর ভিত্তিতে যে সমস্যা তাকে একনিষ্ঠ হতে হয়, একটি সমস্যাসঙ্কুল ঘটনার আদ্যন্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ হলেই তা পূর্ণদেহ ঐক্যবদ্ধ গল্প হয়ে ওঠে। এই সমস্যা দ্বন্দ্বের রূপ ধরে দেখা দেয়। নাটকের কাহিনী যুগপৎ একনিষ্ঠ এবং দ্বন্দ্বমূল। বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ-তে এই দুটি লক্ষণই বর্তমান। ভক্তপ্রসাদ এবং হানিফের যে সংঘাত এর কাহিনীকেন্দ্রে তা শুধুমাত্র জমিদার ও প্রজাশক্তির মধ্যের দ্বন্দ্ব হলে একনিষ্ঠ গল্প গঠিত হতে পারত না। কামুক ভক্তপ্রসাদের যমদূতের মত শক্তিশালী হানিফের স্ত্রীকে ভোগ করবার চেষ্টা একটি ঘটনাগত সমস্যা সৃষ্টি করেছে—এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত ঘটিয়েছে। এই সমস্যা তথা দ্বন্দ্বের কেন্দ্রেই বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ-র কাহিনীটি আবর্তিত।

তিন। তরঙ্গচাঞ্চল্য ঘটনার গল্পে রূপান্তরের অন্যতম লক্ষণ। ভক্তপ্রসাদ-ফতিমা-হানিফকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব-সমস্যার সৃষ্টি তার বিকাশ একে আদৌ নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকতায় সীমাবদ্ধ করে রাখে নি। লম্পট

জমিদারের ভোগ আরও পাঁচটা ক্ষেত্রে যে পথ ধরে মসৃণভাবে চলেছে, এখানে তা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে আবর্ত ও কলরোলের সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁই প্রথম প্রহসন হয়েও পূর্ণাঙ্গ গল্প হয়ে উঠল।

নাটকীয়তার যে প্রধান গুণ ঘটনার প্রত্যক্ষতা এবং সংঘর্ষ বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ তাতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ বলা যেতে পারে।

যে কেন্দ্রীয় ঘটনাদ্বন্দ্বটি এই নাট্যকাহিনীর প্রাণস্বরূপ তার পরিচয় আমরা আগেই নিয়েছি। এই প্রধান দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে ভক্তপ্রসাদ-বাচস্পতির সংঘর্ষটি। ভক্তপ্রসাদ বাচস্পতিকে ব্রহ্মত্র থেকে বঞ্চিত করেছে, হানিফের সঙ্গে পরামর্শ করে সুযোগ বুঝে বাচস্পতি তার শোধ তুলেছে। ভক্তপ্রসাদের চরিত্রেব ব্যাপকতর পরিচয় বাচস্পতির সম্পর্কে আসায় আমরা লাভ করেছি। বাচস্পতির কাহিনীর আরম্ভ হানিফ প্রসঙ্গ থেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে। যদিও দুটি সূত্রেরই মূল ভক্তপ্রসাদের চরিত্রে—তার জমিদারী শোষণ ও কামুক লালসাবৃত্তিতে। বাচস্পতির স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ দ্রুত হানিফের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে। ভক্তপ্রসাদ-বাচস্পতির দ্বন্দ্ব তাই কোন পৃথক আবর্ত সৃষ্টি করে নি। ভক্তপ্রসাদ-হানিফ-ফতিমার মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাচস্পতির অস্তিত্ব মূল কাহিনীর পটভূমিকেই কিছু বিস্তৃতি দিয়েছে; একটুখানি জটিল করে তুলেছে।

এ কাহিনীব মধ্য দিয়ে নব্য শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল শ্রেণীর বকধার্মিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল। নব্য ও প্রাচীনের সেই দ্বন্দ্ব প্রহসনে যথেষ্ট প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি। অথচ এর সমাজ-চেতনায় সেই ভাবদ্বন্দ্বের প্রতিই নাট্যকারের ব্যঙ্গ-বাণ উদ্যত। এটি বর্তমান প্রহসনের ত্রুটি নয়। সামাজিক ভাব-দ্বন্দ্বটিকে নাট্যকার ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের পটভূমিতে স্থাপন করেছেন। ফলে যা হতে পারত শুধু একটি ব্যক্তির চরিত্রদৌর্বল্য, তাই হয়ে দাঁড়াল একটা সমাজ-শ্রেণীর ভণ্ডামীর প্রতিনিধি। ভক্তপ্রসাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য রইল, একটি বিশেষ যুগের শ্রেণী-স্বভাবের ব্যঞ্জনাও তার সঙ্গে যুক্ত হল। মধুসূদন এই ভাবদ্বন্দ্বটিকে প্রহসনের একটি দৃশ্যে (দ্বিতীয়াঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে) আনন্দবাবুর সঙ্গে কথোপকথনে সুন্দর প্রকাশ করেছেন। ["ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌চি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না। আনন্দ। আজ্ঞে এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান

কোনমতেই উচিত হয় না। ভক্ত। বল কি, বাবু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে? আর 'মরা গরুতেও কি ঘাস খায়' এই বলে কি পিতৃ পিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে?"]।

এই অংশে প্রহসনটি প্রত্যক্ষ ঘটনার স্থানে বিবৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু এ বিবৃতি নাট্যরসের হানি ঘটায় নি। দুটি বিপরীত ভাবের সংঘর্ষ কথোপকথনে চমৎকার ফুটেছে। এ বিবৃতি কোথাও নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ে নি। বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সংক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। কারণ ভক্তপ্রসাদের ক্ষেত্রে এ আলাপ শুধুমাত্র আলোচনা নয়, এর সঙ্গে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব জড়িত।

প্রহসনের প্রথম অঙ্কের প্রথম গভাঙ্কে ভগী-পঞ্চী-ভক্তপ্রসাদকে অবলম্বন করে যে অংশ স্থান পেয়েছে ফতিমা-হানিফের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। প্রহসনে এ জাতীয় অসম্বদ্ধ অংশের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এর তাৎপয অনুধাবনযোগ্য। ফতিমার প্রতি লোলুপতা যে তার স্বভাবের কোন বিশিষ্ট ঘটনা নয়, এ বিষয়ে সে যে চরম পাপিষ্ঠ, কিশোরী পঞ্চীর প্রতি তার লোভ সে কথার প্রমাণ দেয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে একটা parallelism-এর ভাব সৃষ্টি করে এই অংশ একদিকে যেমন নাট্যকৌতূহল বাড়িয়েছে, তেমনি ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের সব মহল একেবারে স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কেব প্রথম গর্ভাঙ্কে ভক্তবাবুব অনুপস্থিতিব সুযোগে গদা ও রাম চাকরের বাবু-বাবু খেলা উপভোগ্য রঙ্গরস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রহসনের মূল গল্পের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। এ অংশ পরিত্যাগ করলে নাট্যগঠন ইস্পাতের মত কঠিন ও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠত।

প্রহসনটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত। এই অঙ্ক-বিভাগ অনিবার্য ছিল বলে মনে হয় না। চারটি দৃশ্য চারটি ভিন্ন স্থানে ঘটেছে। স্থানগত ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে এখানে অঙ্কবিভাগ তাই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। ঘটনার দিক থেকেও এ প্রহসনে অঙ্কবিভাগের সুযোগ নেই। প্রথম তিনটি দৃশ্যেই কেন্দ্রীয় ঘটনার প্রস্তুতি চলেছে, চতুর্থ দৃশ্যে তার অনুষ্ঠান। কাজেই প্রথম তিনটি দৃশ্যকে এক অঙ্কে এবং চতুর্থ দৃশ্যটিকে অন্য অঙ্কে স্থাপন করলে তবুও একটা যুক্তি পাওয়া যেত। (সেরূপ অঙ্কবিভাগও কিন্তু এ প্রহসনের পক্ষে আদৌ অপরিহার্য নয়।) নাট্যকার যেভাবে অঙ্কবিভাগ করেছেন তার পেছনে কোন

জমিদারের ভোগ আরও পাঁচটা ক্ষেত্রে যে পথ ধরে মসৃণভাবে চলেছে, এখানে তা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে আবর্ত ও কলরোলের সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁই প্রথম প্রহসন হয়েও পূর্ণাঙ্গ গল্প হয়ে উঠল।

নাটকীয়তার যে প্রধান গুণ ঘটনাব প্রত্যক্ষতা এবং সংঘর্ষ বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ তাতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ বলা যেতে পারে।

যে কেন্দ্রীয় ঘটনাদ্বন্দ্বটি এই নাট্যকাহিনীর প্রাণস্বরূপ তার পরিচয় আমরা আগেই নিয়েছি। এই প্রধান দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে ভক্তপ্রসাদ-বাচস্পতির সংঘর্ষটি। ভক্তপ্রসাদ বাচস্পতিকে ব্রহ্মত্র থেকে বঞ্চিত করেছে, হানিফের সঙ্গে পরামর্শ করে সুযোগ বুঝে বাচস্পতি তার শোধ তুলেছে। ভক্তপ্রসাদের চাবত্রের ব্যাপকতর পরিচয় বাচস্পতির সম্পর্কে আসায় আমরা লাভ করেছি। বাচস্পতির কাহিনীর আরম্ভ হানিফ প্রসঙ্গ থেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে। যদিও দুটি সূত্রেরই মূল ভক্তপ্রসাদের চরিত্রে—তার জমিদারী শোষণ ও কামুক লালসাবৃত্তিতে। বাচস্পতির স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ দ্রুত হানিফের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে। ভক্তপ্রসাদ-বাচস্পতির দ্বন্দ্ব তাই কোন পৃথক আবর্ত সৃষ্টি করে নি। ভক্তপ্রসাদ-হানিফ-ফতিমার মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাচস্পতিব অস্তিত্ব মূল কাহিনীর পটভূমিকেই কিছু বিস্তৃতি দিয়েছে ; একটুখানি জটিল করে তুলেছে।

এ কাহিনীব মধ্য দিয়ে নব্য শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল শ্রেণীর বকধার্মিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল। নব্য ও প্রাচীনের সেই দ্বন্দ্ব প্রহসনে যথেষ্ট প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি। অথচ এর সমাজ-চেতনায় সেই ভাবদ্বন্দ্বের প্রতিই নাট্যকারের ব্যঙ্গ-বাণ উদ্যত। এটি বর্তমান প্রহসনের ত্রুটি নয়। সামাজিক ভাব-দ্বন্দ্বটিকে নাট্যকার ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের পটভূমিতে স্থাপন করেছেন। ফলে যা হতে পারত শুধু একটি ব্যক্তির চরিত্রদৌর্বল্য, তাই হয়ে দাঁড়াল একটা সমাজ-শ্রেণীর ভণ্ডামীর প্রতিনিধি। ভক্তপ্রসাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য রইল, একটি বিশেষ যুগের শ্রেণী-স্বভাবের ব্যঞ্জনাও তার সঙ্গে যুক্ত হল। মধুসূদন এই ভাবদ্বন্দ্বটিকে প্রহসনের একটি দৃশ্যে (দ্বিতীয়াঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে) আনন্দবাবুর সঙ্গে কথোপকথনে সুন্দর প্রকাশ করেছেন। ["ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌চি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না। আনন্দ। আজ্ঞে এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান

কোনমতেই উচিত হয় না। ভক্ত। বল কি, বাবু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে? আর 'মরা গরুতেও কি ঘাস খায়' এই বলে কি পিতৃ পিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে?"]।

এই অংশে প্রহসনটি প্রত্যক্ষ ঘটনার স্থানে বিবৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু এ বিবৃতি নাট্যরসের হানি ঘটায় নি। দুটি বিপরীত ভাবের সংঘর্ষ কথোপকথনে চমৎকার ফুটেছে। এ বিবৃতি কোথাও নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ে নি। বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সংক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। কারণ ভক্তপ্রসাদের ক্ষেত্রে এ আলাপ শুধুমাত্র আলোচনা নয়, এর সঙ্গে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব জড়িত।

·প্রহসনের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ভগী-পঞ্চী-ভক্তপ্রসাদকে অবলম্বন করে যে অংশ স্থান পেয়েছে ফতিমা-হানিফের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। প্রহসনে এ জাতীয় অসম্বন্ধ অংশের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এর তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য। ফতিমার প্রতি লোলুপতা যে তার স্বভাবের কোন বিশিষ্ট ঘটনা নয়, এ বিষয়ে সে যে চরম পাপিষ্ঠ, কিশোরী পঞ্চীর প্রতি তার লোভ সে কথার প্রমাণ দেয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে একটা parallelism-এর ভাব সৃষ্টি করে এই অংশ একদিকে যেমন নাট্যকৌতূহল বাড়িয়েছে, তেমনি ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের সব মহল একেবারে স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ভক্তবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগে গদা ও রাম চাকরের বাবু-বাবু খেলা উপভোগ্য রঙ্গরস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রহসনের মূল গল্পের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। এ অংশ পরিত্যাগ করলে নাট্যগঠন ইস্পাতের মত কঠিন ও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠত।

প্রহসনটি দুটি অঙ্কে বিভক্ত। এই অঙ্ক-বিভাগ অনিবার্য ছিল বলে মনে হয় না। চারটি দৃশ্য চারটি ভিন্ন স্থানে ঘটেছে। স্থানগত ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে এখানে অঙ্কবিভাগ তাই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। ঘটনার দিক থেকেও এ প্রহসনে অঙ্কবিভাগের সুযোগ নেই। প্রথম তিনটি দৃশ্যেই কেন্দ্রীয় ঘটনার প্রস্তুতি চলেছে, চতুর্থ দৃশ্যে তার অনুষ্ঠান। কাজেই প্রথম তিনটি দৃশ্যকে এক অঙ্কে এবং চতুর্থ দৃশ্যটিকে অন্য অঙ্কে স্থাপন করলে তবুও একটা যুক্তি পাওয়া যেত। (সেরূপ অঙ্কবিভাগও কিন্তু এ প্রহসনের পক্ষে আদৌ অপরিহার্য নয়।) নাট্যকার যেভাবে অঙ্কবিভাগ করেছেন তার পেছনে কোন

মনোভাব কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত দুটি প্রহসনেই মধুসূদন অভিনয়কালীন বিরতির কথা ভেবে অঙ্কবিভাগের পরিকল্পনা করেছেন, নাটকের অভ্যন্তরের সঙ্গে এই বিভাগকে সম্পর্কিত করতে চান নি।

এ প্রহসনেও কালগত ঐক্য নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখা হয়েছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য ["পুঁটি।...তা তুই রাত চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস। ... ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাশা হয়।"]। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ["ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা আজ কি আর ফুরবে না? ...উঃ! এখনও না। হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!"] এবং দ্বিতীয় দৃশ্য ["ফতে। না ভাই, যে আঁধার, বড় ডর লাগে।"]। একই দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘটেছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটির সঙ্গে অপর তিনটি দৃশ্যের এত নিশ্চিত কালগত ঐক্য স্থাপন করেন নি মধুসূদন, একটু দ্বিধার ভাব রেখে দিয়েছেন। ["ভক্ত। ...অ্যা? আজ রাত্রে ঠিক্‌ঠাক কত্যে পারবি তো? গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।"] অথচ চারটি দৃশ্যই একদিনের ঘটনা এরূপ উপলব্ধিতে কোন বাধা নেই। সংহত আবেদনসৃষ্টিতে কালগত এই ঐক্য নিঃসংশয়ে সহায়তা করেছে।

নাট্যকার বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ-র যে দৃশ্যে ঘটনার শীর্ষবিন্দুটি স্থাপন করেছেন, যেখানে ভূত সেজে এসে হানিফ কর্তাকে উত্তমমধ্যম দিয়ে গেল ["ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।"], সেখানে উত্তেজনা চরমে পৌঁচেছে। প্রথম দৃশ্যে গদা যখন ভক্তপ্রসাদকে ফতেমার রূপের কথা বলল, (এখানে প্রহসনটির Exposition) তখন থেকে এই মুহূর্তের দিকে লক্ষ্য করেই যেন ঘটনাস্রোত প্রবাহিত। পুঁটির দৌত্য, ভক্তবাবুর সাজসজ্জা ও আকুল প্রতীক্ষা সব কিছুই (যাকে বলা যেতে পারে এর growth of action) এই climax-য়ের দিকে প্রহসনটিকে নিয়ে গিয়েছে। তার পরবর্তী অংশে fall of action এবং catastrophe। উত্তেজনার তীব্রতা এই অংশে ক্রমে হ্রাস পেয়ে যবনিকাপাত ঘটেছে।

নাটকের এই climax-য়ের পূর্বাভাস দৃশ্যের প্রথমে থাকায় এর নাট্য-কৌতূহল অনেকটা বিনষ্ট হয়েছে এরূপ অভিমত কেউ কেউ প্রকাশ

করেছেন।[২৬] দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের গোড়ায় হানিফ-বাচস্পতির আলাপ থেকে আমরা জানতে পারি যে তারা কাছেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু হানিফ রাগে আত্মহারা, পূর্ব পরামর্শ ও পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে ভক্তপ্রসাদকে আক্রমণ করতে চাইছে, বাচস্পতি তাকে বুঝিয়ে কৌশলানুযায়ী কাজ করতে রাজী করাচ্ছে। কিন্তু ঠিক কি পরিকল্পনা এরা করেছে, পাঠক-দর্শক তা জানতে পারে না। ভক্তপ্রসাদের কামুক রসিকতা উপভোগ করতে করতেও পেছনে এদের লুকিয়ে থাকা সর্বদাই একটা অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের উৎকণ্ঠ করে রাখে। ভক্তপ্রসাদের লোলুপতা ও বাক্‌বিন্যাসের পেছনে অনুপস্থিত হানিফ-বাচস্পতির অদৃশ্য ছায়াপাত একটা বিশিষ্ট নাট্যাবেদন সৃষ্টি করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ভাঙা শিবমন্দির থেকে যেন রুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, আর ছদ্মবেশী হানিফের সাক্ষাৎ ভূতের মত আবির্ভাব ঘটে। এ একান্ত স্বাভাবিক। অথচ ঠিক এমনটি ঘটবে কে জানত! একে বলা চলে অনিবার্যভাবে আকস্মিক।

গল্পের পূর্ণতায় ও দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতিতে, সংলাপের প্রাণচাঞ্চল্যে, চরিত্র-চিত্রণের নৈপুণ্যে বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ নাট্যরসে সমৃদ্ধ। তার মধ্যে আবার দুই একটি বিশিষ্ট নাট্যমুহূর্ত গঠনে (ক্লাইম্যাক্স বাদ দিয়ে) নাটকীয় কলাকৌশল মধুসূদনের কতটা আয়ত্ত হয়েছিল তার প্রমাণ মিলবে।

এক। প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। হানিফ গদার সাহায্য পুরো খাজনার হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করল। গদা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারও করল। একটু আত্মপ্রসাদের ভাব নিয়ে হানিফ বাড়ি ফিরল ["(স্বগত) বাঁচ্‌লাম! বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপেড়ি কত্তো তা হলে সব দিয়ে ফ্যাল্‌তাম।"] কিন্তু গদা কি উপায়ে তাকে রক্ষা করল, ভক্তবাবু কেন তাকে রেহাই দিল তা জানলে কি সে এতটা উল্লসিত হতে পারত? পাঠক-দর্শকের তা অজানা নয়। ফলে হানিফের আনন্দে তারা এক জাতীয় কৌতুক অনুভব না করে পারে না। আসল ঘটনাটি প্রকাশ পেলে হানিফের এই আনন্দের কিরূপ রূপান্তর ঘটবে তা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হয় না। পাঠক-দর্শকের মনের এই বিশিষ্ট কম্পন নাট্যগুণসমৃদ্ধ।

দুই। দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। ভক্তপ্রসাদ ভাঙা শিবমন্দির তার অনাচারের স্থানরূপে বেছে নেয়। ["(চিন্তিতভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে?

—হ্যাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্য হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন ছার?" ঠিক তখনই নেপথ্যে বাচস্পতির গম্ভীর স্বর শোনা যায়—"বটে রে পাষণ্ড দুরাচার?" এর নাটকীয় প্রতিক্রিয়া ভক্তপ্রসাদের ত্রাসে, পুঁটি ও গদার কম্পনে ধরে রেখেছেন নাট্যকার।

তিন। ঐ একই দৃশ্যে হানিফের প্রহারে ভক্তপ্রসাদ যখন প্রায় অচেতন ঠিক তখনই "মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ী—এই তো বিচার বটে" রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে বাচস্পতির আগমন তাৎপর্যপূর্ণ নাটকীয় প্রবেশরূপে গ্রাহ্য। গানটির নির্বাচন খুবই সময়ানুগ, বিশেষ করে আনন্দময়ী কথাটিতে বাচস্পতির চাপা আহ্লাদ যেন জমাট বেঁধে আছে।

চার। ঐ একই দৃশ্যে বাচস্পতির সঙ্গে যখন ভক্তবাবুর একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। সে যখন ভক্তবাবুকে নিশ্চিন্ত করল ["·· তার জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন"] ঠিক সেই মুহূর্তে "কত্তাবাবু সালাম করি" বলে হানিফের প্রবেশ যে কি পরিমাণ নাটকীয় ভক্তবাবুর ব্যাকুল আর্তনাদে তা ধরা পড়েছে। তার ক্ষণিক নিশ্চিন্ততার পরেই গভীরতর আতঙ্ক এবং বিবর্ণ মুখচ্ছবি "একি! অ্যাঁ!" এই দুটি বিস্ময়সূচক অব্যয়ে নাট্যকার সম্পূর্ণই প্রকাশ করেছেন।

॥ আট ॥

বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ। প্রহসনে চরিত্রের সংখ্যা অল্প। কোন চরিত্রই খুব বেশি জটিল ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়। তবে প্রধান পাত্র-পাত্রী কয়টিকে কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিমাত্র ব'লে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তা ছাড়া এদের সংলাপের সার্থকতাও লক্ষণীয়। ভদ্র হিন্দুর সংলাপ মার্জিত চলিত। কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের কথ্য ভাষার মত। ভদ্রেতর চরিত্রে গ্রাম্যতার ছাপ পড়ায় প্রকাশ ক্ষমতা বেড়েছে। বিশেষ করে হানিফ ও ফতেমার ভাষায় গ্রাম্য উচ্চারণের ভঙ্গি ও কচিৎ দু-একটি ফার্সী শব্দ স্বাভাবিকতাকে বেঁধে রেখেছে। এ প্রহসনের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের ভাষায় তার ব্যক্তি-পরিচয় মুদ্রিত।

ভক্তপ্রসাদ এই প্রহসনের প্রধান ব্যক্তি। তার চিন্তাধারা এবং আচরণকেই এখানে ব্যঙ্গের বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভক্তপ্রসাদকে আশ্রয় করেই

প্রহসনটি ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতার কথা ছাপিয়ে একটা যুগের সমাজচিন্তায় প্রবেশ করেছে।

ভক্তপ্রসাদের চরিত্রে একটি সমাজ-শ্রেণীর প্রতিনিধির রূপ আঁকা হয়েছে। তার পরিচয় আগে দিয়েছি। সংক্ষেপে এখানে তা পুনর্বিবৃত করছি।

এক। ভক্তপ্রসাদ ধনী জমিদার। জমিদারের স্বার্থবোধ এবং শোষণ তার চরিত্রের একটা মুখ্য লক্ষণ। দেশে অনাবৃষ্টিতে রায়ত মারা পড়লেও ভক্তপ্রসাদ আধপয়সা খাজনা রেহাই দিতে রাজী নয়। হানিফকে জমাদারের হাতে সঁপে দিয়ে লাঠির ঘায়ে বাকী খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা সে করেছিল। বাচস্পতির ব্রহ্মত্র জমি দখল করে নিয়ে বাগানটি মাপসই করায় ভক্তপ্রসাদ দ্বিধাহীন। গ্রাম্য জমিদারদের শোষণের দিকটাই তার চরিত্রে ছিল, তাদের চরিত্রের যে প্রান্তে বদান্যতা ভক্তপ্রসাদ নিজেকে সযত্নে তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বাচস্পতির মাতৃশ্রাদ্ধে পাঁচ টাকার বেশি দিতে তার হাত ওঠে নি।

দুই। গ্রাম্য জমিদারের লাম্পট্য ভক্তপ্রসাদের চরিত্রে এমন একটা স্তরে উঠেছিল যাতে কুমারী বালিকাকে চিরকালের জন্য বারাঙ্গনা পল্লীর অধিবাসী করতে তার দ্বিধা হয় নি। মুসলমান কৃষকবধূ ফতেমা কিংবা হিন্দুঘরের কিশোরী পঞ্চীকে ভোগ করার বাসনায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে সহজকৃপণ জমিদার অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

তিন। ভক্তপ্রসাদ নব্য ইংরেজী শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তার বিস্তারে আতঙ্ক অনুভব করে। পুরাতন সব কিছুকে সনাতন হিন্দুধর্মের অবশ্য রক্ষণীয় আচরণ বলে তার বিশ্বাস। দেব-ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা খৃষ্টানী মত। জাতিভেদ প্রথা অবশ্য রক্ষণীয়। কলির প্রতাপে সব কিছু যেতে বসেছে দেখে তার আক্ষেপের শেষ নেই। পুত্রের উচ্চশিক্ষা-লাভ বরং বন্ধ থাক, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কার থেকে ভ্রষ্ট হওয়া চলবে না।

ভক্তপ্রসাদের এই শ্রেণী-চরিত্রের সঙ্গে কতকগুলি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। নারীদেহ লোলুপতাকে তার চরিত্রের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়রূপে দাঁড় করিয়েছেন নাট্যকার। বার্ধক্য এই লোলুপতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। সুন্দরী তরুণীর কথা শুনলেই যেন নখদন্তহীন এই বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের লালা ঝরতে থাকত। [“গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বলবো? বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোনা। ভক্ত। (মালাজপী)

জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কিরে ?"]। ফতেমা মুসলমান হওয়ায় প্রথমে কিঞ্চিৎ দ্বন্দ্বের ভাব তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানীকে বশ করার জন্য মাথায় তাজ পরতে, আতর মাখতে সে তৎপরতা দেখিয়েছে। এমন কি ধর্মত্যাগের কথাও সে একবার বলেছে। ভক্তপ্রসাদের ভোগ শুধু দেহের নয়, চোখেরও ["পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড়ো মিন্‌সে তো কম নয় গো। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় নাকি? ওমা, ছি! ও কি গো! এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্!"]; এমন কি আদিরসাত্মক কবিতার আবৃত্তিতে পর্যন্ত এক ধরনের বিকৃত যৌনতৃপ্তি সে লাভ করে। পঞ্চীকে দেখে সে আবৃত্তি করে উঠেছে—

মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া ওঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥

ফতেমাকে লক্ষ্য করে সে টপ্পা গেয়েছে—

তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো॥

ভক্তপ্রসাদের কবিত্বের ঘোর তার গদ্যসংলাপকে স্পর্শ করেছে ["বিধুমুখী তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো।"] তার লাম্পট্য-বৃত্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ কাব্যরসের যোগ ঘটিয়ে মধুসূদন তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আরও বেশি তীব্র করে তুলেছেন। এর সঙ্গে উপমায় কিছু নকল বীররসের সঞ্চার হওয়ায় চরিত্রটির হাস্যকরতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। [এক। "এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্যেম না হে! সসাগরা পৃথিবী জয় করে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হলেন?" দুই। "ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন, —আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ করতে পারব না?"]

ভক্তপ্রসাদের সংলাপে চরম অসৎ কর্মের সঙ্গে হরিবোল ধ্বনি, একটা মোলায়েম ভাবের অন্তরে সর্বনাশসাধনের বাসনা, সাদা ভাষার সঙ্গে আলঙ্কারিকতা এবং কদর্য মনোভাবজাত কবিত্বের খুব একটা আকর্ষণীয় বিশিষ্টতা সৃষ্টি করেছে।

নাট্যসমাপ্তিতে তার চরিত্রের পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা আদৌ সম্ভব কিনা এরূপ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনটি আসল কথা নয়, ভক্তপ্রসাদের ভণ্ডামি নষ্টামির মুখোশ আজ খুলে গিয়েছে, দিনের আলোয় সে ভীতিবিহ্বল এটাই বড় কথা।

হানিফ গাজীর চরিত্রে প্রচণ্ড শক্তি এবং এই শক্তিজাত অশৈর্য্য তথা বাস্তব কৌশলের বোধ এ দুই প্রবৃত্তি মিলেছে। তাকে সোজা সাদা স্বল্প বুদ্ধি ভাল মানুষ করে মধুসূদন সৃষ্টি করেন নি। তার গায়ে যমদূতের মত জোর যেমন আছে, উপস্থিত বুদ্ধিরও বড় অভাব সেই। জমিদারের প্রাপ্ত কিছু অংশ কোঁচড়ে লুকিয়ে দারিদ্র্য নিয়ে মায়াকান্না কেঁদেছে। এবং কায়দায় ফেলে ভক্তপ্রসাদের কাছ থেকে মোটা রকম আদায়ের ফন্দীও সে এঁটেছে। আর সেই ফন্দীতে তার স্ত্রী ফতেমাকেই টোপরূপে ফেলতে হয়েছে। ভক্তপ্রসাদ ধরা পড়ে যাবার পরে তার ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করায় হানিফের এই ফন্দীবাজ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু মধুসূদনের মানবচিত্তের গভীরতম প্রান্ত পর্যন্ত উপলব্ধি করার মত চোখ ছিল। ফতেমার অপমানে নিজের পৌরুষের অপমান তার।

ফাঁদ পেতেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। ভাঙা শিবমন্দিরে, ঘটনাস্থলে এসে সে কৌশলের সূক্ষ্মতাকে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে। একটা শক্তিমত্ত উদ্দাম পৌরুষ স্ত্রীর সম্ভাব্য অসম্মানে যেন গর্জন করে উঠেছে। ["বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ্ করে বসে থাকিস। হানি। ঠাহুর তা তো থাকপো, লেকিন আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্যি যায়, তা হলি তো আমি তখনই সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো।"] কিছু দিন পরে হানিফের আদর্শে দীনবন্ধু তোরাপের চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। তোরাপ রচনায় সাফল্য থাকলেও হানিফের জটিলতা সেখানে অনুপস্থিত।

মধুসূদনের বাচস্পতিও বাস্তব পৃথিবীর মানুষ। যে জমিদার তার ব্রহ্মত্র দখল করে নিয়েছে সুযোগ পেয়ে তার উপর প্রতিশোধ নিতে সে দ্বিধা করে নি। কিছু অর্থাগমেরও ব্যবস্থা করেছে। তবে হানিফের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য। এতখানি প্রাণকে বুদ্ধির ও কৌশলের দেয়ালে এঁটে রাখা কঠিন। বাচস্পতি মূলত বুদ্ধিরই ভরসা করেছে।

গদা চরিত্রটি ক্ষুদ্র কিন্তু জীবন্ত। তার মনিবের নাড়ীনক্ষত্র কিছুই তার

অজানা নেই। মনিবের চরিত্রের অন্ধিসন্ধি জানে বলেই সেই পথে দু পয়সা করে খাবার সুযোগ সে পুরোদস্তুর কাজে লাগায়। কিন্তু তার চরিত্রে আরও একটু বিশিষ্টতা আছে। কর্তার কামব্যাধির লক্ষণগুলো সে মনে মনে উপভোগ করে। তার কবিতা আবৃত্তি, ঘন ঘন মালাজপা, তাজ দিয়ে টিকি ঢাকা, নব কার্তিক সেজে অভিসারে চলা, মুসলমান বাবুর্চির নিন্দা করে মুসলমানীর দেহভোগের ব্যবস্থা—যাবতীয় অসঙ্গতি—সে লক্ষ্য করে। তার স্বগত সংলাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্যে এই অসঙ্গতির উপরে তীব্র কটাক্ষপাত করা হয়েছে। তবে সে কোন ছদ্মবেশী নীতিপ্রচারক নয়। বুড়ো কর্তার চরিত্রের অসঙ্গতি তার কাছে নীরব হাস্যের সামগ্রী; কিন্তু মনে মনে বোধ হয় ঐরূপ জীবনের স্বপ্নই সে দেখে। কর্তার গদীতে শুয়ে তামাক খাওয়ায় কি তার চকিত পরিচয় নেই?

ফতেমার চরিত্রে কিছু চাতুর্য আছে। সাহসেরও অভাব নেই। সে অসৎ নয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে লম্পট জমিদারকে ভুলিয়ে দেহ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা কুলবধূর পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়। ফতেমা সাহসে ও বুদ্ধিতে একেবারে মামুলি নয়। কিন্তু মধুসূদন জানতেন স্বাভাবিকতার সীমারেখা খুব কাছেই। যতই তার সাহস হোক, ভাঙা শিবমন্দিরে অন্ধকারে লম্পটের আগমনে তার আত্মরক্ষা ও সম্মানরক্ষার আকুলতা তাই তিনি যেন তীব্রভাবেই উপস্থিত করেছেন। ফতেমার শেষ কথাগুলিতে সাহস নেই, এ যেন আর্তনাদ। ["পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।" "না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদমি আসে এখনি মোকে খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই।"]। কিন্তু হানিফের আগমনে তার সাহস বেড়ে গিয়েছে, ভক্তপ্রসাদকে সে তখন তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করতে ছাড়ে নি। ["কেন, কত্তাবাবু! নাড়্যের মায়ে কি এখনে আর পছন্দ হচ্যে না? এই মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম, আরও কি কি হচ্ছেলাম আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও?"]

পুঁটি কুট্টনীর চরিত্রটি সরল কিন্তু জীবন্ত। ভক্তপ্রসাদের জন্য কুলবধূ ও কুমারী মেয়েদের ঘর ভেঙে আনাই তার কাজ। কর্তার কাছ থেকে এর জন্য সে যে পারিতোষিক পায় তার চেয়েও কিছু বেশি যোগাড়ের চেষ্টা করে লাঞ্ছিতা মেয়েটির টাকার অংশ কেটে রেখে। এর উপরে যৌবন চলে যাওয়ায় ভক্তপ্রসাদের মত লম্পটদের ভোগরাজ্যের অংশীদারী থেকে বঞ্চিত হয়েছে

বলে একটু দুঃখের ভাব ["ফতে। তুই নৈলে থাক ভাই, মুই আর রতি পারবো না। পুঁটি। (ফতের হস্ত ধরিয়া) আ মর্ ছুঁড়ি। আমি থাকলে কি হবে? (স্বগত) হায় আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হলো আর তাকে কে খেতে চায়?"] তাকে বিশিষ্ট বর্ণে মণ্ডিত করেছে।

স্বল্প কয়েকটি প্রাণবন্ত চরিত্র এবং সার্থক জীবন্ত সংলাপ বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁর পূর্ণাঙ্গ কাহিনীটিকে প্রচলিত প্রহসনের সামান্যতার বহু ঊর্ধ্বে স্থাপিত করেছে।

১"Farce may be defined as exaggerated comedy; its problem is unlikely and absurd, its action ludicrous and one-sided, its manner entirely laughable." [—Norwood : Greek comedy.] "The main characteristics of farce···are the dependence in it of character and dialogue upon mere situation. This situation, moreover, is of the most exaggerated and impossible kind, depending upon the coarsest and rudest of improbable incongruities." [—Nicoll : Dramatic Theory.]

২Moliere তাঁর একটি নাটকে বলেছেন কমেডির উদ্দেশ্য হল "to enter rightly into the ridiculous aspects of mankind and to represent people's defects agreeably on the stage."

২Moliere তাঁর একটি নাটকে বলেছেন কমেডির উদ্দেশ্য হল "to enter rightly into the ridiculous aspects of mankind and to represent people's defects agreeably on the stage."

৩.. "আমি The Disguise ও Love is the best doctor নামে দুইখানা ইংরেজী নাটক বাংলাতে অনুবাদ করি। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, এ দেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—অনুকরণ ও হাসিতামাশা বেশি পছন্দ করে।

সেইজন্য আমি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুইখানি নাটকই নির্বাচন করিয়াছিলাম।"

—[লেবেডফের হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের ভূমিকা]

[৪]য়ুরোপীয় রুচিতে দীক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের হাস্যরস কি রূপ ধরে দেখা দিয়েছিল নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে তার প্রমাণ মিলবে, "সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এ রসের (অর্থাৎ হাস্যরসের) বিশেষ স্থান নাই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকদের রসালাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্যরসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা।" —(প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড)

[৫]এই প্রহসনের একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২২ সালে। অনুবাদকের নাম অজ্ঞাত।

[৬]কুলীন-কুল-সর্বস্বের 'বিজ্ঞাপনে' রামনারায়ণ লিখেছেন, "এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত, প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহার-সূচক রহস্যজনক প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনী-গণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীব দোষোদ্‌ঘোষণা। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ পবিবেদন। ষষ্ঠে,বিবাহ নির্বাহ।"

[৭]মধুসূদনের পত্রাবলীর কোথাও কিন্তু নাটক প্রসঙ্গে গ্রীক ট্রাজেডি লেখক এস্কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস বা কমেডি লেখক এরিস্টোফেনিসের নামের উল্লেখ নেই।

[৮]As for Comedy, it is an imitation of men worse than the average ; worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous, which is a species of the Ugly. The Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others. ..." —(Aristotle : Poetics)

[৯]Encyclopaedia of Literature. Vol. I. (Ed. by Steinberg)

[১০]পঞ্চম অধ্যায়ে কৃষ্ণকুমারী নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে এবিষয়ে মন্তব্য করেছি।

[১১]প্রমথ চৌধুরী 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ডে 'ভারতচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদি রস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন।"

[১২]ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর একটি প্রবন্ধে এবং প্রমথনাথ বিশী তাঁর সম্পাদিত "মধুসূদনের রচনা সম্ভার' গ্রন্থের ভূমিকায় এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

[১৩]আমার "মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প" দ্রষ্টব্য।

[১৪]Theodore Watts Dunton "Encylopaedia Britanica"-র "Poetry" নামক প্রবন্ধে কাব্য সাহিত্যে Relative Vision এবং Absolute Vision বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

[১৫]"His farces, however, are good. One of them, entitled 'Is this Civilazation ?' is the best in the language." —(Bankim Chandra Chatterjee. The Calcutta Review, April 1871)

"আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই সর্বোৎকৃষ্ট" (—রামগতি ন্যায়রত্ন-বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)। "বহুদিন পর্যন্ত ইহা এই শ্রেণীব প্রহসনের আদর্শ হইয়া থাকিবে।" —(যোগীন্দ্রনাথ বসু: মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত।)

[১৬]"তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য।" (—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: সাবিত্রী লাইব্রেরীতে বক্তৃতা।) "কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ রচনায় এ দুখানিকে ত্রুটিহীন বলিলেই চলে।"—(প্রমথনাথ বিশী: মাইকেল রচনাসম্ভারের ভূমিকা।)

[১৭]"It is a farce with a purpose, being intended chiefly to ridicule and expose the vice of drunkenness and other evils by which it is generally intended" —(Bankim Chandra: The Calcutta Review, 1871) যোগীন্দ্রনাথ বসুও রচনাটিকে মদ্যাসক্তির বিরুদ্ধতামূলক রচনা বলে অভিহিত করেছেন।

[১৮]ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এ প্রহসনের সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখাতে চেয়েছেন নব্য বঙ্গের একটা শ্রেণীর আচার আচরণের সমগ্রতাই রচয়িতার লক্ষ্য ছিল। "ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদ্‌ঘোষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎ সমুদায়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।

—[বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা]

[১৯]মদ্যাসক্তি কিরূপে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে প্রভাব বিস্তার করল

শিবনাথ শাস্ত্রী তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন "সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রমপূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

—[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ]।

[২০]যদিও রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে সেকালীন নব্যশিক্ষিত তরুণ শ্রেণীর মধ্যে বেশ্যানুরক্তির আপেক্ষিক স্বল্পতার কথা বলেছেন। কিন্তু সমকালীন অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে স্পষ্টই বোঝা যায় এই পর্যবেক্ষণ যথার্থ নয়।

[২১]বিনয় ঘোষ লিখিত "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'সমাজ জীবনের খরস্রোত' নামক অধ্যায়ে সমকালীন বাংলাদেশের নগর জীবনের নানাধরণের বিকৃতির তথ্যপূর্ণ বিবরণ আছে।

[২২]"কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী"-তে আমি এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

[২৩]গৌরদাস বসাক তাঁর মধুসূদন সম্পর্কিত স্মৃতিকথায় একথা জোর দিয়ে বলেছেন।

[২৪]সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের "মধুসূদন—কবি ও নাট্যকার" দ্রষ্টব্য।

[২৫]রামগতি ন্যায়রত্ন বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁর নিন্দা করে লিখেছিলেন "গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্মে রত হইলেও জাতিভ্রংশকর যবনী সংযোগে কখনই ওরূপ ব্যগ্র হন না। এ নিন্দা যুক্তির বা প্রমাণের নয়; স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রতি রক্ষণশীলতার। একে তাই গ্রহণ করা চলে না।

[২৬]নিলিমা ইব্রাহিম: "বাংলার কবি মধুসূদন (ঢাকা থেকে প্রকাশিত)"

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষ্ণকুমারী

মুক্তির উল্লাস,
হাহাকার ও সাফল্য

॥ এক ॥

কৃষ্ণকুমারী নাটক মাত্র একমাসের মধ্যে (৬ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর) রচিত হয়েছিল। এই সময়ে মধুসূদন তাঁর সর্বোত্তম গ্রন্থ মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছিলেন। কবির সৃজনক্ষমতা তখন উৎকর্ষের শীর্ষে এবং মানসিক ভারসাম্য সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত।[১] বলা যেতে পারে কৃষ্ণকুমারী নাটক মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের স্বর্ণপর্বে লেখা। কৃষ্ণকুমারীর আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে কবির মনের সমকালীন অবস্থাটি বুঝে নেওয়া দরকার।

এক। ১৮৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি শর্মিষ্ঠা লেখেন। বাংলা সাহিত্যে এই তাঁর হাতেখড়ি। কৃষ্ণকুমারী ১৮৬০ সালে রচিত হয়। মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশে ধূমকেতুর দ্রুতগতি ছিল।[২] এই দুই বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। এই সময়ে তিনি বিষয় ও রীতিতে বিচিত্র পথে পদচারণা করেছেন এবং নিজের যথার্থ ভূমিখণ্ডে ঠিকভাবে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এই সাহিত্যসাধনা প্রধানত দ্বিমুখী। কাব্য-সৃষ্টির ধারা এবং নাট্যসৃষ্টির ধারা। কৃষ্ণকুমারী নাট্যরচনা হলেও বিচ্ছিন্ন ভাবে শুধুমাত্র কবির নাট্যধারায় রেখে এর বিচার করা চলে না। তাঁর কাব্য এবং নাটক একই মনের সৃষ্টি। বিশেষত এই দুটিই সাহিত্যকর্ম, সেদিক থেকেও কিছু মূলগত মিল এদের মধ্যে আছে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত মধুসূদন যে সব কাব্য ও নাটক লিখেছিলেন তাদের সংখ্যা যেমন নগণ্য নয়, তেমনি বিষয় ও আঙ্গিকে বিচিত্র সাধনাও সেখানে লক্ষ্য করবার মত। দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক (শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী), দুটি প্রহসন (একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ), দুটি কাব্য (তিলোত্তমাসম্ভব ও ব্রজাঙ্গনা) এই কালসীমার মধ্যে রচিত। কাব্য দুটি রচনার মধ্য দিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে যেমন দক্ষতা অর্জিত হয়, মিত্রাক্ষরেও নানা ধরনের স্তবকবন্ধন ও অন্ত্যানুপ্রাসে বিস্ময়কর নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়।[৩] বাংলা ভাষার উপরে যেমন তাঁর দখল আসে, তেমনি ভাষায় শব্দচিত্র নির্মাণ এবং কল্পনাকে যথাযথ রূপদানও কবিক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হয়।

বিশেষ করে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে তিনি অক্লান্ত ভাবে নূতনের অনুসরণ করেছেন। মহাভারতের কাহিনী, গ্রীকপুরাণের গল্প বা সমকালীন সমাজসত্যকে নাট্যভাত করবার চেষ্টা করেছেন। সাফল্যের পরিমাণ সর্বত্র সমান না হলেও রোমান্টিক প্রণয়নাট্য, ব্যঙ্গতীব্র ও রঙ্গোজ্জ্বল কৌতুক নাট্য দুদিকেই তিনি কলম চালিয়েছেন। নাট্যগুণের দিক থেকেও কৃষ্ণকুমারীতে হাত দেবার আগে তিনি নানা বাধা অতিক্রম করেছেন,—শর্মিষ্ঠায় নিশ্ছিদ্রপ্রায় সংস্কৃতানুগত্য, পদ্মাবতীতে গ্রীক গল্পের মধ্য দিয়ে পথ খোঁজা। প্রহসনে সংস্কৃতানুকারিতার অবসান ঘটেছে। পশ্চিমী নাট্যাদর্শে তিনি নিশ্চিত দীক্ষালাভ করলেন লঘুরস কমেডিতে। বিবৃতি, বর্ণনা ও প্রত্যক্ষ ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া, সংঘাতকে মূল্য না দেওয়া থেকে দ্বন্দ্বসঙ্কুল, ঘটনা তরঙ্গিত নাট্যরস সৃজনের দিকে ক্রমাগ্রগতি প্রহসন দুটিতে এসে যথার্থ সাফল্যলাভ করল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব কয়টি স্তর অতিক্রম করার পরে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনায় হাত দিলেন। কৃষ্ণকুমারী সব দিক থেকেই পরিণত রচনা, বিচ্যুতি যা আছে তাও অপরিণতিজনিত নয়।

দুই। কৃষ্ণকুমারী নাটক মধুসূদনের বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেরণাজাত সৃষ্টি। শর্মিষ্ঠায় তাঁর লক্ষ্য ছিল খ্যাতি অর্জন, সাহিত্যজগতে প্রবেশ করে স্বীকৃতি লাভ। একটা জয়ের মনোভাব এর পেছনে সক্রিয় ছিল। এবং সে জয়বাঞ্ছা তিলোত্তমা কাব্যের মত ততখানি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে নয় যতটা প্রথানুগ পথে তার দেহসংস্কার ঘটিয়ে। পদ্মাবতীতেও চলেছে হাত পাকাবার চেষ্টা। শর্মিষ্ঠায় লব্ধ সুখ্যাতির জয়পতাকাকে উঁচু করে ধরে রাখা। প্রহসন দুটির সৃষ্টিপ্রেরণা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক। কিন্তু এখানেও সমাজের ব্যাধির কেন্দ্রে হাস্যের আঘাত করে কিছু সংস্কার সাধনের বাসনা থাকা অসম্ভব নয়। তাছাড়া প্রহসন দুটির সাফল্য যত উঁচু পর্যায়ের হোক না কেন প্রহসনের লঘুতা তাঁর কবিপ্রতিভার প্রকৃত ভূমি নয়, ক্ষণিক অবস্থানমাত্র। কৃষ্ণকুমারী রচনার সময়ে তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, নাট্যকার হিসেবেও। তাছাড়া মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় তিনি তখন হাত দিয়েছেন এবং সে কাব্য এমন হবে—

গৌড়জন যাহে—
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

প্রতিভার দীপ্ত মধ্যাহ্নে কাব্যজগতের সঙ্গীতের আস্বাদ লাভ করবার

পরে এই একটিমাত্র নাটক তিনি লিখতে চাইলেন। অপর নাটক ও প্রহসনগুলির সঙ্গে এখানে একটি গুরুতর পার্থক্য আছে। কাব্যসৃষ্টিও তাঁর সাহিত্য-সাধনার তৃষ্ণা সম্পূর্ণত মেটাতে পারল না। কৃষ্ণকুমারী লিখে তিনি সেই তৃষ্ণা মেটাতে চাইলেন। শর্মিষ্ঠার মত ইতিহাস বিজয়ের বাসনায় নয়, কারণ তা আগেই করায়ত্ত, পদ্মাবতীর মত বিদেশী গল্পের নবীনতায় পাঠক-দর্শককে চমকে দেবার ইচ্ছায় নয় মায়াকাননের মত অর্থার্জনের তাগিদে নয়, অনেকখানি বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির বাসনায় কৃষ্ণকুমারী রচিত। মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেও যে অতৃপ্তি তাঁকে পীড়িত করছিল তার তাড়না এর সৃষ্টির পেছনে ছিল। সেটুকুই মধুসূদনের মধ্যেকার নাটকীয় প্রতিভা। নাটকীয় প্রতিভা হিসেবে তা প্রথম শ্রেণীর না হতে পারে, কিন্তু সে যে কবিপ্রতিভা থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র তাতে সন্দেহ নেই। না হলে মেঘনাদবধ লিখতে লিখতে কৃষ্ণকুমারীর এ আয়োজন কেন ?

কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করতে হয় যে বিশুদ্ধ প্রেরণাকে কৃষ্ণকুমারীতে বাহিরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। তিনি প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি নাট্যকাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। দুটি অঙ্ক লেখা হয়ে গিয়েছিল।[৪] কিন্তু তা অভিনয়ের কিছুমাত্র উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হয়। তারপরে তিনি 'রিজিয়া' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডির সংক্ষিপ্তসার বেলগাছিয়া মঞ্চের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান।[৫] ইসলামী বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁরা অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সে নাট্যরচনাও আর এগোয় না। কবি তখন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীটি নির্বাচন করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাকে পূর্ণ রূপ দেবার পক্ষে বাধা ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় এই নাটকটির সংলাপ লিখবার ইচ্ছা কবির ছিল। অন্তত স্বগত-সংলাপগুলি অমিত্রাক্ষরে লিখবার অনুমতি তিনি রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষের কাছে চেয়েছিলেন "Blank verse in soliloquies ? What say you ?" কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে হতাশ হতে হয়। তা ছাড়া কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় ব্যাপারে তিনি সর্বদাই একটা উৎকণ্ঠা অনুভব করেন, কখনও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। অভিনয়ের প্রয়োজনে কেশব গাঙ্গুলি এবং যতীন্দ্র ঠাকুরের দ্বারা নাটকটির সামান্য সংশোধন করাবার ব্যাপারেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

"However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that

would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer !"

সাহিত্য বিষয়ে মধুসূদনের এরূপ আত্মসমর্পণ যেন ভাবা যায় না। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এই সম্পর্ক, অভিনয়ের অনিশ্চয়তা, দর্শকরুচি ও রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের নাট্যবোধের মানের তুলনামূলক রক্ষণশীলতা এমন কি কৃষ্ণকুমারীর সৃষ্টিউৎসকেও সম্পূর্ণ মুক্ত ও সাহিত্যিক বিশুদ্ধি দিতে পারে নি। বাহিরের ব্যাপারের কাছে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতাকে কিছু পরিমাণ অনুগত করেছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে নি। তার প্রেরণামূলের সাহিত্যিক বিশুদ্ধি তাই কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় নি।

তিন। কৃষ্ণকুমারী নাটক নিয়ে চিঠিপত্রে কবি যতটা আলোচনা করেছেন এমন আর কোন নাটক সম্পর্কে করেন নি। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা অনেকগুলি চিঠিতে তিনি এই নাটকের বিষয়বস্তু, রসপ্রেরণা, চরিত্র-ভিত্তি এবং ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকগুলি চিঠিতে এর অভিনয়-সম্ভাবনা প্রসঙ্গেও নানা কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা চিঠিগুলিতেও মেঘনাদবধ সম্পর্কিত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণকুমারী নাটকের উল্লেখ আছে; তবে তা উল্লেখমাত্র।[৬] এই চিঠিগুলি মধুসূদনের নাট্যবোধের গভীরতার পরিচয় দেয় সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর সুষ্ঠ সমালোচনার বীজও যেন এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

॥ দুই ॥

মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর প্রসঙ্গে পত্রালাপের সময়ে য়ুরোপীয় নাটক এবং ভারতীয় অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকের রসাবেদনের পার্থক্য সম্পর্কে কয়েকটা মূল্যবান কথা বলেছেন। এদেশীয় নাটককে অতিমাত্রায় রোমান্টিক এবং কাব্যধর্মী বলে তিনি অভিহিত করেছেন। জীবনের রূঢ় বাস্তবের সংঘর্ষ ও বিচিত্র প্রবৃত্তির তরঙ্গকে য়ুরোপীয় নাটকের প্রাণ বলে তিনি মত দিয়েছেন। তিনি শর্মিষ্ঠায় ভারতীয় রীতির কাব্যধর্মী নাট্যাদর্শ অনুসরণ করেছেন। এবং কৃষ্ণকুমারীতে তিনি নাট্যলোকেই অধিষ্ঠিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

"In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry; if I find her before me I shall not drive her

away ; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth mere poetry."

য়ুরোপীয় নাট্যাদর্শের অনুসরণে তিনি "Stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment"-কে আমন্ত্রণ জানালেন বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই কৃষ্ণকুমারীতেই। মধুসূদন কাব্য ও নাটকের য়ুরোপীয় রীতি ও রসাবেদনে চিরকালই বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে নাট্যরচনায় দীর্ঘকাল তাঁকে ভারতীয় রীতির অনুগত থাকতে হয়েছে। প্রহসন দুটিতে তিনি য়ুরোপীয় কমেডির অনুসরণ করেছেন, সংস্কৃত নাটকের প্রতি আর শ্রদ্ধা দেখান নি। সিরিয়াস নাটকে কৃষ্ণকুমারীতে য়ুরোপীয় নাট্যধর্ম নিঃসংশয়ে জয়যুক্ত হয়েছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে লঘু রচনায় মধুসূদনের প্রহসন দুটি প্রথম য়ুরোপীয় নাট্যাদর্শকে বরণ করেছিল, সিরিয়াস নাটকের মধ্যে কৃষ্ণকুমারী সর্বপ্রথম পুরাতন দেশীয় প্রথাকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে বর্জন করল।

কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গে চিঠি লিখতে গিয়ে তিনি একাধিকবার সেক্‌সপীয়রের কথা বলেছেন। শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীতে কালিদাস তাঁর আদর্শ ছিলেন। এই নাটকে তিনি সেক্‌সপীয়রকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন। য়ুরোপীয় ও সংস্কৃত নাটকের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সেক্‌সপীয়রকে পাশ্চাত্ত্য রীতির মুখপাত্র রূপে দাঁড় করিয়েছেন।[৭] নাটকের ভাষা প্রসঙ্গে ডক্টর জনসনের উপদেশের উল্লেখ করে পরে লিখেছেন—

"And he commends Shakespeare for having adopted this language, and this advice I mean to adopt…"

গম্ভীর ও লঘুরসের মিশ্রণ বিষয়েও তিনি সেক্‌সপীয়রের উদাহরণ দিয়েছেন,

"…never strive to be comic in a tragedy, but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have au agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is studiously comic."

তাছাড়া সেক্‌সপীয়রের নাটকাবলী উৎকর্ষের যে কাম্যস্বর্গে স্থাপিত তার প্রতিও বারবার ইঙ্গিত করেছেন কবি—

১। "I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often."

২। "The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible; such an aesthetic storm would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare; and he would suffer considerable damage!"

নাট্যসাফল্যে সেক্‌সপীয়বের স্তরে পৌছবার ক্ষমতা যে তাঁর নেই, কবি সে বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ।

ফরাসী নাটকের গঠনকৌশল প্রসঙ্গেও একটি মন্তব্য তাঁর চিঠিতে আছে।

"I am very fond of busy and varied scenes; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it. ..."

কর্মব্যস্ত দৃশ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কৃষ্ণকুমারীতে প্রকট হয়েছে, প্রহসনগুলিতেও তা অপ্রকাশ থাকে নি, কিন্তু শর্মিষ্ঠায় অধিকাংশ দৃশ্যই কর্মবিরল, পদ্মাবতীতেও কর্মব্যস্ততা বেশি নেই। পাশ্চাত্ত্য রীতির নাটকের প্রভাব এখানেও বর্তেছে। ফরাসী পদ্ধতিটি পরিহার করে মধুসূদন এই কর্মমুখরতা বৃদ্ধি করতেই চেয়েছেন।

এরিস্টটলের নির্দেশ থেকে য়ুরোপীয় নাটকে স্থান ও কালগত ঐক্যের আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখান হচ্ছে। অবশ্য সেক্‌সপীয়রাদির নাটকে এই ক্লাসিক ঐক্যের ধারণাটিকে অনেকখানি শিথিল করে ফেলা হয়েছে। মধুসূদন শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং কৃষ্ণকুমারীতে প্রতি অঙ্কে স্থানগত ঐক্য বজায় রাখতে চেয়েছেন।[৮] প্রহসন দুটিতে আশ্চর্য সংহতির সঙ্গে কালগত ঐক্যও রক্ষিত হয়েছে। য়ুরোপীয় রীতির এই প্রয়োগ কৃষ্ণকুমারীতে কিছু নূতন নয়। সংস্কৃত প্রভাবের পরিমণ্ডলেও প্রথম থেকেই এটুকু পশ্চিমী রীতিকে তিনি স্থান দিয়ে এসেছেন।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির নিঃসন্দিগ্ধ জয় ঘোষিত হয়েছে। এই নাটক প্রাণধর্মের দিক থেকেই সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা নাট্যজগৎ থেকে স্বতন্ত্র।

প্রথমত, কৃষ্ণকুমারী নাটকের গতি মন্থর নয়। সংস্কৃত নাটকের মত বর্ণনার আধিক্য, অকারণ কবিত্ব, দীর্ঘ বক্তৃতা, পরোক্ষ বিবৃতি দিয়ে এর দেহ নির্মিত নয়। এর পটভূমিতে রাজ্য ভাঙাগড়ার কলরব, এর অন্তরে শাঠ্য, চাতুর্য, অর্থলোভ, কামবাসনা, অর্ধস্ফুট স্নিগ্ধ প্রেম, নিত্য শঙ্কাতুর বাৎসল্য, দুর্বল নৃপতির বেদনা প্রভৃতি বিচিত্র প্রবৃত্তির তরঙ্গ প্রবল বেগে আলোড়িত। পরে নাট্য-গঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে যুরোপীয় নাট্যলক্ষণের এই মুখ্য সূত্রগুলি কিভাবে কৃষ্ণকুমারীকে আগের নাটকগুলি থেকে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে তা দেখব।[৯]

দ্বিতীয়ত, ট্রাজেডি বস্তুটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্মকালেই আবির্ভূত হয়েছে। ১৮৫২ সালে রচিত 'কীর্তিবিলাস' একটি বিয়োগবিধুর নাটক। সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এ নাটক রচিত। নাটকের ভূমিকায় লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তা বিস্তৃতভাবে বলেছেন। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চে ট্রাজেডি যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করে নি। ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৬১ সালে কৃষ্ণকুমারীর প্রকাশকাল পর্যন্ত উল্লেখ্য ট্রাজেডির সংখ্যা মাত্র চারখানি। কীর্তিবিলাস, উমেশমিত্রের বিধবাবিবাহ, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ এবং কৃষ্ণকুমারী। এর মধ্যে কীর্তিবিলাসের লেখক ট্রাজেডি লিখতে চেয়েছেন —চাওয়াটুকুতেই এর মূল্য। উমেশ মিত্রের বিধবাবিবাহে বেদনারস কতকটা রূপলাভ করেছে। কিন্তু প্রকৃত ট্রাজেডির সর্বনাশা হাহাকার থেকে তার দূরত্ব অনেক। নীলদর্পণের অন্য নানাবিধ নাট্যগুণ থাকলেও ট্রাজেডি হিসেবে এটি যে ব্যর্থ তাতে সন্দেহ নেই।[১০] বাংলা নাট্যসাহিত্যে কৃষ্ণকুমারীই প্রথম সার্থক ট্রাজেডি। প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির মহিমা এর নেই। কিন্তু বাংলা মঞ্চানুগ নাটকে উচ্চতর গুণের ট্রাজেডি আর কেউ লেখেন নি। আসলে ট্রাজেডির বাইরের দিকটির অনুসরণ করা সহজ। দুএকটি মৃত্যু, হত্যা প্রভৃতির দ্বারা করুণরস সৃজন একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু সুতীব্র বেদনার দাহে ব্যক্তি-আত্মার আকাশস্পর্শী হাহাকার সৃষ্টির সার্থকতা সম্পর্কে যখন প্রশ্ন তোলে তখনই যথার্থ ট্রাজেডির রসাস্বাদ ঘটে। যুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের নাট্যধারায় দুএকটি ট্রাজেডি লেখা শুরু হল। কিন্তু গ্রীক ও ইংরেজী সাহিত্যের মর্মস্থল থেকে এর প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধারে সমর্থ হলেন মধুসূদনই।

তৃতীয়ত, চরিত্রসৃষ্টি বিষয়ে য়ুরোপীয় আদর্শের প্রতি আসক্তি প্রথম দেখাতে পারলেন মধুসূদনই। চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমাদের সাহিত্যে পূর্বকালে যথেষ্ট মর্যাদা পায় নি। নব্য মানবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ তথা য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাটকে ব্যক্তি-মানুষকে রাজাসন দিল। ধীর-ললিত, ধীরোদাত্ত প্রভৃতি সাধারণ পরিচয়ে তাদের আর ধরে রাখা গেল না। তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের বিশেষ মুখাবয়ব নিয়ে অপরের:থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়াল, আপনার একক সত্তা ঘোষণা করল।

সংস্কৃত নাটকের বিদূষক শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীতে তার সুনির্দিষ্ট রসিকতার ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত থেকেছে। ধনদাসের মত ব্যক্তি তার স্থান দখল করল। তার শাঠ্য ও কর্মচাঞ্চল্য এবং নাট্যঘটনায় তার সক্রিয় ভূমিকা ভাঁড় থেকে তাকে ভিলেনে রূপান্তর করল। ইংরেজী নাটকের আদর্শ এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কবির মনকে আদর্শ যুগিয়েছে।

নারী চরিত্রগুলি, বিশেষ করে মদনিকার চাতুর্যপূর্ণ কর্মতৎপরতার কথা সংস্কৃত নাটকের পাঠক-দর্শক ভাবতেও পারে না। নারীচরিত্র বিষয়ে এদেশীয় লেখকদের যে কি পরিমাণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয় কবি কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গে এক চিঠিতে তা লিখেছিলেন।—

> "And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, 'Indian Bards', labour under, with reference to Female characters.—The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step."

এই বাধা আছে। কিন্তু নারীচরিত্র কল্পনায় প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম ঘটানোয় পাশ্চাত্ত্য আদর্শ তাঁকে সাহায্য করেছে।

এর মানে অবশ্য এ নয় যে মধুসূদনের সৃষ্ট চরিত্রগুলির বাঙালিত্ব বিনষ্ট হয়েছে। তাদের দেশকালপরিচ্ছিন্ন রূপে সন্দেহ জাগতে দেন নি কবি, কিন্তু য়ুরোপীয় মানবধর্মকে সহজভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

চতুর্থত, নাট্য সংলাপেও য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। সংস্কৃতানুগ

দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর মুখ চাহিয়াছিলেন; নিষ্ঠুর বিধাতা তাহাতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিল।...জয়পুর রাজের সহিত কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং সেই শুভ সম্বন্ধকে বন্ধন করিবার জন্য জয়পুর হইতে সেনাদল উদয়পুরে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি লইয়া সেই সেনাদল গঠিত হয়। তাহারা রাজধানীর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়াছিল; রাণা তৎসমুদায় উপহার গ্রহণ করিয়া প্রত্যুপহার পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মারবাররাজ মানসিংহ কর্তৃক সে সম্বন্ধ বন্ধনে অচিরে ঘোরতর প্রতিরোধ স্থাপিত হইল। জগৎসিংহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য মহারাজ মানসিংহ একবারে তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহারও আন্তরিক অভিলাষ যে তিনি কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। আপনার পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজকুমারী কৃষ্ণার সহিত মারবারের মৃত রাজার সম্বন্ধ হইয়াছিল, তবে তিনি মারবারের বর্তমান নৃপতির হাতে কেননা সমর্পিত হইবেন?... পরিশেষে তিনি ভয় দেখাইয়া বলিয়া দিলেন, "যদি রাণা আমার অভিলাষ পূরণ না করিয়া অম্বরের জগৎসিংহের করে আপন কন্যাকে অর্পণ করেন, তাহা হইলে সে বিবাহ কিছুতেই সমাপন করিতে দিব না; আমার যতদুর ক্ষমতা তদ্বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্থাপন করিতে ত্রুটি করিব না।'... কৃষ্ণার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া মারবাররাজ মানসিংহ অম্বররাজের বিরুদ্ধে সদলে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে যে এক ভীষণ অনর্থ সম্ভূত হইল, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু এ অনর্থ শীঘ্র অপনীত হইল না; ক্রুরচরিত্র মার্হাট্টা দস্যুগণও স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বীগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত অনর্থরাশি শতগুণে বাড়াইয়া দিল। সিন্ধিয়া ইতিপূর্বে জয়পুর রাজের নিকট কিছু অর্থানুকূল্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু জগৎসিংহ তাঁহার যাচ্ঞা পূরণ না করাতে তিনি তৎপ্রতিকূলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং যাহাতে অম্বররাজ কৃষ্ণকুমারীকে পাইতে না পারেন, তাহা সাধন করিবার জন্য মারবারপতি মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মানসিংহের সহায়তায় বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি শীঘ্র জয়পুরের সৈন্যদিগকে মিবার হইতে বিদায় করিয়া দেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, রাণা তাঁহার অনুরোধ কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু সে বিশ্বাস আজি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। রাণা তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। অনন্তর সিন্ধিয়া রাজার প্রতি

সাতিশয় রুষ্ট হইয়া তাহাকে শাস্তি দান করিবার জন্য আপনার গোলন্দাজ সেনাদলকে মিবারবিরুদ্ধে চালিত করিলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজা জগৎসিংহের সেনাদল লইয়া রাণা আরাবল্লীর প্রবেশ-পথে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই স্থলে উভয় দলে কিয়ৎকাল ধরিয়া যুদ্ধ হইল। কিন্তু অবশেষে দুর্ভাগা ভীমসিংহই পরাজিত হইলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য সদলে নগরমধ্যে পলাইয়া আসিলেন। বিজয়ী সিন্ধিয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ পূর্বক আটসহস্র সৈন্য লইয়া উদয়পুরের উপত্যকা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাজধানীর কিঞ্চিৎ দূরেই সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া অবস্থিত রহিলেন। রাণা ভীমসিংহ বিষম বিপদে পতিত হইলেন। কি প্রকারে যে, সেই বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে স্থিরচিত্তে আপন সর্দারগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানা তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে স্থির হইল যে, জয়পুররাজ জগৎসিংহের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তদনন্তর তিনি জয়পুরের সেনাদলকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং উপায়ন্তর না দেখিয়া অবশেষে সিন্ধিয়ার দুরন্ত অর্থগৃধ্নুতা পরিতৃপ্ত করিতে সম্মত হইলেন।...

প্রজাপতির দূতগণ মিবার হইতে উক্তরূপ অবমাননার সহিত দূরীকৃত হইলে জয়পুরনৃপতি নির্বতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। অবশেষে একটি সুবিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া মিবারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এতদুপলক্ষে যে সেনাদল সজ্জিত হইল, অম্বর রাজ্যের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভ কাল হইতে সেরূপ সেনাদল আর কখনও সজ্জিত হয় নাই। এদিকে মারবার রাজ মানসিংহ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচণ্ড সমরোদ্যোগের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তদ্বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন এবং আপনার অধিগত সমস্ত সৈনিক লইয়া ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।"

মারবারে কিন্তু সিংহাসনের অধিকার নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হল। মানসিংহের পিতার এক অবৈধ পুত্র সিংহাসন দাবি করে বসল। জগৎসিংহ মানসিংহের বিরুদ্ধে শত্রুতায় এই ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে চাইল। আমীর খাঁ নামক জনৈক দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সর্দার এই দাবিদারের সহায়ক ছিল। কিন্তু আমির খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় সে নিহত হল। আমির খাঁ মানসিংহের সমর্থক হয়ে উঠল।

জগৎসিংহ লক্ষাধিক সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী নিয়ে মানসিংহকে

পরাজিত করল। মানসিংহ নিজ রাজধানীতে গিয়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু যোধপুর লুণ্ঠিত হল। জগৎসিংহ বিজয়উল্লাসে নিজ রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন। কিন্তু মানসিংহের যে সব সামন্ত তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তারা জগৎসিংহকে পরিত্যাগ করল। লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার পুনর্লুণ্ঠিত হল। জয়লাভ করেও জগৎসিংহ নিদারুণ পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। সে সব কথা আমাদের বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে মেবারে যখন রাজনৈতিক সঙ্কট চরমে পৌঁছল। জগৎসিংহ, মানসিংহ, মহারাষ্ট্রীয়গণ এবং আমীর খাঁ সকলেই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করল।

"দুরাচার পাঠান স্পষ্টই বলিল রাজকুমারী হয় মানসিংহকে বিবাহ করুন, নতুবা আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজবারার শান্তি স্থাপন করুন; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে গেলেই রাণা মহাসঙ্কটে পতিত হইবেন। রাণা ভীমসিংহ এ সকল বিবরণ শ্রবণ করিলেন।…তিনি বুঝিতে পারিলেন যে দুরাচার আমির খাঁর কথা না রাখিলে উদয়পুর ছারখার হইয়া যাইবে। একদিকে স্বর্গীয় সুকুমার অপত্যস্নেহ তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতে লাগিল, অপরদিকে আমির খাঁর কঠোর অনুশাসন মিবার রক্ষার ভবিষ্যৎ চিত্র সম্মুখে ধারণ করিয়া সেই সুকুমার হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলিতে লাগিল। ….যৌয়ানদাস, ভীমসিংহের স্বর্গীয় পিতার অন্যতমা উপপত্নীর গর্ভে সমুদ্ভূত। বেশ্যাগর্ভজাত বলিয়া হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ হউক তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃ কঠিন। সেই কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেই কঠিন হৃদয় মুহূর্তের জন্যও কম্পিত হইল না। তিনি সহাস্যবদনে সেই লোমহর্ষণ হৃদয়স্তম্ভন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যখন সেই লাবণ্যবতীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল; যখন সেই সরলতাময়ী ফুল্লারবিন্দনিন্দিত মুখমণ্ডল ঈষৎ নত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তখন যৌয়ানদাসের সর্বাঙ্গ শিহরিত হইল, তাঁহার হস্ত হইতে শাণিত ছুরিকা খসিয়া পড়িল। শোকে দুঃখে, আত্মদ্রোহিতায় নিপীড়িত হইয়া তিনি নিতান্ত দীনভাবে সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে বিষপ্রয়োগে তার হত্যার আদেশ দেওয়া হল।

"একজন রমণী সেই গরল প্রস্তুত করিয়া রাণার নামে কৃষ্ণকুমারীর হস্তে

অর্পণ করিল। সুকুমারী সরলা কৃষ্ণা ধীরভাবে অকম্পিত হস্তে সেই বিষপাত্র গ্রহণ করিলেন; তাঁহার মস্তকের একগাছি কেশমাত্রও কম্পিত হইলনা; তিনি একটিমাত্রও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন না। ঈশ্বরের নিকট পিতার দীর্ঘজীবন ও শ্রীবৃদ্ধির কামনা করিয়া তিনি অবিকৃত হৃদয়ে সেই পাত্রস্থ বিষ পান করিয়া ফেলিলেন।"

এ ভাবে পরপর তিনবার চেষ্টা ব্যর্থ হল।

"পরিশেষে অহিফন ও কুসুমরস একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার অত্যুৎকট হলাহল প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণকুমারী বুঝিলেন এই শেষবার, এইবার তাঁহাব জীবন অনন্তকালেব জন্য দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এইবার তাঁহাকে ভবধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। শান্ত ও ঈষৎ হাস্য বিকাশে তাঁহার বিম্বাধর অল্প কম্পিত হইল, গোলাপনিন্দিত গণ্ডস্থল ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ঈশ্বর সমীপে মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই বিকট বিষ পান করিলেন।"

টডের রাজস্থানে বর্ণিত কাহিনীটি মধুসূদন বিকৃত করেন নি, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছেন। মূল থেকে ক্বচিৎ তিনি স্বাতন্ত্র্য আশ্রয় করেছেন, মূলকে তা আহত করে নি। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে পূর্ণদেহ গল্পে রূপান্তরিত করবার জন্য যে ধবনের কল্পনাশক্তিব ব্যবহার প্রয়োজন হয় মধুসূদন তা করতে দ্বিধা করেন নি।

ঐতিহাসিক ঘটনাব ঘনঘটাকে তিনি পশ্চাৎপটে রেখেছেন। মহারাষ্ট্র শক্তির আঘাতে আঘাতে বহুদীর্ণ মেবারের হৃদয়রক্ত দেখিয়েছেন, আঘাতের ঘটনাটি দেখান নি। পাঠান সর্দার আমীর খাঁর উল্লেখ আছে, প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি তার ভূমিকা। এমন কি কৃষ্ণকুমারীর অন্যতম পাণিপ্রার্থী মানসিংহও দূরেই থেকেছে। তাই এ নাটকের চরিত্রলিপিতে সিন্ধিয়া নেই, আমীর খাঁ নেই, মানসিংহ নেই। মন্ত্রী সত্যদাস (টড বলেছেন সতীদাস) নিরীহ ভাবেই ঘোরাফেরা করেছে, শক্তাবৎ-চন্দাবৎ সংঘর্ষের তীব্রতার ছায়াপাত সেখানে ঘটে নি। জনৈক সমালোচক বলেছেন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী মোটেই barren of incidents নয়। তবুও মধুসূদন একে ঘটনাবিরল মনে করেছেন এবং বিলাসবতী, মদনিকা, ধনদাসের কাল্পনিক উপাখ্যান এনে হাজির করেছেন, ফলে ট্রাজিক ও ঐতিহাসিক দুটি দিকেই বিচ্যুতি এসেছে।

সমালোচকের এই সিদ্ধান্ত কেন ভ্রান্ত পরে তা বলব। কিন্তু ঘটনাবহুল এই কাহিনী ঘটনাবিরল হয়ে দাঁড়াল কি করে এবং কেন?

মধুসূদন ঘটনার বহুলতায় স্বস্তিবোধ করতেন না। সম্ভবত এখানেই তিনি মূলত কবিপ্রাণ, নাটকীয় প্রতিভার তুলনায় বেশি নাট্যকাব্যের প্রতিভার অধিকারী। তিনি সমকালীন মেবারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার বিবরণে প্রবেশ করেন নি। বহু সংখ্যক যুদ্ধ-ঘটনাকে উপস্থিত করেন নি রঙ্গমঞ্চের আলোতে। কিন্তু তিনি তার নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার কালো ছায়াটিকে একবারও আচ্ছন্ন বা আবৃত করেন নি।

তিনি একটি মানবিক কাহিনীর ঘনপিনদ্ধ ঐক্যে ইতিহাস-ঘটনার বহুমুখী স্রোতকে দানা বাঁধাতে চেয়েছেন। কাহিনী-গঠনের জন্য কল্পনার প্রয়োজন। ইতিহাস মানুষের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না। মানব-প্রবৃত্তির অন্দরমহলের নানা সূত্র জড়িয়ে একটা কাহিনীকে মানবরসপূর্ণ করে তোলা যেতে পারে। ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকার উপাখ্যান সেই দায়িত্ব পালন করেছে। ব্যক্তিগত ঈর্ষা চাতুর্য-কলহ-লোভ-স্বার্থবুদ্ধি প্রভৃতি প্রবৃত্তিজাত কর্মতৎপরতা ঐতিহাসিক ঘটনার নির্বিশেষ পুঞ্জের মধ্যে কৃষ্ণকুমারীকে একটি বিশিষ্ট নাট্যকাহিনী রূপে গড়ে তুলেছে।

ধনদাস-মদনিকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। এদের কথা টডে নেই। টড জগৎসিংহকে ইন্দ্রিয়দুর্বল নৃপতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং কর্পূর-মঞ্জরী নামে তাঁর রক্ষিতা বারবনিতার কথাও বলেছেন। এই সূত্রটির উপরে নির্ভর করে কাল্পনিক কাহিনীটি এবং চরিত্রগুলি মধুসূদন গড়ে তুলেছেন।

কৃষ্ণকুমারীর মানসিংহের প্রতি প্রণয়াসক্ত হবার বিষয়টিও কবির কল্পিত। এ কল্পনা কৃষ্ণার রোমান্টিক মনোভঙ্গিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

টডের যৌয়ানদাস এখানে হয়েছে বলেন্দ্রসিংহ। তিনি যে ভীমসিংহের পিতার অবৈধ সন্তান নাটকমধ্যে অপ্রয়োজনবোধে সে পরিচয় জানান নি মধুসূদন।

মধুসূদন কৃষ্ণার আত্মঘাতিনী হবার কথা বলেছেন, কিন্তু টডে আত্মহননের উল্লেখ নেই। খড়্গাঘাত করতে যৌয়ানদাস অসমর্থ হলে বিষপান করিয়ে কৃষ্ণাকে হত্যার ব্যবস্থা করা হল এবং পর পর তিনবার চেষ্টার পরে সেই ভয়ানক কাজ সম্পন্ন হল। কিন্তু মধুসূদন রচনাটির নাট্যগুণ রক্ষা করবার জন্যই এরূপ হতে দেন নি। বলেন্দ্রসিংহ খড়্গ দূরে নিক্ষেপ করার অল্প পরে

কৃষ্ণা স্বয়ং আত্মহত্যা করল। অন্যথায় বিলম্বিত ঘটনাক্রম নাট্যরসকে একেবারে শিথিল করে ফেলত।]

কৃষ্ণা স্বপ্নে এবং প্রত্যক্ষে পদ্মিনীর মূর্তি দেখেছে এবং তার প্রত্যাদেশ শুনেছে। এটি মধুসূদনের কল্পনা। একটা অর্ধ-অলৌকিক অর্ধ-মনস্তাত্ত্বিকতা এর ফলে নাটকটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে প্রথম রাজস্থান গ্রন্থকে সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণ-রূপে আহ্বান জানালেন। এর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতকের প্রথম কিছুকাল ধরে বাংলা নাটক ও উপন্যাসে রাজস্থান গ্রন্থ থেকে কাহিনী সুপ্রচুর গৃহীত হয়েছে। রাজবারার বীরত্ব-কাহিনী বাঙালিকে স্বদেশ-প্রাণতায় দীর্ঘকাল ধরে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে। মধুসূদনে তারও সূত্রপাত।

কিন্তু প্রশ্ন হল মধুসূদন বেছে বেছে কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীটি নির্বাচিত করলেন কেন? টডের মেবার কাহিনীর একেবারে শেষ দিকের এই ঘটনাটি তাঁর পছন্দ হল, অথচ সমগ্র রাজস্থান গ্রন্থই বহুসংখ্যক আকর্ষণীয় ঘটনায় পূর্ণ। এর কয়েকটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

এক। মধুসূদন তখন মেঘনাদবধ কাব্য লিখছিলেন, তাঁর সমগ্র কবি-আত্মা এমন কি গোটা ব্যক্তি-অস্তিত্বও যেন ঐ মহাকাব্যের সুরে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণলঙ্কার চরম পতনের দিনগুলি ধরা পড়েছিল তাঁর কল্পনায়, পরম গৌরবের উজ্জ্বল কাল নয়। এর মধ্যে কবির জীবন-চেতনা প্রতিফলিত।[১৮] স্বর্ণলঙ্কার রাবণ ভগ্নলঙ্কার মাঝখানে বসে বেদনার্ত হয়ে উঠেছেন। শত্রুর আক্রমণে, আত্মীয়স্বজনের বিনাশে লঙ্কার গৌরব নিত্য ক্ষীয়মাণ। ঠিক একই সময়ে কবি মেবারকাহিনী থেকে নির্বাচিত করলেন এমন একটি অধ্যায় যেখানে মেবারের পূর্ব গৌরব অতীতের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে, বর্তমানে বাস্তব শুধু ক্ষীণশক্তি ও অর্থহীন দুরবস্থা। ভীমসিংহের এই কথাগুলি,…"আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ কত্তে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়ে রাজ্যরক্ষা কত্তে হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?"—রাবণের এই আর্তিপূর্ণ বেদনাবাণীকে সহজেই মনে করিয়ে দেয়—

হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে।
কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী,
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

লঙ্কাপুরী বিদেশাগত রামসৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত, মেবারও মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠান সৈন্যদের দ্বারা উপদ্রুত, জয়পুরী এবং মারাঠী সেনাবাহিনীর সংঘাতস্থল হওয়ায় বিপর্যস্ত। মধুসূদনের যে-মন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় মগ্ন সেই মন প্রায় সমজাতীয় কাহিনী নির্বাচনে হৃদয়ের সায় পেয়েছে।

দুই। মেঘনাদবধের ট্রাজেডির ভিত্তি রাবণের চরিত্র—তার অন্তর্বেদনা। পুত্রশোকাতুর রাবণের বীর্যবন্ত চরিত্রের সঙ্গে ভীমসিংহের তুলনা চলে না। কিন্তু ভীমসিংহও প্রাণাধিক কন্যা কৃষ্ণার মৃত্যুতে বেদনাদীর্ণ। তা ছাড়া সর্বপ্রিয় মেঘনাদের মৃত্যু যেমন মেঘনাদবধ কাব্যের বেদনাকেন্দ্র তেমনি সকলের স্নেহধন্য অতি কমনীয় প্রকৃতির কৃষ্ণার মৃত্যুকে আশ্রয় করেই এই নাটকের করুণ রস তথা ট্রাজিক আবেদন উৎসারিত।

মেঘনাদবধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনী-অংশ এত পৃথক অথচ এদের মধ্যে দুটি দিকে রয়েছে গুরুতর সাদৃশ্য। এই কারণেই মেঘনাদবধ রচনাকালে তিনি কৃষ্ণকুমারী ছাড়া অন্য কোন কাহিনী রাজস্থান গ্রন্থ থেকে নির্বাচন করতে চান নি।

তাঁর শিল্পী-চিত্তের ক্লাইম্যাক্স এই দুটি কাব্য ও নাটক রচনা-কালে। ক্লাইম্যাক্সে পৌছে তাঁর শিল্পীমনে যে কম্পন অনুভূত হয় উভয় কাহিনীকে তা কতকাংশে সমধর্মী করে তুলেছে।

॥ চার ॥

ইতিহাসের ঘটনা ও পাত্রপাত্রীদের অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় এই প্রথম নাটক লিখলেন মধুসূদন। বাংলা নাট্যসাহিত্যে পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক

নাটক একটি মুখ্য শাখা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মধুসূদনে তাঁর সূত্রপাত এমন দাবি করা হয়ে থাকে। এ দাবির যৌক্তিকতা কত দূর সে বিচারে প্রবেশের আগে ঐতিহাসিক নাটকের ধর্মের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩০৫ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাস" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[১৯] প্রবন্ধটি কবির "সাহিত্য" গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে গভীর এবং মৌলিক চিন্তার পরিচয় আছে। এই প্রবন্ধের সাহায্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস তথা নাটকের অন্তর-ধর্মে পৌঁছুবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এক। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের গবেষণা এবং সত্যানুসন্ধানের সাফল্যে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আজ ইতিহাস যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করছে, কাল নূতন আবিষ্কার তাকে স্থানচ্যুত করতে পারে। কবি ঐতিহাসিক তথ্যকে চিরকালীন সত্যের আসন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। সাধারণভাবে তথ্য বা বাস্তবতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।[২০] ঐতিহাসিক তথ্যচ্যুতিকে তিনি সত্যস্খলন বলে স্বীকার করেন নি।

দুই। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে তিনি বলেছেন,

"ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। (কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ সরষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই—কারণ স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ্য মাত্র।"

এই রসকে কবি "ঐতিহাসিক রস" নাম দিয়েছেন। বলেছেন এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।

তিন। ঐতিহাসিক রসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন,

"পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর

কার্যপরম্পরা যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূল রাগিনী বাজে, এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর একটা সুদূর বিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।"

চার। ঐতিহাসিক রসের পক্ষে ইতিহাসের ঘটনাকে অপরিহার্য বলে কবি মেনে নিতে চান নি। আগাগোড়া কাল্পনিক কাহিনীও এই রসাবেদন সৃষ্টি করতে পারে, তবে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বেঁধে দিতে পারলে পাঠকের প্রত্যয় উৎপাদন লেখকেব পক্ষে সহজ হয়, রবীন্দ্রনাথের এই মত।

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন। মহাকাব্যেব আস্বাদের সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যাত ঐতিহাসিক রসের কোন পার্থক্যই তিনি দেখতে পান নি। মহাকাব্যে, খাঁটি ঐতিহাসিক নাটক ও উপন্যাসে, ইতিহাসাশ্রিত (খাঁটি ঐতিহাসিক নয়) রোমান্সে, আধা-ঐতিহাসিক-আধা-কাল্পনিক নাটকে মহাকাব্যোচিত উদাত্ত ব্যাপকতা এবং গম্ভীর মাহাত্ম্যের রস মিলতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক রসকে স্বতন্ত্র করে চিনে নেবার উপায় কি?

যাঁরা এ জাতীয় নাটকে বা উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যমূল বাস্তবতার দ্বিধাহীন আনুগত্য দাবি করেন তাঁদের অস্বীকার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ঘটনাংশকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছেন। এরূপ চরম পন্থার আশ্রয় নেওয়া কিছু বিপজ্জনক। নূতন গবেষণায় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ভবিষ্যতে পরিত্যজ্য হবে। কিন্তু তাই বলে ঐতিহাসিক সত্য মায়ামাত্র এরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান অকর্তব্য।

কিন্তু এসব আপত্তি সত্ত্বেও বলতে হবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে এমন একটি প্রত্যয় আছে যাতে ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাসের আলোচনায় এর ঋণ গ্রহণ অপরিহার্য করে তুলেছে। তিনি ঐতিহাসিক রস নামক মিশ্ররসের কল্পনা করে যে কথা বলেছেন "জগতের রাজপথ দিয়া বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ— ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসাস্বাদ"। তার সহায়তা ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটকের পাঠক-সমালোচকের কাছে উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকার।

কোন জাতির জীবনে যদি সর্বব্যাপী কোন সমস্যার উত্তালতা অনুভূত হয় তাকে ঐতিহাসিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা চলে। ইতিহাস গতিশীল। এই গতি জীবনপ্রবাহের সর্বস্তরে বিস্তৃত। অর্থনীতি, চিন্তা-সাধনা শিল্পসৃষ্টি সর্বক্ষেত্রে এই গতির আবেগ। প্রত্যহের গতিবেগে মৃদুতা অনুভব করা যায়। ক্রান্তিকালে তা প্রচণ্ড তীব্র হয়ে ওঠে। মহাকালের রথের চলার বিরাম নেই ঠিকই। কিন্তু তার চাকার ঘর্ঘর শব্দ আকাশ বাতাসকে মন্দ্রমুখর করে তুললেই এই চলাকে সত্য বলে প্রত্যয় জন্মে। যুগজীবনের বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণেই ইতিহাসের গতি উত্তাল হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিজীবনের যাবতীয় প্রশ্ন পারিবারিক সমস্যা হয়ে ওঠে না। ব্যক্তি-জীবনের কোন কোন সমস্যা একান্ত ভাবেই ব্যক্তিগত। পরিবার ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকলেও তা গোটা পরিবারের বা সমগ্র সমাজের সমস্যা নয়। আবার পারিবারিক সমস্যা মাত্রই সমাজ-সমস্যা নয়। যদিও বহু পরিবার নিয়েই সমাজ গঠিত। "রামের সুমতি" গল্পের সমস্যাটি পারিবারিক। কিন্তু "প্রফুল্ল" নাটকে ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ ও একটি পরিবারের সর্বনাশের কাহিনী বিবৃত হলেও তার মধ্য দিয়ে একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার ক্রমবিপর্যয়ের একটি সমাজ-সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবার ব্যক্তির জীবনজিজ্ঞাসা, পারিবারিক আলোড়ন, সামাজিক প্রশ্ন প্রভৃতি থেকে ঐতিহাসিক সমস্যার স্বাতন্ত্র্য আছে। ব্যক্তির জীবন-জিজ্ঞাসার পথ ধরে ঐতিহাসিক সমস্যাকেও সাহিত্যের রূপ লাভ করতে হয়। কিন্তু ব্যক্তির জিজ্ঞাসা সেখানে আর শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রশ্ন থাকে না, গোটা জাতির, একটা সম্পূর্ণ যুগের সমস্যা ব্যক্তির পাত্রে পরিবেশিত হয়। সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু সমাজের সমস্যা মাত্রেই ঐতিহাসিক সমস্যা নয়। সমাজের সর্বস্তরে,সমগ্র জাতির জীবনে একটা যুগের চেতনা, বেদনা, উল্লাস ও প্রাবল্য যদি স্পন্দিত হয়ে ওঠে তবেই তাকে ঐতিহাসিক বলে মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। কোন একটি বিশিষ্ট পরিবার-জীবনে যেমন গোটা সমাজ-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটতে পারে, তেমনি ঐতিহাসিক সমস্যাও সেখানে রূপলাভ করতে পারে। তবে একটি পরিবারের জীবনে সমগ্র জাতির জীবন ও যুগক্রান্তির পূর্ণ প্রতিবিম্বন ঘটলেই তার ঐতিহাসিক মর্যাদা স্বীকার্য।

ঐতিহাসিক সমস্যার রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের তথ্যের। ঐ

সমস্যাটিকে বিশিষ্ট দেশ ও কালের পটভূমিতে স্থাপন করতে হবে। সেই দেশ ও কালের রূপ ও রঙের স্পর্শ না থাকলে যুগের সমস্যাটি নির্দিষ্টতা পাবে না, সত্য হয়ে উঠবে না। এ ক্ষেত্রে আপোস করলে রসের সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটবেই। ঐতিহাসিক নাটকের লেখক এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইতিহাসের তথ্যের প্রতি অনুগত থাকবেন। তবে নাট্যকারের সৃষ্টির স্বাধীনতা এর দ্বারা বিঘ্নিত হবে না। এক। যুগ ও ঘটনার নির্বাচনে তিনি শুধু নিজের কাছেই অনুগত। দুই। তথ্যরাশির মধ্য থেকে গ্রহণ বর্জনের সুযোগও তাঁর অঙ্কুশবিহীন। তিন। যুগ-লক্ষণকে ব্যাখ্যার, ক্রান্তিকালকে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরবার মধ্যেও দুজন নাট্যকার ভিন্নপথ ধরতে পারেন, বহু ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যান থেকেও এ পথ স্বতন্ত্র হতে পারে। একই যুগের বিশ্লেষণে একই তথ্যস্তূপে দাঁড়িয়ে দুজন ইতিহাসবেত্তার মতপার্থক্যও কি আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয় নয়? চার। নাট্যকারের কল্পনা নির্বাচিত তথ্য ও উপলব্ধ যুগচেতনা এবং ঐতিহাসিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে পারে, কল্পনা যে শুধুমাত্র প্রাণহীন ঘটনাকেই সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে তা নয়, তথ্যের অন্তর থেকে সত্যকে আবিষ্কার করে প্রকাশ করতে পারে। সর্বোপরি কল্পনার সহযোগেই ইতিহাস নাটক হয়ে ওঠে, সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়।

ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার স্থান স্বীকার্য। তবে আধা-ঐতিহাসিক আধা-কাল্পনিক নাটকের সঙ্গে এই কল্পনার গোত্রগত পার্থক্য আছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকে ইতিহাসের উপকরণ কাল্পনিক কাহিনী ও চরিত্রের চার পাশে অলঙ্করণের সৃষ্টি করে। কল্পনার সেখানে বাধা নেই, দায়িত্ব নেই ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্রকে স্পর্শ করবার, চেষ্টা নেই যুগচৈতন্যকে ব্যক্ত করবার, আর সাধনা নেই ঐতিহাসিক রসসৃষ্টির। ইতিহাস সেখানে কল্পনার অধীন, তাই মুক্তপক্ষ ও বহু বর্ণরঞ্জিত। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের কল্পনার বিশিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী একাগ্রতা স্বতন্ত্র রসের আকর। সে কল্পনার নাম দেওয়া যেতে পারে ঐতিহাসিক কল্পনা। তথ্যের ভার যার নাগাল পেল না, সেই অন্তর-সত্য ধরা পড়ল ঐতিহাসিক কল্পনার সন্ধানী আলোয়।

এই জাতীয় নাটকে কল্পনার দ্বিতীয় দায়িত্বটি নাট্যশিল্পের দিক থেকে আরও গুরুতর। নাটক জীবনের কাহিনী, ব্যক্তি-জীবনের অন্তরলোকের কাহিনী। ইতিহাসের ঘটনাক্রমের সূত্র মহাকাল,—অর্থনীতি-রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত। ইতিহাস-নিয়ন্তা মুখ্য ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে যে ভূমিকা তা-ও

ব্যক্তিক নয়, তারা আবেগানুভূতির পথ ধরে চলে না, রাষ্ট্রনীতির বুদ্ধিতে শান দিয়ে চলে। কিন্তু নাট্যকাহিনী মানব-আবেগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাট্যকাহিনী মানবহৃদয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। মানবিক কামনাবাসনা, হৃদয়ার্তির বিচিত্রতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণেই ইতিহাসের ঘটনা নাটকের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। ইতিহাসের ঘটনা বস্তুভিত্তিক (Objective)। প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা তা বহুক্ষেত্রে পরিচালিত হলেও সে প্রভাব বস্তুচেতনাজাত। নাটকের কাহিনী মনভিত্তিক। ইতিহাসের উপকরণকে নাটকের কাহিনী করে তুলবার জন্য এই হৃদয়-ভিত্তিটিকে কল্পনার সাহায্যে আবিষ্কার করে নিতে হয়।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের চরিত্রচিত্রণে কল্পনার অবকাশ কতটা এ নিয়ে সমালোচকেরা একমত হতে পারেন নি। ইতিহাসের অপ্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে গুরুতর কোন সমস্যা নেই, তাদের চরিত্রের কোন দিকেরই কোন স্পষ্ট ছবি ইতিহাসে আঁকা থাকে না। কিন্তু প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়েই বিপদ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক ওয়াল্টার স্কট ইতিহাসের প্রধান পুরুষদের উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেন নি, প্রান্তে আসন দিয়েছেন। সমস্যাটিকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন তার মুখোমুখি দাঁড়ান নি।

ইতিহাসের মুখ্য পুরুষদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব কিন্তু ইতিহাসে ধরা পড়বার নয়। তাঁদের চরিত্রের বাহির-অন্তর সব দিক নিয়ে ইতিহাসের কারবার নয়। তাঁদের চরিত্রের যে দিক ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রধানত সেই দিকই কালের গতির সঙ্গে যুক্ত। অবশ্য মহম্মদ বিন তুঘলকের মত ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত পাগলামিও ইতিহাস-ঘটনায় এক কালে প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলেছিল। এরূপ আরও কিছু উদাহরণ সংকলন করা হয়ত একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু এদের ব্যতিক্রম বলাই শ্রেয়। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে রাজার চরিত্রানুযায়ী নীতি নির্ধারণ ঘটত, নৃপতির সহৃদয়তা বা নির্দয়তা, কল্যাণবোধ বা শক্তিমদমত্ততা ইতিহাসকে প্রভাবিত করত। কিন্তু এই সব সাধারণ চরিত্রলক্ষণের অন্তরালে যে একান্ত ব্যক্তিগত জটিল কার্যকারণসূত্র থাকে ইতিহাস কদাচ তার উদ্ঘাটনে যত্ন নেয় না—তা ইতিহাস-সীমার বহির্ভূত। নাট্যকারের কল্পনার লীলা সেখানে বর্ণবিস্তার করতে পারে—সেখানেই ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা থেকে জীবনের মুক্তি সাহিত্যের রাজ্যে। অতিপরিচিত ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কল্পনা সর্বজনজ্ঞাত তথ্যের

বিরুদ্ধাচরণ করলে রসসৃজনে বিঘ্ন ঘটতে পারে। নাট্যকার সেখানে সতর্ক হবেন এইটুকু মাত্র বলা যায়, তার বেশি নয়।

✓ মধুসূদন স্বয়ং একটি চিঠিতে কৃষ্ণকুমারীর পরিচয় দিয়েছেন, "Historic tragedy" বলে।[২১] ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে এর মূল্য বিচার করবার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইতিহাসের বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম নাট্যরচনার সূত্রপাত। কৃষ্ণকুমারী নাটকের কিছু পূর্বে লিখিত এবং প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটির কথা প্রসঙ্গত মনে আসবে। নীলদর্পণের কোন চরিত্র ঐতিহাসিক নয়, নীলচাষীদের কর্মবিরতি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও, নবীনমাধব বা ক্ষেত্রমণিদের পারিবারিক সর্বনাশ ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, প্রতিনিধিত্বমূলক ঘটনা হতে পারে (অর্থাৎ এরূপ বহু পরিবারের সর্বনাশ নীলকরদের দ্বারা ঘটেছে)। কিন্তু তবুও নীলদর্পণ নাটকটিতে ঐতিহাসিক নাটকের একটা প্রধান লক্ষণ আছে। তা হল ঐতিহাসিক রসসৃজন। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে সারা উনবিংশ শতক জুড়ে বাংলা দেশে গ্রামজীবন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। বৃটিশ শক্তি প্রবর্তিত নূতন কৃষিব্যবস্থা গ্রামজীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনছিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার অশুভ ফল ফলছিল, গ্রাম্য কৃষকজীবন এই নূতন অবস্থায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল, প্রতিনিয়ত শোষণ এবং দুর্বিষহ অত্যাচারে কৃষকশ্রেণীর অন্তরের চাপা আক্রোশ মাঝে মাঝে বিদ্রোহে ফেটে পড়ছিল। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রাঢ়ের কোল বিদ্রোহ, ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলন এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নীলচাষীদের আন্দোলনকে এই পটভূমিতে স্থাপন করে দেখলে তার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। সারা বাংলাদেশের কৃষকসমাজ তখন অত্যাচারে বিক্ষত হচ্ছিল, বিক্ষোভে কাঁপছিল তরঙ্গিত লাভাগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত। কলকাতা শহরে তখন নবীন যুগদেবতার অভ্যুত্থান হচ্ছে। বাংলার গ্রামও নবজন্মের যন্ত্রণা বহন করেছে সর্বদেহে। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়তি সেখানে নূতনকে বরণ করে আনে নি। এই যন্ত্রণা ও বিস্ফোরণমুখী মনোভাব গোটা নীলদর্পণ নাটককে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে রেখেছে। নীলদর্পণের কাহিনীতে স্বরপুরের সর্বনাশ, নবীনমাধবদের পারিবারিক বিপর্যয়, ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে সমগ্র বাংলা দেশের সমকালীন কৃষকশ্রেণীর অন্তরলোকের ভাবরসটিকে প্রতিফলিত করেছে। সেদিক থেকে নীলদর্পণ

বাঙালি কৃষকজীবনের একটা যুগের মহানাটকের ভূমিকা নিয়েছে। নীলদর্পণে বিচ্যুতি অনেক। রচনাশিল্পের নিপুণ পরিমার্জনা থেকে এর বহু অংশই বঞ্চিত, সূক্ষ্মতা বা গভীরতার প্রশ্নেও সংশয় অনেক। কিন্তু সব ছাপিয়ে একটা কালের, একটা ব্যাপক সমাজের জীবনতরঙ্গ এখানে মূর্তি ধরেছে। একের দুঃখ ও ক্রোধ নয়, বহুর অত্যাচারিত-বিপর্যস্ত জীবনার্তি এবং বিদ্রোহমুখী ক্রোধ বহুস্বার বীণার মহাকোলাহলে এর পশ্চাতভূমি মুখর করে তুলেছে। দীনবন্ধুর এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তবুও নীলদর্পণ পুরোপুরি ঐতিহাসিক নাটক নয় ; এর কোন চরিত্র বা ঘটনাই ইতিহাসের নয়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে কৃষ্ণকুমারী ঐতিহাসিক রসসৃজনের দিক থেকে নীলদর্পণের অনুজ, কিন্তু ইতিহাসসম্মত বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করায় আমাদের ভাষার অপর সব ঐতিহাসিক নাটকের অগ্রজ। কৃষ্ণকুমারীই প্রথম পুরোপুরি ঐতিহাসিক নাটক।

টডের রাজস্থানকে পণ্ডিতেরা ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে একালে আর গ্রহণ করেন না। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে টডের গ্রন্থের অনেকখানিই কল্পনাশ্রয়ী।[২২] কিন্তু ভীমসিংহের রাজত্বকালের কতকাংশ টডের সমকালীন। টড স্বয়ং সেই সময়ে রাজস্থান ভ্রমণ করেছিলেন। যে কাহিনী কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভিত্তি. টডের বর্ণনার সেই অংশে কোন উল্লেখ্য অনৈতিহাসিকতা নেই। আসলে টড থেকে যেখানে মধুসূদন বিচ্যুত, সেখানেই তিনি ইতিহাস থেকে কল্পনাজগতে প্রবেশ করেছেন। সেই কল্পনা ইতিহাসকে বিকৃত করেছে কিনা, তাই বিচার্য। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে কৃষ্ণকুমারীর মূল্য বিচার করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের দিকে এগুনো চলে।

এক। টডের রাজস্থানকে যদি ইতিহাস বলে গ্রহণ করা যায় তা হলে ইতিহাস বিচ্যুতি কৃষ্ণকুমারীতে বড় নেই। টডের গ্রন্থকে উনবিংশ শতকে তো বটেই, বিংশ শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হত। কবি টডকে ইতিহাস বলে বিশ্বাস করে ইতিহাস-অনুসরণের নিষ্ঠা নিয়ে উপকরণ গ্রহণ করেছেন। একালে সাধারণভাবে রাজস্থান গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা স্বীকৃত নয়। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী বর্ণনায় টড যে তথ্যনিষ্ঠ তা বিশ্বাস করবার কারণ আছে। মধুসূদন মূলত টডের অনুসরণ করেছেন। তবে সামান্য বিচ্যুতি আছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় সে বিষয়ের উল্লেখ করেছি। টড থেকে যে বিচ্যুতি তাই ইতিহাস-ঘটনা

থেকে স্খলন। তবে ঘটনাগত এই পার্থক্যগুলি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দুই। কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে নূতন যে অংশ কল্পনার সাহায্যে আমদানী করেছেন মধুসূদন তা গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেই ইতিহাস-ঘটনা থেকে যথার্থ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছেন কবি। বিলাসবতী-মদনিকা-ধনদাসের উপাখ্যান ইতিহাস-গত নয়। কবি এ উপাখ্যানটি কেন কল্পনা করেছিলেন? এর ফলে কাল্পনিকতা প্রধান হয়ে উঠে ঐতিহাসিকতাকে কি বিনষ্ট করল না?

ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার স্থান অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু সে কল্পনা ইতিহাস-ঘটনার সঙ্গে যেন সহজ ভাবে সম্বদ্ধ হয়। রাজা জগৎসিংহের চরিত্রশিথিলতা এবং তার রক্ষিকা কর্পূরমঞ্জরীর কথা স্বয়ং টড বলেছেন। এই সূত্রটুকুকে আশ্রয় করে কাল্পনিক উপাখ্যানটিকে পল্লবিত করে তুলেছেন কবি। এদের প্রবেশের দ্বার ইতিহাসই খুলে দিয়েছে।

মধুসূদন এই কাল্পনিক অংশের সংযোগে ইতিহাস-ঘটনাকে কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন। বিলাসবতীর ঈর্ষা, জগৎসিংহের সৌন্দর্যলালসা, ধনদাসের অর্থলিপ্সু সয়তানী, মদনিকার চাতুর্য এবং বিলাসবতীর প্রতি সুগভীর ভালবাসা মানবিক অনুভূতি। এরই পাকচক্রে কৃষ্ণকুমারীর হৃদয়ে গড়ে উঠেছে একটি রোমান্টিক প্রেমাকুতি। এই সব মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু এই কাল্পনিক কাহিনী কি ইতিহাসের ঘটনাস্রোতকে মূল্যহীন করে ফেলেছে? রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত কোথাও এই আখ্যান দ্বারা মন্দীভূত হয় নি। জগৎসিংহের রণসজ্জা, মানসিংহের কৃষ্ণাকে লাভ করবার বাসনা, মহারাষ্ট্রীয়দের সাহায্য লাভ প্রভৃতি ইতিহাসকথিত ঘটনা, ব্যক্তিগত ঈর্ষা লোভ, প্রেম, চাতুর্য, প্রভৃতি প্রবৃত্তির তরঙ্গোদ্বেলতায় আরও দানা বেঁধেছে। ধনদাস-মদনিকার চেষ্টা ছাড়াও সব ঘটনাই ঘটত, ইতিহাসে তা ঘটেওছে। কিন্তু ধনদাস-মদনিকার কার্যকলাপ ইতিহাসের সদর রাস্তা ছাড়িয়ে পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি কতকগুলি ব্যক্তির চরিত্রের অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাপর্যায়কে তা নাকচ করে নি, তাকে পুষ্ট করেছে অনালোকিত কতকগুলি প্রদেশে আলোকপাত করে।

তিন। চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন যথাসাধ্য ইতিহাসের অনুগত থাকতে চেয়েছেন। কাল্পনিক পাত্রপাত্রীদের চরিত্রগুলিও ইতিহাস-ঘটনা ও

ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সতর্কতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তিনি কেশববাবুকে লিখেছিলেন,

"I have tried to represent Juggat Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow ; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to conform them to the principal characters."

ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীদের মধ্যে কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রে কল্পনার অবকাশ বেশি। টড তার চরিত্রের সাধারণ কোমলতার উল্লেখ করেছেন। মধুসূদন তার এই ইতিহাসকথিত পরিচয়ের সাধারণ লক্ষণকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করেছেন, পরিহার করেন নি, তাকে রোমান্টিক প্রণয়-নায়িকা করে তুলেছেন। এ জাতীয় কল্পনা রচনার ইতিহাস-ধর্মকে আঘাত করে না, তার সাহিত্যধর্মকে বাড়ায়।

চার। পিতার আদেশে রাজ্যকে চরম রাজনৈতিক বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ঘটল। বিষয়টি মর্মান্তিক বেদনার এবং ইতিহাসকথিত। কিন্তু একটা গোটা জাতির ভাগ্য ও জীবন এই ঘটনার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হবার সুযোগ কোথায়? মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীটি নির্বাচন করে হৃদয়বিদারী করুণ রসের প্রতি তাঁর মানস-প্রবণতার প্রমাণ দিলেও ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন কিনা সে প্রশ্ন জাগতে পারে।

কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী একটি রাজকন্যার নিষ্ঠুর ও করুণ মৃত্যুর কাহিনীই শুধু নয়; এর মধ্যে যেন সমগ্র মেবারের পতনের ছায়াপাত ঘটেছে। এই ঘটনাটি এমন যাতে মেবারের শক্তিহীনতা ও দুর্ভাগ্যের চরম রূপ ধরে রাখা যায়। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে মেবারের ইতিহাসের এমন একটা যুগসন্ধি বেছে নিয়েছেন যেখানে তার পূর্ব গৌরব একটা স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত। মেবারের রাজশক্তি অর্থ ও সামর্থ্যের দিক থেকে ক্রমে এতদূর অধঃপতিত হয়েছিল যে রাজ্যকে বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে বিপন্মুক্ত করতে স্বয়ং রাজাকে নিরপরাধ কন্যার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শক্তাবৎ-চন্দাবৎদের কলহ, সেই কলহ দমনার্থে মারাঠাদের আহ্বান, মহারাষ্ট্রীয়দের রাক্ষসী ক্ষুধায় প্রভূত অর্থসম্পদের অঞ্জলিপ্রদান—এই সব রাজনৈতিক ঘটনার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে মেবার মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল। অল্প কিছুকাল

পরে ইংরেজ রাজশক্তির কাছে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে মেবারী ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের উপরে যবনিকা পড়ল। যুগসন্ধির সব বেদনা, অসহায়তা, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা একটা ধ্বংসমুখী জাতির অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস এবং বর্তমান নীচতার চরমে নেমে গিয়ে আর্তনাদ কৃষ্ণ-কুমারীর কাহিনীর চারপাশে মহাকালের রুদ্র নৃত্যকে যেন বেঁধে রেখেছে। একটি রাজকন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে উত্থিত ধূলিজালে সারা দেশের এবং জাতির একটি মহাযুগ পরিবর্তনের অস্থিরতা ধরা পড়েছে। মধুসূদনের এক আঙ্গুল যখন একটি রাজকন্যার মৃত্যুর করুণ সুর বাজিয়েছে তখন তাঁর আর চার আঙ্গুলে পেছনের বহু তারে ঝঙ্কার উঠেছে, তাতে ইতিহাসের ব্যাপকতা —বিস্তৃতি, গাম্ভীর্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একেই ঐতিহাসিক রস বলেছেন। সে রসসৃজনে মধুসূদন সাফল্য লাভ করেছেন।

অবশ্য মনে রাখতে হবে এ সাফল্য প্রথম শ্রেণীর নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসে ঐতিহাসিক রস যেরূপ আবেগোদ্বেল ও তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে, ব্যাপকতা ও গভীরতার সেই পর্যায়ে কৃষ্ণকুমারী পৌঁছতে পারে নি।

পাঁচ। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের পরবর্তী লেখকদের সঙ্গে মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত তুলনা করা যেতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলিতে ইতিহাসের ঘটনা একান্ত গৌণ, সেখানে কাল্পনিক কাহিনীটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকগুলির মাধ্যমে স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকেও জাতীয়তাবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।[২৩] মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীতেই প্রথম জাতীয়তাবাদের এই সুরটি আত্মপ্রকাশ করে। রাজা ভীমসিংহ দেশের দুর্দশা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন,

> "এ ভারত ভূমির কি আর সে শ্রী আছে। এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলে, আমরা যে মনুষ্য কোনমতেই ত এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবনাম্বু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ-করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এদেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ্ হতে কখন অব্যাহতি পাবো?" —(দ্বিতীয়াঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় কৃষ্ণকুমারীর স্থানটি সুচিহ্নিত।

॥ পাঁচ ॥

কৃষ্ণকুমারীর নাট্যগঠনে নিপুণতার পরিচয় আছে। টডকে অনুসরণ করায় সমস্যা দেখা দিতে পারত, ইতিহাস-ঘটনার মধ্যে গল্পসূত্র হারিয়ে যাবারই ছিল বেশি সম্ভাবনা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মেবারপতন, রাণা প্রতাপ প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত নাটকে গল্পগঠনের এই জাতীয় ত্রুটিই দেখা গিয়েছে। মধুসূদন কি কৌশলে এই সমস্যার সফল সমাধান করেছেন তা পূর্ব অনুচ্ছেদে দেখেছি। প্রথমত, মদনিকা-ধনদাস-বিলাসবতীর প্রসঙ্গটি নিয়ে এসে বিচিত্র মানবিক প্রবৃত্তির সংযোগ, দ্বিতীয়ত, মদনিকার চেষ্টায় মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর ভালবাসার উদ্ভব নাটকটিকে হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র তরঙ্গে উদ্বেল করে তুলেছে। ইতিহাস-ঘটনাকে বিকৃত না করে, একান্ত স্বাভাবিক কল্পনার সাহায্যে তিনি এই সব মানবিক প্রসঙ্গের স্থান দিয়েছেন নাট্যমধ্যে। ফলে নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় পরিণত না হয়ে বৃত্তাকার কাহিনীর রূপ পেয়েছে।

মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীকে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে স্থাপন করলেও প্রত্যক্ষ পরিবারজীবন এবং ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অথচ এটি একটি পারিবারিক বিপর্যয় ও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা-বেদনার কাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকে নি। উদয়পুর এবং অম্বর এই দুটি নগরই আলোচ্য নাটকের অকুস্থল। উদয়পুরে সংঘটিত কাহিনীতে রাজনৈতিক দুর্দৈব এবং রাজান্তঃপুরের ঘটনা চমৎকার সমন্বিত হয়েছে। অম্বরের ঘটনায় ব্যক্তিগত লোভ ও কামবাসনার প্রাধান্য। কিন্তু মানসিংহ তথা উদয়পুরের বিরুদ্ধে অভিযানের সংকল্পে এই নগরের একপ্রান্তও দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংঘর্ষের দিকে উন্মুক্ত।

জগৎসিংহের প্রতিপক্ষ মানসিংহ কাহিনীতে অনুপস্থিত। কিন্তু তার উপস্থিতি প্রতিমুহূর্তে নাট্যমধ্যে অনুভব করা যায়। প্রত্যক্ষত নাট্যঘটনার দ্বন্দ্ব জগৎসিংহ এবং মানসিংহের মধ্যে। অথচ মানসিংহের উল্লেখমাত্র ভূমিকালিপিতে নেই। মধুসূদন মানসিংহকে উপস্থিত না করেও যে কৌশলে দ্বন্দ্বের তীব্রতাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তা উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। নাটকের প্রথম দৃশ্য থেকেই মানসিংহের প্রসঙ্গ এসেছে, জগৎসিংহের কটূক্তিতে তার প্রতি শত্রুভাব পোষণ করা হয়েছে। ["বটে বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র একথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না

দিয়ে ক্ষান্ত হব না।"] মদনিকা কৌশলে কৃষ্ণকুমারীর মনে মানসিংহের প্রতি প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করে তুলেছে। মানসিংহের দূতের সঙ্গে তো ধনদাসের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ (কথার যুদ্ধ) হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত জগৎসিংহ বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে, মানসিংহের জ্ঞাতিশত্রু ধনকুলসিংহকে মরুদেশের প্রকৃত রাজা বলে ঘোষণা করেছে। মানসিংহ রঙ্গমঞ্চে একবারও পদার্পণ না করে নাট্যদ্বন্দ্বের এক প্রান্ত ধরে রেখেছে।

মহারাষ্ট্র সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাৎও এই নাটকে একবারও পাই না। কিন্তু এর রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পটভূমিতে মারাঠী হানাদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মারাঠী আক্রমণের বিপদ, তাদের লুণ্ঠন, অর্থদোহন, এমন কি রাণার পারিবারিক প্রশ্নে হস্তক্ষেপ (কৃষ্ণকুমারীকে মানসিংহের সঙ্গে বিবাহ দেবার আদেশ) কখনও ভীমসিংহাদির সংলাপে, কখনও মারাঠী দূতেদের আগমনসংবাদের মাধ্যমে পরোক্ষত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাদের ভূমিকার তীব্রতা সর্বদাই অনুভব করা যায়।

টডকথিত কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী আদৌ "barren of incidents" নয়। মধুসূদন ঘটনার কলকোলাহলকে প্রান্তে রেখেছেন। ঘটনার একমাত্র একটি দিকের প্রত্যক্ষ স্থান লাভ ঘটেছে মঞ্চে। জয়পুরের রাজা সৈন্যসজ্জা করেছে; এই একটি দিকের সোজাসুজি পরিচয় দিয়ে অপরাপর ঘটনাসূত্রগুলির সম্ভাব্যচিত্র কল্পনা করে নেবার সুযোগ করে দিয়েছেন লেখক, বারবার তাদের সামনে এনে পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হন নি। জয়পুরকেও আবার শুধুমাত্র ঘটনাকেন্দ্র হিসেবে দেখান হয় নি, চিত্তোদ্বেলতার একটি প্রধান উৎসরূপে তাকে অঙ্কিত করেছেন নাট্যকার। দুটি অঙ্কে এই জয়পুর নগরীর স্থান। অপর তিনটি অঙ্কে মেবার তার হৃদয়ক্ষত নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটিয়েছে এবং শেষ অঙ্কে নিষ্ঠুরতা-বেদন-বিমূঢ়তায় শ্বাসরুদ্ধকর স্তব্ধতা এনেছে।

নাটকের প্রথম অঙ্কের দৃশ্য দুটির ঘটনাস্থল জয়পুর। দুটি দৃশ্য একই দিনের ঘটনা। রাজা ঐ দিনেই কিছুমাত্র দেরী না করে ধনদাসকে উদয়পুর যাত্রা করতে বলেছেন। স্থান ও কালগত এই ঐক্য অঙ্কটির আবেদন সংহত করেছে। প্রথম দৃশ্যেই কিছুমাত্র ভণিতা না করে সরাসরি নাট্যসমস্যার অন্তরে প্রবেশ করেছেন মধুসূদন। ধনদাস কৃষ্ণার ছবি দেখিয়ে জগৎসিংহকে

বিচলিত করেছে এবং বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে ধনদাস উদয়পুরে প্রেরিত হয়েছে। পরবর্তী দৃশ্যে বিলাসবতী-ধনদাস-মদনিকা সংবাদ এবং ধনদাসের উদ্দেশ্য বিনষ্ট করবার জন্য মদনিকার উদয়পুরযাত্রা। নাটকটির প্রথম অঙ্ক লালসা, ধনলোভ, প্রেম ও ঈর্ষায় তরঙ্গিত হতে হতে জয়পুর থেকে উদয়পুরে যাত্রা করেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাস্থল উদয়পুর। কালগত ঐক্য স্পষ্ট নির্দেশিত না হলেও অনুভব করা যায়। তিনটি দৃশ্য একই দিনের ঘটনা অথবা খুব নিকটবর্তী কালের এরূপ মনে করায় বাধা নেই। প্রথম দৃশ্যে রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জর উদয়পুর রাজপরিবারের চিত্র অঙ্কিত; বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার বিবাহচিন্তায় ভীমসিংহ ও অহল্যা ক্লিষ্ট, কিছু শঙ্কিতও। তাদের শঙ্কায় যেন বহু দূরাগত সর্বনাশের অস্পষ্ট ছায়াপাত। জয়পুরের দূতের আগমন সংবাদে বেশ নাটকীয় কৌশলের সঙ্গেই পূর্ব অঙ্কের সঙ্গে এই অঙ্কের যোগসূত্র রচিত হয়েছে। এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে জগৎসিংহ-কৃষ্ণার সম্বন্ধ বন্ধনে ধনদাসেব চেষ্টা এবং রাজার চরিত্রদোষ ঢাকার উদ্দেশ্যে মন্ত্রী ও ছদ্মবেশী মদনিকার সঙ্গে তাব বাক্যালাপ। তৃতীয় দৃশ্যে মদনিকার চেষ্টায় কৃষ্ণার মনে মানসিংহ সম্বন্ধে আকর্ষণের জন্ম হয়েছে। ঘটনাচক্রে মানসিংহের দূতের আগমন সংবাদও এই দৃশ্যেই পাওয়া গেল। দ্বিতীয় অঙ্কে তীব্র নাট্যদ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। কিন্তু দূর থেকে তার দামামাধ্বনি শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথম দৃশ্যে ভীমসিংহের উক্তি স্মরণযোগ্য। নাট্যকার কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে তীব্র দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে তুলবার সব উপকরণ সন্নিবিষ্ট করেছেন এই অঙ্কে।

তৃতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেরই ঘটনাস্থল উদয়পুর। ঘটনা প্রচুর না হলেও তার দ্রুততাল অনুভব কবা যায়। প্রথম দৃশ্যে জয়পুর ও মরুদেশের দূতেদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে তীব্র দ্বন্দ্বের ভূমিকা রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মহারাষ্ট্রাধিপতি মানসিংহের পক্ষ নেওয়ায় সত্যকার বিপদ ঘনীভূত রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই দৃশ্যেই আবার কৃষ্ণার পদ্মিনী দর্শন লাভে একটা গুরুতর সর্বনাশের দ্যোতনা এসেছে। এই দৃশ্যটিকে নাটকের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য বলে চিহ্নিত করতে হয়। সংঘাত এখানে একটা চরম পর্যায়ে উঠেছে। উপায়হীন বিমূঢ়তা নিশ্চিতভাবে ভীমসিংহের আচরণে ও ভাবনায় প্রকট হয়েছে। পদ্মিনীর ছায়ামূর্তি কৃষ্ণার মৃত্যুরও ব্যঞ্জনা এনেছে। Climax-য়ের কিছু লক্ষণ এখানে আছে।[২৪] তৃতীয় দৃশ্যে মহারাষ্ট্রীয় বিপদের

পটভূমিটি প্রথমেই চিত্রিত হয়েছে বলেন্দ্রের উক্তিতে, কিন্তু সৈনিকদের কথোপকথন ঘটনার গতিকে অনেকটা প্রশমিত করেছে। প্রত্যাখ্যাত ধনদাস কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চায় নি। নাট্যদ্বন্দ্বের এই পর্যায়ে দৃশ্যটির বিবর্ণতা প্রশংসনীয় নয়।

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যই জয়পুরে ঘটেছে। কিন্তু এর প্রথম দৃশ্যটি অপর দুটি দৃশ্যের কয়েকদিন পূর্ববর্তী। শেষ দুটি দৃশ্যে কালগত ঘনিষ্ঠতা আছে। তখন নৃপতির যুদ্ধযাত্রা। কিন্তু প্রথম দৃশ্যে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত ও যাত্রার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুকাল প্রস্তুতিতে কেটেছে। এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রত্যাখ্যানের সংবাদ পেয়ে উত্তেজিত জগৎসিংহ যুদ্ধপ্রস্তুতির আদেশ দিয়েছে। মূল নাট্যকাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক যতটা অচ্ছেদ্য অপর দুই দৃশ্য ততটা ঘনিষ্ঠ নয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে ধনদাসের চক্রান্তভেদ, তৃতীয় দৃশ্যে রাজার বিরহে বিলাসবতীর কাতরতা চিত্রিত। বিলাসবতী-মদনিকা-ধনদাসের পূর্বপ্রসঙ্গ তাদের চরিত্র সম্পর্কে যে কৌতূহল জাগায় তা নিবারণের কিঞ্চিৎ দায়িত্ব নাট্যকার এখানে বহন করেছেন। কৃষ্ণার কাহিনীর দিক থেকে এই দৃশ্য দুটির কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। ক্লাসিক আদর্শে এরা পরিহার্য হলেও রোমান্টিক নাটকে কাহিনীর শাখা বিস্তারের এ জাতীয় চেষ্টা সর্বদা নিন্দিত হয় না। মধুসূদন হয়তো কৃষ্ণার কাহিনীর রুদ্ধশ্বাস গুরুভারের মধ্যে কিঞ্চিৎ মানস বিশ্রামের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন এখানে।

পঞ্চম অঙ্কে আমরা আবার উদয়পুরে ফিরে এসেছি। এই অঙ্কে ঘটনার আলোড়ন যেমন তীব্র, বেদনা তেমনি উচ্চকণ্ঠ। প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণাকে হত্যা করে বিপন্মুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বলেন্দ্রসিংহ কৃষ্ণা-হত্যায় নিযুক্ত হয়েছে। এই দুটি দৃশ্যকে একটি দৃশ্যে সম্বদ্ধ করা যেত না কি? এখানে কিন্তু দুটি দৃশ্যেরই প্রয়োজন ছিল। প্রস্তাবটি এতই সাংঘাতিক যে শোনামাত্র ভীমসিংহের পক্ষে তা কার্যকর করবার সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব ছিল না। এই ভাবনার অবকাশ করে দিয়েছে এই দৃশ্যবিভাগ। পাঠক-দর্শক এই দুই দৃশ্যের মধ্যের ব্যবধানটি আপন কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করে নিতে পারে। ভীমসিংহ-বলেন্দ্রের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ এবং নিরুপায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। পঞ্চমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কৃষ্ণা-হত্যার জন্য বলেন্দ্রের ব্যর্থ চেষ্টা, অবশেষে কৃষ্ণার আত্মহনন। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে, ঘটনার আকস্মিকতায়, বেদনার তীব্রতায় নাট্যরস এই দৃশ্যে চরমে পৌঁছেছে।

এবারে কয়েকটি নাট্যকৌশলের পরিচয় নেওয়া যাক। মুহুর্মুহু এই জাতীয় কৌশলের প্রয়োগে কৃষ্ণকুমারীর নাট্যরস সার্থকতা লাভ করেছে।

এক। আরম্ভটি একান্ত নাটকীয়। দীর্ঘ স্বগতোক্তি দিয়ে শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীর পট উঠেছে। কৃষ্ণকুমারীতে কিন্তু নাট্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সচকিত হয়ে উঠি। "আঃ কি আপদ!" প্রভৃতি বলতে বলতে রাজা এবং পত্রাদি হস্তে পশ্চাদানুসরণ করে মন্ত্রীর প্রবেশ দর্শকদের কৌতূহলী করে তোলে।

দুই। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাণী অহল্যাদেবী রূপবতী কন্যার বিবাহের কথা ভেবে হঠাৎ বলেছে, "তোমার পূর্ব্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হলে?" রাণী তখন না জেনেই নিজের কন্যার মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলে ফেলেছে।

কৃষ্ণার বিবাহ সম্ভাবনায় আসন্ন কন্যাবিরহের কথা ভেবে অহল্যা কেঁদে উঠেছে (২।৩)। এই কান্নার পেছনে নিয়তির হাস্য অনুভব করা যায়। কন্যার বিবাহে নয়, নৃশংস মৃত্যুতে অনেক গভীর ক্রন্দন তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

তিন। জয়পুর এবং মরুদেশের রাজদূতের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে আগমনের সংবাদ দুটি দৃশ্যে (২।১, ২।৩) বেশ নাটকীয়ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। রাজা দুন্দুভিধ্বনি শুনে যখন পরমশত্রু মহারাষ্ট্রপতির দূতের জন্য আশঙ্কা করছিলেন তখন তাঁর পরমমিত্র জগৎসিংহের দূতের আগমন ঘটল। কিন্তু এই মৈত্রীদৌত্যের মধ্যেই যে নিয়তি তাঁর জীবনের চরমতম যন্ত্রণার বীজ লুকিয়ে রেখেছিলেন তা মেবার নৃপতির অজ্ঞাত ছিল। তাঁর নিশ্চিন্ততার দীর্ঘশ্বাসের ("আঃ রক্ষা হোক!") পেছনে স্তম্ভিত বিপদের অস্তিত্ব পাঠক অনুভব না করে পারে না। এর নাট্যরস সেখানেই। আবার জগৎসিংহ-কৃষ্ণার বিবাহ স্থির করে মাতাপিতা যখন আসন্ন কন্যাবিরহে কাতর ঠিক তখনই মানসিংহের দূতের আগমন সংবাদ সেই পারিবারিক মিলন মুহূর্ত্তটির উপরে যবনিকা টেনেছে। ঘটনাসংস্থানের এই সব বহুসংখ্যক ছোটখাট নিপুণতা মধুসূদনের সচেতন নাট্যচেতনার পরিচয় বহন করছে। এই দৃশ্যেই মানসিংহের দূতের আগমন সংবাদে কৃষ্ণা উৎসাহিত হয়ে উঠেছে, আর এই ঘটনার সূত্র ধরেই ভাগ্যদেবী অন্তরালে বসে তার নিষ্ঠুর মৃত্যুর জাল রচনা করেছেন।

চার। পদ্মিনীর ছায়ামূর্তি দর্শন এবং বাণী শ্রবণ (কৃষ্ণা মাত্র তা দেখেছে এবং শুনেছে, মঞ্চের অন্যান্য পাত্রপাত্রী বা দর্শকসমাজের কাছে তা অদৃষ্ট এবং

অশ্রুত) ঈষৎ অলৌকিকতা এবং কিঞ্চিৎ মনস্তত্ত্বের সংযোগে নাট্যরস বিস্তার করেছে।

পাঁচ। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণার হত্যার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাবটির উপস্থাপন উচ্চ নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। একটি চিঠি মাত্র হাজির করা হয়েছে। লিখিত বিষয়বস্তু পাঠক-দর্শকের-কাছ থেকে দৃশ্যের প্রায় শেষ পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। অথচ এই চিঠিটিকে কেন্দ্র করে অনেক বিমূঢ় আর্তনাদ ও মর্মভেদী যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। একটা না-জানা ভীতির সঙ্গে তীব্র কৌতূহল যুক্ত হয়ে একে আস্বাদ্য করে তুলেছে।

ছয়। নাটকের শেষ দৃশ্যটি বিচিত্র নাট্যকৌশলের সমন্বয়ে ধন্য। দৃশ্যারম্ভে স্বপ্ন দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাণী কৃষ্ণাকে ব্যাকুলভাবে অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছে। প্রকৃত বিপদ সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। এইভাবেই আগতপ্রায় সর্বনাশের ভূমিকা রচিত হয়েছে। শয়নগৃহে প্রবেশ করে কৃষ্ণা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিকে তাকিয়েছে, বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির সর্বনাশা রূপ সেই অজানা আশঙ্কার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। অবশেষে বলেন্দ্রসিংহ অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করেছে, কিন্তু কৃষ্ণকুমারীকে দেখে সে অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। এর ফলে ঘটনার গতি কোনমুখে যাবে পাঠক-দর্শক তা সঠিক অনুধাবন করতে পারে না। কিছুটা নিশ্চিন্ততা বোধ করে, কিন্তু কৃষ্ণার নিরাপত্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিতও হয় না। এমন সময়ে কৃষ্ণার আত্মহননে অনিবার্যতা এবং আকস্মিকতার মিশ্রণে নাট্যরস উদ্বেল হয়ে ওঠে।

॥ ছয় ॥

চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে কৃষ্ণকুমারী থেকে সমৃদ্ধতর নাটক বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। এ নাটকে বৃহত্তর ইতিহাসের কল্লোল ধ্বনিত হলেও অতি স্বল্পসংখ্যক পাত্রপাত্রীর সাহায্যেই কবি তা অনায়াসে সম্ভব করে তুলেছেন। কি কৌশলে এই অসাধ্যপ্রায় ঘটনা সাধিত হয়েছে নাট্যগঠন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তার আলোচনা করেছি।

ভীমসিংহ এ নাটকের প্রধান চরিত্র; অবশ্য নাট্যঘটনার গতি তাঁর দ্বারা সামান্যই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। জগৎসিংহের বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার আদেশ দেওয়া ছাড়া তাঁর সক্রিয়তার পরিচয় নাটকে বড় নেই। এ দুটি ক্ষেত্রেও তাঁকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছে। মহারাষ্ট্রপতির নির্দেশ মেনে নিয়ে শক্তিহীন মেবারপতি জগৎসিংহের

প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল অম্বরপতিকেই বরণ করা। কৃষ্ণকুমারীর হত্যার আদেশও উপায়হীন ভাবেই তাঁকে দিতে হয়েছে। এই পরামর্শও বাইরে থেকে এসেছে। ভীমসিংহ প্রধানত নিষ্ক্রিয়, যখন তিনি সক্রিয়তা দেখিয়েছেন তখনও অপরের নির্দেশ মেনে আপন স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে যেতে হয়েছে। তীব্র সংঘাতের মধ্য দিয়ে অনিবার্য বিরুদ্ধের কাছে মাথা অবনত করার মধ্যেও এক ধরনের কর্মশীলতার পরিচয় থাকে, ভীমসিংহ তা থেকেও বঞ্চিত। ঘটনার স্রোতকে ভীমসিংহ নিয়ন্ত্রিত করেন নি, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও বড় করেন নি।

এই নাটকের ঘটনার রথরজ্জু ধরে আছেন স্বয়ং মহাকাল। মঞ্চের নেপথ্য থেকে মহারাষ্ট্রপতি এবং পাঠান সর্দার আমীর খাঁ সেই ঐতিহাসিক নিয়তিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে। অনুপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিংহেরও কিছু ভূমিকা আছে। নাট্যকাহিনীতে ঘটনানিয়ন্ত্রণকারী সক্রিয়তা দেখেছি ধনদাস-মদনিকার চরিত্রে। মদনিকার ক্ষেত্রে তা ইতিহাসের প্রান্তে দাঁড়িয়ে, নাটকের ব্যক্তিগত অংশটুকুর উপরেই অধিকার বিস্তার করেছে। ধনদাস ব্যক্তিগত অংশের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস পর্যন্ত আপন সক্রিয়তার প্রভাব ফেলেছে। জগৎসিংহের রণসজ্জায়ও প্রবল সক্রিয়তা পরিস্ফুট। কিন্তু নিয়ন্ত্রী শক্তি যাদের হাতে তারা মঞ্চান্তরালে থেকেছে, এবং সেই সব রাজনৈতিক শক্তির পেছনে মধুসূদন অজ্ঞাত নিয়তির প্রভাব অনুভব করেছেন।

নাটক বা উপন্যাসের নায়ক বলে আমরা সচরাচর সেই ব্যক্তিকেই চিহ্নিত করি—(১) যার সক্রিয়তা সর্বাধিক, এবং (২) যার বেদনাভোগ তীব্রতম। সক্রিয়তার প্রশ্নে ভীমসিংহ এ নাটকের নায়কের আসন দাবি করতে পারেন না। কিন্তু এ নাটকে তাঁর চিত্তের বেদনাহত রূপটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ জাতীয় নায়কচরিত্র নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে দুর্লভ নয়। সেক্‌সপীয়রের কিং লিয়র চরিত্রটি কর্মশীলতার গুণে ঐ পদবী দাবি করে না, হৃদয়লোকের সর্বাধিক আলোড়নের জন্যই মুখ্য পাত্ররূপে অভিহিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান রুগ্ন, পঙ্গু, এবং নাটকের শেষ অংশে আগ্রাদুর্গের একটি ঘরে বন্দী। কিন্তু সে-ই এ নাটকের নায়ক, ঘটনাস্রোতের নিয়ন্তা ঔরঙ্গজীব প্রতিনায়ক মাত্র। কারণ ঔরঙ্গজীব নয়, সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অবক্ষয়ের তীব্রতার উপরেই নাট্যকার আলোক-সম্পাত করতে চেয়েছেন।

ভীমসিংহকেই কৃষ্ণকুমারী ট্রাজেডির নায়ক করতে চেয়েছেন মধুসূদন। সম্ভবত সমকালের সৃষ্টি রাবণের চরিত্রের আদলে ভীমসিংহকে গড়ে তুলবার ইচ্ছা কবির ছিল। কিন্তু চরিত্র দুটি গোড়ায়ই পৃথক হয়ে পড়েছে। ভাগ্যাহত ভীমসিংহের জন্য কবি করুণাবোধ করেছেন, কিন্তু রাবণের মধ্যে কবি আপন আত্মার প্রতিফলন দেখেছেন, ভীমসিংহের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু ঘটার সুযোগ ছিল না। লঙ্কাপুরীর নিত্য অবক্ষয়ে রাবণের ক্রন্দনের ছবি বার বার আঁকা হয়েছে। কিন্তু রাবণের বীর্যবন্ত মূর্তি বেদনার অশ্রুর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র রামের সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যেই নয় (৭ম সর্গ), বীরবাহু বা মেঘনাদের মৃত্যুতে যখন রাবণ আসন্ন চরম সর্বনাশ নিশ্চিত বলে অনুভব করেছে তখনও রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয় নি। ভীমসিংহ যুদ্ধ করেন নি, মাথা নিচু করে ভাগ্যের অভিশাপ মেনে নিয়েছেন তিনি, দুঃখ করেছেন, দুঃখকে অনিবার্য বলে জেনেছেন, আপন শক্তির সীমাকে অতিক্রমের চেষ্টাও করেন নি। ভীমসিংহের সঙ্গে রাবণের তুলনা হয় না। রাবণ নিজ ধ্বংসের কারণ সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে নিয়তির অজ্ঞাত রহস্য সম্পর্কে বিমূঢ় প্রশ্ন তুলেছে। ভীমসিংহের চরিত্রে বেদনাবোধ যতই তীব্র হোক বিশ্ব-জিজ্ঞাসাকে তা গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে নি।

ভীমসিংহ আসলে দুর্বল চরিত্রের লোক। এই দুর্বলতার জন্য হয়ত তাঁর রাজনৈতিক পরিবেশ অনেকখানি দায়ী। কিন্তু কারণ যা-ই হোক না কেন দুর্বলতা তাঁর ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তাঁকে প্রশান্ত বলে মনে করবার কারণ নেই, গভীর ও অচ্ছেদ্য বিষণ্নতা তাঁর মন পূর্ণ করে রেখেছে। প্রশান্তির অন্তরালে যে ব্যথা তরঙ্গিত তা বার বার প্রকাশ পেয়েছে। ভীমসিংহে স্বদেশপ্রাণতা ছিল। তাঁর বেদনাক্ষুব্ধতার কারণ স্বদেশের দুর্দশা; বিশেষ করে মেবারের অতীত গৌরবের স্মৃতি এবং বর্তমান শক্তিহীনতা এই দুঃখকে বাড়িয়েছে।

অতীতের গৌরবের স্মৃতি ট্রাজেডির মাহাত্ম্যের স্পর্শ এনেছে তাঁর চরিত্রে, কিন্তু সক্রিয় প্রতিরোধের একান্ত অভাব, প্রথমাবধি নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ ভীমসিংহকে খাঁটি ট্রাজিক চরিত্রে পরিণত হতে বাধা দিয়েছে।

ভীমসিংহের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ ছিল। মধুসূদন সে দিকে খুব গুরুত্ব দেন নি। ভীমসিংহের স্বদেশপ্রাণতা এবং অতীত গৌরবের জন্য কিঞ্চিৎ শ্লাঘা প্রতি মুহূর্তেই মারাঠাদের দ্বারা আহত হচ্ছিল। কিন্তু শক্তিহীন নৃপতি কোনরূপ প্রতিরোধের কথা ভাবতেও পারেন নি, ঘুষের বালির বাঁধ দিয়ে

লোভীকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ ছিল এখানেই। কিন্তু দু-একবার হা-হুতাশ করা ছাড়া তা ব্যক্ত হয় নি। ভীমসিংহের চরিত্রের মানবিক বৃত্তিগুলির কেন্দ্রটি হল কৃষ্ণকুমারীর প্রতি বাৎসল্য। রাজনৈতিক চক্রাবর্তে বিপর্যস্ত নৃপতি প্রিয়তম কন্যার প্রতি নীরব অবহেলাই প্রকাশ করেছেন নাটকের প্রথম দিকে। এর ফলে যে অন্তর্গূঢ় বেদনাকেন্দ্র তৈরী হয়েছে তাঁর মনে, কবি তাকে উচ্চকণ্ঠ না দিলেও পাঠকের মনে তার ব্যঞ্জনা প্রভাব বিস্তার করে। কৃষ্ণকুমারীকে বিনা দোষে হত্যা করে রাজ্যকে সাময়িকভাবে বিপন্মুক্ত করবার প্রস্তাব যখন এল তখন যে দ্বন্দ্ব তাঁর মনুষ্যত্বকে প্রবলভাবে আলোড়িত করতে লাগল তার চিত্র কবি প্রকাশ করেছেন। সন্তানস্নেহ ও মনুষ্যত্ব, রাজ্যরক্ষার চিন্তা ও শক্তিহীনতার মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব স্বল্পস্থায়ী হলেও, আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। ঘটনার এই চরম পর্যায়কে অন্তর্দ্বন্দ্বে চিহ্নিত না করলে চরিত্রের স্বাভাবিকতায় প্রশ্ন তুলতে হত। কিন্তু ভীমসিংহের চরিত্রে প্রথম থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাবার সুযোগ ছিল, এই মুহূর্তটি তারই climax হিসেবে উপস্থিত হলে সার্থকতর হত। দ্বিতীয়ত ভীমসিংহের দুর্বলতা এবং ব্যক্তিত্বের অভাব এতই বেশি যে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ নিয়েও অন্তর্দ্বন্দ্ব যতটা তীব্র হতে পারত তা হয় নি।

বলেন্দ্রসিংহকে একটি দৃশ্যে কিছু লঘুতাকে প্রশ্রয় দিতে দেখেছি (তৃতীয়াঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)। মধুসূদন ভীমসিংহের পাশে বলেন্দ্রসিংহকে দাঁড করিয়ে তাদের চরিত্রের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। একই রাজনৈতিক পরিবেশে এঁদের অবস্থান। যে বিপর্যয় সারা মেবার জুড়ে কালো ছায়া ফেলেছে বলেন্দ্রসিংহের মন তার বাইরে নয়। কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে যে বিপদ দেখা দিয়েছে, বলেন্দ্রসিংহের মনের তটে তার সব দুঃখটুকুর আঘাত লেগেছে। তবুও ভীমসিংহের ও বলেন্দ্রসিংহের ব্যক্তিগত চরিত্রে পার্থক্য আছে। রাজা যেখানে মূর্তিমান বিষণ্ণতা এবং গাম্ভীর্য, বলেন্দ্রে সেখানে কৌতুক ও গম্ভীরের সমন্বয় ঘটেছে। বলেন্দ্রের হৃদয় আছে, দুঃখকর ঘটনায় সে তীব্রভাবেই আলোড়িত হয়। বলেন্দ্র দায়িত্বশীল, ভ্রাতৃভক্ত; রাজ্যের স্বার্থে, জ্যেষ্ঠের নির্দেশে নিষ্ঠুরতম কার্যেও প্রবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু সে হাসতে জানে। বলেন্দ্রের এ হাসি বিষণ্ণ মেবারের গুরুতর দায়িত্বের রাজ্য থেকে মানসিক পলায়নের দ্যোতক নয়, এ হাসিতেই তাঁর চিত্তের মুক্তি।

কৃষ্ণার হত্যার প্রস্তাব করে অজ্ঞাত সূত্র থেকে যখন চিঠিটি এল তখন রাজা দ্বিধা করেছেন কিন্তু বলেন্দ্র বিলম্বমাত্র না করে সেই নিষ্ঠুর প্রস্তাব বর্জনীয় বলে মত দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বলেন্দ্রকেই সেই নির্মম কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। ভাগ্য বলেন্দ্রকে নিয়েও নিষ্ঠুর পরিহাস করেছে। কৃষ্ণাকে হত্যা করতে রাজী হয়ে বলেন্দ্র যে মর্মযন্ত্রণা ভোগ করেছে তা অল্প কথায় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে কৃষ্ণার সামনে গিয়ে সে আত্মসংবরণে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে, অস্ত্র ছুড়ে ফেলেছে। কৃষ্ণা ঘুমিয়ে থাকলে বলেন্দ্রসিংহ সম্ভবত তাকে হত্যা করে যেত। জাগ্রত কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তা আর সম্ভব হল না। বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রের এই পরিচয় মনস্তত্ত্বসম্মত।

জগৎসিংহ চরিত্রকল্পনায় সংস্কৃত নায়কচরিত্রের কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবির পূর্ববর্তী পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটিতে নায়কের আসনে বসেছে যারা জগৎসিংহের সঙ্গে তাদের চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যযাতি-ইন্দ্রনীল নায়ক চরিত্র, জগৎসিংহ এই নাটকের নায়ক নয়। যযাতি চরিত্রের কামুকতা তাই অসঙ্গত নয়, দোষাবহ নয়—ঐরূপ হওয়াই যেন স্বাভাবিক। জগৎসিংহে মধুসূদন সংস্কৃত নাট্যকল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবতার মাটিতে পা দিয়েছেন। কামুক জগৎসিংহ এ নাটকের নায়ক নয়, তার বেশ্যাপোষণ, রাজকীয় কর্তব্যে অনীহা, অক্লান্ত ভ্রমরবৃত্তি সংস্কৃত নাটকের মত একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয় নি, জনসমাজের নিন্দা আকর্ষণ করেছে।

জগৎসিংহের চরিত্রের প্রধানতম বৃত্তি এই কামলোলুপতা। সে প্রকাশ্যে জনৈক বারবণিতাকে রক্ষিতা হিসেবে পালন করেছে। জয়পুর নগরে তার ভোগ্য হয় নি এমন রমণী বিরল হয়ে পড়েছে। রাজকার্যে তার কিছুমাত্র মন নেই। মন্ত্রী রাজকীয় কর্তব্যের বোঝা বহন করে জগৎসিংহের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং রাজা মন্ত্রীর কাছ থেকে পালাবার পথ খুঁজছে—এই একটি চিত্রেই রাজা হিসেবে তার অন্তঃসারশূন্যতা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রী-সেনাপতিদের সাহচর্য থেকে ধনদাসের মত ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপই তার অধিক কাম্য। ধনদাসের সঙ্গে আলাপে এক ধরনের অসুস্থ রসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে মার্জিত ভাষা এবং বক্র ইঙ্গিত তাকে আভিজাত্য দিয়েছে।

জগৎসিংহ যে ভাবে ধনদাসের মত ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তাতে তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। অথবা ব্যক্তিত্ব এবং রাজকীয় বিচার-বুদ্ধিকে সে নিঃশেষ করে কামদেবতার পায়েই সঁপে দিয়েছিল। ধনদাসের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটনের কৌশলটিও মদনিকার পরিকল্পনা। উদয়পুর এবং মারবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণায়ও তার পৌরুষ এমন কিছু আত্মপ্রকাশ করে নি। ঘটনাচক্রে যে অপমানের বোঝা তার মাথায় চেপে বসেছে তাতে জগৎসিংহের পক্ষে যুদ্ধ না করে উপায় ছিল না। প্রবৃত্তি দ্বারাই জয়পুররাজ পরিচালিত। মন্ত্রীর পরামর্শ চিন্তার প্রতীক রূপে উপস্থিত; রণে কিংবা প্রেমে সর্বদাই তা অবহেলিত। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তার অবকাশ নেই, কৃষ্ণকুমারীকে পাবার জন্য জগৎসিংহ মত্ত হয়ে উঠল ধনদাসের পরামর্শে; ফলাফল ভেবে দেখবার ধৈর্য নেই—ভীমসিংহের প্রত্যাখ্যানে অপমানিত হয়ে অবিলম্বে সে মারাঠী-পাঠান-মারবারী এবং মেবারীদের বিরুদ্ধে অভিযানের সিদ্ধান্ত করল। লঘুচিত্ত, বিলাসী, প্রবৃত্তিবশ নৃপতির এই সব আচরণই একান্ত সুসঙ্গত।

জগৎসিংহের বিলাসবতীর প্রতি ব্যবহারেও লঘু ইন্দ্রিয়ালুতা প্রকাশিত। তবে যুদ্ধযাত্রাকালে একটিমাত্র কথায় তার হৃদয়ের স্পর্শ গভীরতার ব্যঞ্জনা এনেছে।—"দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, এক একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।"

ধনদাসের চরিত্র প্রসঙ্গে মধুসূদনের নিজের মন্তব্য,—

"As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even it I could invent it—which I gravely doubt! ···Dhanadass is an ordinary rogue,···"

ধনদাসের চরিত্রে জটিলতা নেই, তার শয়তানী অপকৌশলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে তার উৎসের সন্ধান কবি করেন নি। সোজাসুজিই তাকে একটা সাধারণ স্তরের শয়তান চরিত্র বলে অভিহিত করেছেন।

তার চরিত্রে তিনটি লক্ষণ প্রবল, অর্থলোভ, কামুকতা এবং চাতুর্য। অর্থলোভ তার জীবনের লক্ষ্য, চাতুয সেই লক্ষ্যভেদের পথ। কামবাসনার চরিতার্থতা যদি একই আয়াসে পথিমধ্যে পাওয়া যায় (by product হিসেবে)

তবেই সে উৎসাহী। বিলাসবতীর প্রতি তার লোভ আছে, কিন্তু তা কখনই তার জীবনে প্রধান হয়ে ওঠে নি। রাজার কাছ থেকে কৌশলে অর্থসম্পদ লাভের জন্য সে দীর্ঘকাল সেই বাসনা হৃদয়ে গোপন রেখেছে। রাজার কাছ থেকে পুরস্কারের লোভে গৃহস্থ কন্যাকে বারবণিতায় পরিণত করেছে। রাজা যুদ্ধযাত্রা করলে সে সুযোগ পেয়ে বিলাসবতীর কাছে তার মনের কথা বলেছে। তখনও বিলাসবতীর গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করবার ফন্দী এঁটেছে। বিবেক নামক পদার্থটিকে সে সম্পূর্ণই বিসর্জন দিয়েছে। নিজের মনের মত একটা যুক্তিক্রমও দাঁড় করিয়েছে। তার স্বগতোক্তিতে অন্তরলোকের সেই ভাবনার পরিচয় আছে—"আমরাও রাজ-অনুচর; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তা এই ত চাই! আরে, একালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে? কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়; কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয়; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয়, আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাঁধিয়ে দিতে হয়; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ যেমন করে হোক, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ? হুঁ! তার মন ত বেশ্যার দ্বার বল্লেই হয়! কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ করতে পারে।"

ধনদাস যে-পরিমাণ ধূর্ত বলে পরিচিত, ততটা চাতুর্য প্রকাশ করতে পারে নি। মদনিকার কাছে তার প্রতিটি চাল বিপর্যস্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার দীর্ঘকালের মুখোশ মদনিকাই রাজার সামনে খুলে ধরেছে। ধনদাস কঠিন শাস্তি পেয়েছে। তার অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে। লক্ষ্য থেকে নির্মমভাবে ভ্রষ্ট হওয়ায় গোটা জীবনটাই তার পক্ষে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে চরিত্রে পরিবর্তন ঘটা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অসঙ্গত নয়। কিন্তু ধনদাসের চরিত্রের যে পরিবর্তন কবি চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দেখিয়েছেন তা পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন জাগায়।

এক। ধনদাসের চরিত্রের এই পরিবর্তনের সঙ্গে নাট্যকাহিনীর সম্পর্ক নেই।

দুই। এই পরিবর্তন-সম্ভাবনার কোন পূর্ব ইঙ্গিত নেই। এর আকস্মিকতা তাই নীতি-উপদেশের মত মনে হয়।

তিন। ধনদাসের এ পরিবর্তন সাময়িক নয় এমন কথা নাট্যকার বলেন

নি। সাম্প্রতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পেলে সে তার শয়তানী স্বরূপে ফিরে যাবে না এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

তবে মদনিকার চরিত্রের গভীরে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের দিক থেকে এই পরিস্থিতির তাৎপর্য আছে।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের মন্ত্রীরা সাধারণত গোবেচারা ভালোমানুষ জাতের। কিছু উপদেশাত্মক বাণীবর্ষণই তাদের প্রধানতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। তাদের চরিত্রে প্রায়ই নিষ্ক্রিয়তা প্রধান। হৃদয়বৃত্তির আলোড়নেও তারা আদৌ পীড়িত নয়। তাদের বিবর্ণতা এতই সর্বব্যাপক যে একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলে তারা গণ্য হতে পারে।

ভীমসিংহের মন্ত্রী সত্যদাস এবং জগৎসিংহের মন্ত্রী এই একই শ্রেণীর মানুষ। এদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যেন এক মানুষই ভিন্ন নামে দুই রাজ্যে মন্ত্রিত্ব করে যাচ্ছে। সত্যদাসের নির্বিরোধী চিন্তা চরম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, এমন কি রাজকন্যার প্রাণের মূল্যেও তা ক্রোধে ফেটে পড়বার অবকাশ পায় নি। কৃষ্ণা-হত্যার মত গুরুতর ব্যাপারেও সত্যদাসেব যথেষ্ট মনোবেদনা লক্ষিত হয় না। জয়পুরের মন্ত্রীও হৃদয়কে সরিয়ে রেখে কর্তব্যই করে চলেছে। জগৎসিংহকে মন্ত্রী অপমান নীরবে হজম করে শান্তি রক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। এদের চরিত্র পাঠক-দর্শককে কোনদিক থেকেই তাই উৎসাহী করতে পারে না।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন নারীচরিত্র সৃষ্টিতে বেশি সার্থক হয়েছেন। পাঁচটি নারীচরিত্র পাঁচটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং কোথাও কৃত্রিমতা, অগভীরতা বা বিবর্ণতা প্রশ্রয় পায় নি।

অহল্যাদেবী রাজমহিষী। ভীমসিংহের ন্যায় নৃপতির মহিষী খুবই সঙ্গত ভাবে গম্ভীর বিমর্ষতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। মধুসূদন তার বিষয়ে লিখেছেন, "The queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem Sing, cannot but be sad and grave." গোটা রাজ্যের মাথার উপরে যে বিপদ ও দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হয়ে আছে মনের দিক থেকে তার ভার রাণী অহল্যা বহন করেছে; এখানেই তার রাণীর মর্যাদা। কিন্তু অহল্যাদেবী কোনদিক থেকেই রাজপুতানী হয়ে ওঠে নি। তার কন্যার প্রতি কোমল ও ব্যাকুল বাৎসল্যে, সদা আশঙ্কাতুর চিত্ত-আন্দোলনে

বাঙালি জননীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তাতে ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলেও প্রাণধর্মের স্পর্শ গভীর হয়ে লেগেছে।

কন্যার মৃত্যুর পরে অহল্যাও প্রাণত্যাগ করেছে। এতে একটু অতি-নাটকীয়তা আছে, কিন্তু সতর্ক নাট্যকার মঞ্চান্তরালে এই মৃত্যু ঘটিয়ে সেই ত্রুটি অনেকখানি সামলে নিয়েছেন।

তপস্বিনীর চরিত্রটিকে কবি বলেছেন অবশ্য প্রয়োজনীয়। অহল্যার একটি মর্যাদাসম্পন্ন সহচরী-চরিত্রের অপরিহার্যতা মেনে নিতে হয়। সেই পাত্রীর কাছে অহল্যার হৃদয়বেদনা উদ্‌ঘাটিত হতে পারবে, কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গেও তার সহৃদয় এবং সম্মানজনক একটি সম্পর্ক থাকবে। কবি একটি মামুলী আত্মীয়া অন্তঃপুরিকাকে না এনে তপস্বিনীর চরিত্রটি কল্পনা করে নিয়েছেন। ফলে—

এক। রাজকীয় পাত্র-পাত্রীর ভীড়ে গৈরিকের স্পর্শে বিচিত্রতা এসেছে।

দুই। পুরাতন ভারতীয় হিন্দু নৃপতির জীবন-পরিবেশ সন্ন্যাসিনীর সমাগমে কিছুটা বিশিষ্টতা পেয়েছে।

সন্ন্যাসিনীর চরিত্র স্বাধীনভাবে প্রকাশ পায় নি। তার পার্থিব জীবনবিবিক্ত তপস্বিনীসত্তার স্বাভাবিক ও স্বতন্ত্র প্রকাশের সুযোগ এ নাটকে ছিল না। অপরের মনের কথার শ্রোতারূপেই তার উপস্থিতি। কিন্তু মুহূর্তের জন্য তার চরিত্রের সামান্য পরিচয় প্রকাশ করে মধুসূদন তার জীবনদৃষ্টির ছাপ রেখে গিয়েছেন। মেবার রাজপরিবারে কিছুকাল বাস করে তাদের দুঃখের দাহ তপস্বিনীকেও বিচলিত করেছে। ["(স্বগত) আমি ভেবেছিলাম যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা—এ সকল সংসার-মায়া শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোনমতেই বোধ হয় না। আহা! এঁদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, এই মানব হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়-সকলের বীজ রোপন করেছ, তাদের নির্ম্মূল করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।"] তপস্বিনীর এই চিত্তোদ্‌ঘাটন তার চরিত্রকে মুহূর্তে বিশিষ্ট মূর্তি দিয়েছে। মধুসূদনের সুগভীর মর্ত্যমমতাই এই জাতীয় চরিত্রকল্পনা সম্ভব করে তুলেছে।

বিলাসবতী এ নাটকের একটি অভিনব চরিত্র। পণ্যা নারীর এই চরিত্রেই বাংলা সাহিত্যের চরিত্রচিত্রণে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হল।

মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার চরিত্রবৈশিষ্ট্য থেকে এই নারীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি কবি। নবযুগ মানুষের মূল্যবোধে যে পরিবর্তিত চেতনা আনল মধুসূদনের কবিচিত্তেই তা সর্বপ্রথম তরঙ্গ তুলেছিল। পণ্যা নারীর অন্তরে সহানুভূতির আলোকপাত এই প্রথম আরম্ভ হল বাংলা সাহিত্যে। শুধুই কালিমা লিপ্ত করে বাইরে থেকে ঘৃণা বর্ষণে আপন কর্তব্য সমাপন করেন নি কবি। বিলাসবতীর পূর্ব ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তিনি। বিলাসবতী ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যেও তার অতীতের দারিদ্র্যক্লিষ্ট গার্হস্থ্য জীবনের দিনগুলির কথা স্মরণ করেছে। ["তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করলে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্মপথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে। (রোদন।)"]

বিলাসবতী জগৎসিংহের রক্ষিতা। কিন্তু তার নারীহৃদয় এই পরিচয়ের সীমায় বদ্ধ থাকে নি। রাজা জগৎসিংহকে সে সত্যই ভালবেসেছে। তাকে লঘুচরিত্র লম্পট জেনেও আপন হৃদয়কে নিবৃত্ত করতে পারে নি। ["ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস কর্বো মনে করেছিলাম পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দাসী হলেম যে!"] জগৎসিংহের সম্ভাব্য বিবাহের সংবাদে সে বেদনার্ত হয়েছে, যুদ্ধগমনকালে বিচ্ছেদে একান্ত কাতর হয়েছে। মধুসূদন সামান্য রক্ষিতাকে প্রেমের মহিম্ন রাজটিকা পরিয়ে মনুষ্যত্বের স্বর্গে আসন দিয়েছেন। যে-আধুনিক শিল্পীমন সামাজিক চিন্তার বাধা অতিক্রম করে পতিতাকে নারী-গৌরবে ভূষিত করতে পারে মধুসূদনে তার প্রথম প্রতিষ্ঠা। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বহু পরবর্তী ঘটনা।

মদনিকাও বিলাসবতীর সমশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু পার্থক্য আছে। রূপে বিলাসবতীর সঙ্গে তার তুলনা চলে না। সে তাই সহচরী মাত্র। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর পার্থক্য রয়েছে তাদের ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে। বিলাসবতীতেও নাগর বৈদগ্ধ্যের অভাব নেই, কিন্তু মদনিকা উজ্জ্বলতায় সর্বদা ঝলমল করছে। বিলাসবতীতে হীরকের দীপ্তি আছে, মদনিকায় চকমকির ফুল্কি। বিলাসবতী চোখের আরাম; তার ঔজ্জ্বল্য উত্তাপ নিরপেক্ষ; মদনিকা আগুনের কণা; তার সংস্পর্শে তড়িৎস্পৃষ্ট হতে হয়। বিলাসবতীতে হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য, মদনিকা বুদ্ধির বিজয়পতাকা।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বেহুলার চরিত্রে কর্মতৎপরতার নিদর্শন মিলেছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মদনিকাই প্রথম নারী যে গৃহাভ্যন্তরে হৃদয়লীলাসর্বস্ব হয়ে থাকে নি। কর্মের জগতে সে পদার্পণ করেছে, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে প্রবেশ করে ব্যক্তিচিত্তের কামনাবাসনা ঈর্ষা হিংসা লোভ প্রেম প্রভৃতি বিচিত্র প্রবৃত্তির হাওয়া বইয়েছে। তার চরিত্রে সুনিপুণ কর্মতৎপরতা, কুশাগ্র চাতুর্য এবং অকুণ্ঠ দুঃসাহস তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। জয়পুর থেকে উদয়পুরে এবং উদয়পুর থেকে জয়পুরে তার গতাগতি যেমন অবাধ তেমনি দ্রুত। কখনও নারীর ছদ্মবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কৃষ্ণকুমারীকে অজ্ঞাতপূর্ব মানসিংহের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে, আবার পুরুষের ছদ্মবেশে নগরে ভ্রমণ করে কখনও ধনদাসকে বিপদগ্রস্ত করেছে, তার বহুযত্নসঞ্চিত সম্পদ আদায় করে নিয়েছে, কখনও মরুদেশের দূতের সঙ্গে ধনদাসের কলহ বাঁধিয়ে তুলেছে। ধনদাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার কারণটি রাজনৈতিক। তা না হলেও মদনিকার দ্বিমুখী আক্রমণের (কৃষ্ণকুমারীর মানসিংহ-প্রীতি এবং জগৎসিংহের চরিত্র বিষয়ে সত্যোদ্ঘাটন) ফলে ধনদাসকে যে লক্ষ্যচ্যুত হতে হত তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ কাজে মদনিকা কেন প্রবৃত্তি হল? প্রত্যক্ষত বিলাসবতীর উপকারের জন্য জগৎসিংহ-কৃষ্ণার বিবাহ সম্ভাবনাকে সে বিনষ্ট করতে চাইল। বিলাসবতীকে সে সত্যই ভালবাসত। তার বুদ্ধিঠাসা ব্যক্তিত্বের মধ্যে হৃদয়-বৃত্তির এমনি দু-একটি সূক্ষ্ম অবকাশ ছিল। তবে আরও কিছু কারণ যে ছিল না তা নয়। এক। ধনদাস তার বুদ্ধি ও চাতুর্যের বড়াই করত। প্রতিযোগিতায় তাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করার জিগীষাবৃত্তি মদনিকাকে নিশ্চয়ই প্ররোচিত করেছিল। ["ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে যে তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই, কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে"? (৪।৩)] দুই। মদনিকার চরিত্রের মধ্যেই ছিল অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা। কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে, ছদ্মবেশের বিচিত্রতায় বিভ্রম সৃষ্টি করতে, ফাঁদ পেতে সয়তানের চক্রান্ত ফাঁস করে দিতে তার উৎসাহ ছিল সদাজাগ্রত। তিন। মদনিকার চরিত্রে কৌতুকবোধ ছিল। ধনদাসকে যতটা সে নাকাল করেছে ততটা পিছনে বসে হেসেছে। নিজের ছদ্মবেশে তার হাস্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, নিজের কৌশলের কথা চিন্তা করে একান্তেই তার কৌতুক বাধাহীন হয়ে পড়েছে। এই হাস্যোপভোগের পুরস্কার না থাকলে তার এই সব বিচিত্র কর্মের প্রেরণা অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত সন্দেহ নেই।

মদনিকার এই সদাচঞ্চল কর্মতৎপরতা এবং দ্রুতগতি তাকে রোমান্সের পাত্রীর উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরবর্তী কালে এ জাতীয় চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনে সেই ধারার চমৎকার সূত্রপাত। এই চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে কবি যে কি পরিমাণ খুসি হয়ে উঠেছিলেন তার পরিচয় আছে এই মন্তব্যে, " But that Madanika is my favourite"। কবির প্রিয় হয়ে উঠেছিল সে এইসব গুণপনার জন্যই। মুসলমানী বিষয় নিয়ে নাট্য রচনার পক্ষে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "Their women are more cut out for intrigue than ours."। মদনিকার চরিত্রে কবি কল্পনাবলে সে জাতীয় লক্ষণের কিছুটা এনেছেন।

কিন্তু মদনিকার হৃদয় নামক বস্তুটি বুদ্ধি ও চাতুর্য, কৌশল ও চাঞ্চল্যের পেছনে আবৃত থাকলেও লুপ্ত হয় নি। বিলাসবতীর প্রতি ভালবাসায় তার পরিচয় পেয়েছি, কৃষ্ণার প্রতি প্রীতিতে তা সুন্দর আত্মপ্রকাশ করেছে; "যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গিনীকে দগ্ধ না করে। প্রভু তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো।" এমন কি শয়তান ধনদাসের দুঃখ দেখেও (তারই চেষ্টায় শাস্তি সে লাভ করেছে) তার নারীমন সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু কখনই ভাবালুতা প্রধান হয়ে তাব বুদ্ধির সংযমকে বিচলিত করতে পারে নি, তার তীক্ষ্ণ বস্তুবিদ্ধ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। জগৎসিংহের যুদ্ধগমনে বিলাসবতীর ব্যাকুলতা যখন দুর্দম হয়ে উঠল সে সখীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ মন্তব্য না করে পারে নি— "হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে না কি? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা! হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুব্জা-সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্যেন। হা! হা! হা!"

কৃষ্ণকুমারীকে মধুসূদন বলেছেন "dignified yet gentle." কৃষ্ণকুমারী তার নমনীয় কোমলতায় প্রথমাবধি পাঠকদর্শককে মুগ্ধ করে। তার চরিত্রের প্রধানতম গুণ সরলতা। মধুসূদন এই চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে পুরাতন

ভারতীয় নায়িকা-চরিত্রের সাধারণ পরিচয়ের প্রতি অবহেলা দেখান নি ; কিন্তু নিজ কল্পনাবলে তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন।

কৃষ্ণকুমারীকে মঞ্চে উপস্থিত করার পূর্বেই কবি পিতামাতার স্নেহাধিক্যের ছায়ায় অতি কোমল স্পর্শকাতর তারুণ্যের ভাব সঞ্চারিত করেছেন। এই কোমলতা, স্পর্শকাতরতা এবং কৈশোর-সরলতা শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রে অক্ষত রইল না। সঙ্গীতচর্চা এবং ফুলবনে জলসেকের নিশ্চিন্ত রাজ্য থেকে, পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ার আবরণ থেকে রাজনৈতিক ঘটনাসংঘর্ষের কেন্দ্রে তাকে নিক্ষেপ করা হল। এর জন্য অবাধ্য, অজ্ঞাত নিয়তিকেই মুখ্যত দায়ী করতে হয়। কিন্তু বাহিরের রাজনীতি তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও সে সরলতা ও কোমলতা, সঙ্গীত ও পুষ্প রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে ইতিহাসনিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হতে পারত। তা ঘটে নি। মধুসূদন সুকৌশলে এই বালিকার বুকের কপাট খুলে দিয়েছেন। বাহিরের ঘটনাস্রোত কৃষ্ণার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করেছে। কৃষ্ণা মানসিংহকে (অথবা তার ছবি বলে কথিত এক প্রতিকৃতিকে) ভালবেসেছে। কিশোরীর প্রথম প্রেমের সব বিস্ময়, সব ব্যাকুলতা, সবটুকু অবুঝ অসতর্কতা এর মধ্যে ছিল। এই নবপ্রেম তাকে নিশ্চিত পুষ্পবিলাস এবং সঙ্গীতরসের রাজ্য থেকে নির্বাসিত করল। প্রেম মানবীকে যে মধুর যন্ত্রণার জগতে উত্তীর্ণ করে, কৈশোর নিশ্চিন্ততা থেকে কৃষ্ণা সেই পৃথিবীর অধিবাসী হল। কোথায় গেল সেই ফুল ফোটান, সেই সুর জাগানো, এখন শুধুই বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। ["আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়। আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে? ...হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না।" (৩।২)] এই প্রেমের পথ ধরেই বাহিরের যুদ্ধ, জয়পরাজয় তার অন্তরে আসন পাতল। এতকাল যে সারল্য ও অজ্ঞানতার রুদ্ধ দ্বার তার মনের শ্যামলতা রক্ষা করেছে এখন তা ভেঙে পড়েছে। রাজনীতির সংঘাতে তার চিত্ত বিপুল বেগে আজ তরঙ্গিত। (৫।৩)

কিন্তু তবুও একথা ঠিক যে কৃষ্ণা হৃদয়-যন্ত্রণার আঘাতে নিঃশেষিত হবার বহু পূর্বেই রাজনীতির রূপ ধরে নিয়তির খড়্গাঘাত তার উপরে নেমে এসেছে। পদ্মিনীর প্রত্যাদেশ একটা অলৌকিক পরিবেশের স্পর্শ এনে কৃষ্ণার চারপাশে ট্রাজেডির রহস্য ঘনীভূত করে তুলেছে। কিন্তু কৃষ্ণার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যায় না। তাকে কেন্দ্র করে

পিতার ও রাজ্যের ঘনায়মান বিপদ কৃষ্ণার অবচেতনায় হয়ত একটা ব্যাকুল আত্মধিক্কার জন্মিয়েছিল, বিপন্মুক্তির পথ খুঁজে নিজের মন অস্পষ্টভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল ; জাতির ঐতিহ্য থেকে ভেসে আসা পদ্মিনীর আত্মদানের গৌরবকাহিনীও তার শোনা থাকবে। এই সূত্রগুলি জড়িয়ে গিয়ে অলৌকিক পরিস্থিতিটির ভিত্তিরচনা অসম্ভব নয়। কিন্তু একথা ঠিক একাধিক বার এই প্রতিভাস দর্শন অজ্ঞাতসারেই কৃষ্ণাকে তার মনের দিক থেকে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিল। পিতৃব্যের পরিত্যক্ত খড়্গ তুলে নিতে তাই তার হাত কাঁপে নি।

॥ সাত ॥

কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ যথেষ্ট পরিণত। অবশ্য প্রহসন দুটির মত ত্রুটিহীন একথা বলা যায় না। কিন্তু প্রহসনে মধুসূদনের গদ্যসংলাপ যে নৈপুণ্যে পৌছেছে কৃষ্ণকুমারীতেও মূলত তা থেকে কবি ভ্রষ্ট হন নি। কৃষ্ণকুমারীর সংলাপের ভাষা পূর্ববর্তী দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক থেকে নানা দিক দিয়ে উন্নত ও মার্জিত। প্রথমত, এ ভাষা প্রধানত কথোপকথনের জীবন্ত ভাষা, কোন মৃত ও অতীত ভাষার অকারণ আনুগত্যে ভারাক্রান্ত নয়। একটি চিঠিতে তিনি জনসনের এই উপদেশ মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

> "This style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those, who speak only to be understood without the ambition of elegance."...and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction and that will be in the more tragic parts of the play,"

যেখানেই সংলাপের ভাব সমুন্নত এবং কবিত্বমণ্ডিত সেখানেই সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি করে পড়েছে। তবে সে প্রভাব বাংলা ভাষার জাতিচ্যুতি ঘটায় নি। উদাহরণ হিসেবে ঝঞ্ঝা-উন্মত্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ভীমসিংহ বা কৃষ্ণার উক্তির কথা মনে পড়বে। সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ বাংলা বাক্‌বিন্যাসে বদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার মন্থরতা থেকে এই সংলাপ মুক্ত। উপমাদি সম্পূর্ণ বর্জিত না হলেও আলঙ্কারিকতার পায়ে পায়ে জড়িয়ে ভাষা এখানে হোঁচট খেয়ে পড়ে নি। অবশ্য নাটকের গভীর,

গম্ভীর ও বেদনাতীব্র অংশের ভাষায় এমন একটা কাব্যঝঙ্কার বেজেছে যাতে ছন্দোবদ্ধ সংলাপের আধারে এদের প্রকাশ অনেক বেশি আবেদনবাহী হত। কবির নিজের অমিত্রাক্ষরছন্দে এই নাটকের সংলাপ রচনার ইচ্ছা ছিল, এই সব অংশের দিকে তাকিয়ে তার তাৎপর্য অনুভব করা যায়।

দ্বিতীয়ত, লঘু এবং গুরু, সরল এবং ট্রাজিক যে কোন অংশের সংলাপেই এমন প্রত্যক্ষতা আছে যা আগেকার পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটিতে ক্বচিৎ দেখা গিয়েছে। এই প্রত্যক্ষতা ঘটনাগত এবং অনুভূতিগত। নাটকীয় ঘটমানতাকে কৃষ্ণকুমারীতে মূল্য দেওয়া হয়েছে ; ফলে সংলাপ অতীত ঘটনার বিবরণ না দিয়ে বর্তমানকে সোজাসুজি ব্যক্ত করেছে।

তৃতীয়ত, পূর্ববর্তী নাটক দুটির তুলনায় কৃষ্ণকুমারীতে স্বগতোক্তির পরিমাণ অনেকটা কমে গিয়েছে, দৈর্ঘ্য হ্রাস পেয়েছে। যা আছে তাও প্রায়ই নাট্যতাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ধনদাসের শয়তানী চক্রান্তের বহু কথাই তার স্বগতোক্তির মাধ্যমেই মাত্র জানা সম্ভব। বিশেষ করে তার নিজের সুবিধাবাদী যুক্তিক্রমটি স্বগতোক্তি ছাড়া জানা যেত না। স্বগতোক্তি ছাড়া মদনিকার সুচতুর কার্যকলাপের লক্ষ্য ও পদ্ধতির অন্দরে প্রবেশের অন্য কোন উপায় নেই। কৃষ্ণকুমারীর স্বগতোক্তি তার গানেরই যেন একটা অংশ। আপন হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এও এক ধরনের আত্মগুঞ্জরণ। নিঃসন্দেহে এই সংলাপ যতটা গীতিধর্মী ততটা নাটকীয় নয়। এই জাতীয় গীতিধর্ম যে কোন নাটকের পক্ষে অপরিহার্য। নাটকের শেষ দৃশ্যে বলেন্দ্রের কিঞ্চিৎ দীর্ঘ স্বগতোক্তিও তার মর্মদাহ প্রকাশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। এই যন্ত্রণা এমন একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যা বলেন্দ্র অপরের নিকট প্রকাশ করতে পারত না। মনের মধ্যেই একে গোপনে পুষতে হত। স্বগত সংলাপের আশ্রয় গ্রহণ না করে নাট্যকারের এখানে অন্য উপায় নেই।

চতুর্থত, কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপের সবচেয়ে বড় গুণ হল চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। মদনিকার চঞ্চল চাতুর্য, নাগর বৈদগ্ধ্য, সরস কৌতুক তার ভাষায় সবটাই ধরা পড়েছে। বিলাসবতীর ভাষায় একই জাতীয় নাগর বৈদগ্ধ্য থাকলেও বুদ্ধির চাতুর্য অপেক্ষা মাধুর্য, কৌতুকচিক্কণ তীক্ষ্ণতার স্থানে ভাবব্যাকুলতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণকুমারীর ভাষায় ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা কমনীয়তা ও স্নিগ্ধতা বেশি, কখনও প্রকৃতির সান্নিধ্য সে-ভাষায় কবিত্বের দোলা এনেছে, সংস্কৃতানুকারী গাম্ভীর্য ক্বচিৎ প্রকাশ পেয়েছে।

পিতার ও রাজ্যের ঘনায়মান বিপদ কৃষ্ণার অবচেতনায় হয়ত একটা ব্যাকুল আত্মধিক্কার জন্মিয়েছিল, বিপন্মুক্তির পথ খুঁজে নিজের মন অস্পষ্টভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল; জাতির ঐতিহ্য থেকে ভেসে আসা পদ্মিনীর আত্মদানের গৌরবকাহিনীও তার শোনা থাকবে। এই সূত্রগুলি জড়িয়ে গিয়ে অলৌকিক পরিস্থিতিটির ভিত্তিরচনা অসম্ভব নয়। কিন্তু একথা ঠিক একাধিক বার এই প্রতিভাস দর্শন অজ্ঞাতসারেই কৃষ্ণাকে তার মনের দিক থেকে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিল। পিতৃব্যের পরিত্যক্ত খড়্গ তুলে নিতে তাই তার হাত কাঁপে নি।

॥ সাত ॥

কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ যথেষ্ট পরিণত। অবশ্য প্রহসন দুটির মত ত্রুটিহীন একথা বলা যায় না। কিন্তু প্রহসনে মধুসূদনের গদ্যসংলাপ যে নৈপুণ্যে পৌঁছেছে কৃষ্ণকুমারীতেও মূলত তা থেকে কবি ভ্রষ্ট হন নি। কৃষ্ণকুমারীর সংলাপের ভাষা পূর্ববর্তী দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক থেকে নানা দিক দিয়ে উন্নত ও মার্জিত। প্রথমত, এ ভাষা প্রধানত কথোপকথনের জীবন্ত ভাষা, কোন মৃত ও অতীত ভাষার অকারণ আনুগত্যে ভারাক্রান্ত নয়। একটি চিঠিতে তিনি জনসনের এই উপদেশ মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

> "This style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those, who speak only to be understood without the ambition of elegance."...and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction and that will be in the more tragic parts of the play,"

যেখানেই সংলাপের ভাব সমুন্নত এবং কবিত্বমণ্ডিত সেখানেই সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি করে পড়েছে। তবে সে প্রভাব বাংলা ভাষার জাতিচ্যুতি ঘটায় নি। উদাহরণ হিসেবে ঝঞ্ঝা-উন্মত্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ভীমসিংহ বা কৃষ্ণার উক্তির কথা মনে পড়বে। সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ বাংলা বাক্‌বিন্যাসে বদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার মন্থরতা থেকে এই সংলাপ মুক্ত। উপমাদি সম্পূর্ণ বর্জিত না হলেও আলঙ্কারিকতার পায়ে পায়ে জড়িয়ে ভাষা এখানে হোঁচট খেয়ে পড়ে নি। অবশ্য নাটকের গভীর,

গম্ভীর ও বেদনাতীব্র অংশের ভাষায় এমন একটা কাব্যঝঙ্কার বেজেছে যাতে ছন্দোবদ্ধ সংলাপের আধারে এদের প্রকাশ অনেক বেশি আবেদনবাহী হত। কবির নিজের অমিত্রাক্ষরছন্দে এই নাটকের সংলাপ রচনার ইচ্ছা ছিল, এই সব অংশের দিকে তাকিয়ে তার তাৎপর্য অনুভব করা যায়।

দ্বিতীয়ত, লঘু এবং গুরু, সরল এবং ট্রাজিক যে কোন অংশের সংলাপেই এমন প্রত্যক্ষতা আছে যা আগেকার পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটিতে কচিৎ দেখা গিয়েছে। এই প্রত্যক্ষতা ঘটনাগত এবং অনুভূতিগত। নাটকীয় ঘটমানতাকে কৃষ্ণকুমারীতে মূল্য দেওয়া হয়েছে ; ফলে সংলাপ অতীত ঘটনার বিবরণ না দিয়ে বর্তমানকে সোজাসুজি ব্যক্ত করেছে।

তৃতীয়ত, পূর্ববর্তী নাটক দুটির তুলনায় কৃষ্ণকুমারীতে স্বগতোক্তির পরিমাণ অনেকটা কমে গিয়েছে, দৈর্ঘ্য হ্রাস পেয়েছে। যা আছে তাও প্রায়ই নাট্যতাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ধনদাসের শয়তানী চক্রান্তের বহু কথাই তার স্বগতোক্তির মাধ্যমেই মাত্র জানা সম্ভব। বিশেষ করে তার নিজের সুবিধাবাদী যুক্তিক্রমটি স্বগতোক্তি ছাড়া জানা যেত না। স্বগতোক্তি ছাড়া মদনিকার সুচতুর কার্যকলাপের লক্ষ্য ও পদ্ধতির অন্দরে প্রবেশের অন্য কোন উপায় নেই। কৃষ্ণকুমারীর স্বগতোক্তি তার গানেরই যেন একটা অংশ। আপন হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এও এক ধরনের আত্মগুঞ্জরণ। নিঃসন্দেহে এই সংলাপ যতটা গীতিধর্মী ততটা নাটকীয় নয়। এই জাতীয় গীতিধর্ম যে কোন নাটকের পক্ষে অপরিহার্য। নাটকের শেষ দৃশ্যে বলেন্দ্রের কিঞ্চিৎ দীর্ঘ স্বগতোক্তিও তার মর্মদাহ প্রকাশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। এই যন্ত্রণা এমন একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যা বলেন্দ্র অপরের নিকট প্রকাশ করতে পারত না। মনের মধ্যেই একে গোপনে পুষতে হত। স্বগত সংলাপের আশ্রয় গ্রহণ না করে নাট্যকারের এখানে অন্য উপায় নেই।

চতুর্থত, কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপের সবচেয়ে বড গুণ হল চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। মদনিকার চঞ্চল চাতুর্য, নাগর বৈদগ্ধ্য, সরস কৌতুক তার ভাষায় সবটাই ধরা পড়েছে। বিলাসবতীর ভাষায় একই জাতীয় নাগর বৈদগ্ধ্য থাকলেও বুদ্ধির চাতুর্য অপেক্ষা মাধুর্য, কৌতুকচিক্কণ তীক্ষ্ণতার স্থানে ভাবব্যাকুলতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণকুমারীর ভাষায় ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা কমনীয়তা ও স্নিগ্ধতা বেশি, কখনও প্রকৃতির সান্নিধ্য সে-ভাষায় কবিত্বের দোলা এনেছে, সংস্কৃতানুকারী গাম্ভীর্য কচিৎ প্রকাশ পেয়েছে।

তার প্রেম এবং স্নিগ্ধতার মধ্যেও যে একটা "dignified" ভাব আছে ভাষায় তা রক্ষিত হয়েছে, অপর তরুণী রমণীদ্বয় (বিলাসবতী, মদনিকা) থেকে সে যে স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী তাদের ভাষা শুনেই সে কথা বোঝা যায়। জগৎসিংহ এবং ভীমসিংহ রাজপুত নৃপতি, তাদের ভাষাভঙ্গিতে সাধারণ ঐক্য থাকবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু চরিত্রবৈশিষ্ট্যে তারা দূরতম প্রান্তের মানুষ। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাদের সংলাপের ভাষায় প্রতিবিম্বিত। জগৎসিংহ লঘুচিত্ত, ইন্দ্রিয়সেবক। সেই লঘুতা তার সংলাপেও প্রকাশ পেয়েছে; আর ভীমসিংহের সংলাপে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য, অতীতের স্মৃতিজড়িত দীর্ঘশ্বাস রূপলাভ করেছে। এই বিষণ্ণতা, এই গাম্ভীর্য অহল্যার সংলাপেও আছে, কিন্তু উচ্ছ্বসিত স্নেহব্যাকুলতা সে-ভাষাকে তরল ও নারী-সুলভ করে তুলেছে। আবার তপস্বিনীর সংলাপের গ্রন্থানুগ গাম্ভীর্যের সঙ্গেও তার নিশ্চিত পার্থক্য। তপস্বিনীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অনুরোধেই এরূপ ভাষা প্রযুক্ত হয়েছে, এব প্রাণধর্মের কিছুটা অভাবকেও কবি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রশান্ত গাম্ভীর্য ও প্রাত্যহিক জীবনকলরোলবিবিক্ত দূরত্বকে প্রকাশ করবার জন্য।

॥ আট ॥

কৃষ্ণকুমারী ট্রাজেডি। কিন্তু এর আস্বাদ মিশ্র ধরণের। জনৈক সমালোচক সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন, কমেডির শৈলীতে আরম্ভ হয়ে ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হবার জন্যই নাট্যরচনা হিসেবে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। এই অভিযোগ স্বীকার করা চলে না। মধুসূদন নিজে এ সমস্যাটির সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। তাঁর চিঠিতে তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করে একটি অনুসরণীয় আদর্শ দাঁড় করাতে চেয়েছেন।

"As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the play.—But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this; —never strive to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself

unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes."

কবি খুবই সাবধানতার সঙ্গে এই নীতির অনুসরণ করতে চেয়েছেন। এই নাটকের লঘু কৌতুকের রেশটি জগৎসিংহ-ধনদাস এবং ধনদাস-মদনিকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। জগৎসিংহও বিলাসবতীর সংস্পর্শে কৌতুকসর্বস্ব থাকতে পারে নি, মদনিকাও কৃষ্ণকুমারীর নৈকট্যে প্রীতিস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ধনদাসের চরিত্রে হাস্যের সঙ্গে সয়তানী যুক্ত, জগৎসিংহের রসিকতা কামলালসার অঙ্গ। এদের চক্রান্ত বা লালসার সঙ্গে মূল কাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ আছে। তাছাড়া এ নাটকে পরিবেশিত হাস্যরস যতটা ভাষাগত ততটা পরিস্থিতি-নির্ভর নয়। কোনক্রমেই এরূপ অভিযোগ করা যায় না যে কমেডির আবহাওয়া অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়ে এ নাটকের ট্রাজিক সুরটিকে ঘনীভূত হয়ে উঠতে দেয় নি।

কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজিক রসের স্বরূপ বিচারে কয়েকটি সূত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা বিপুলশক্তি ব্যক্তিত্বের পতনের মধ্য দিয়ে এ নাটকের ট্রাজেডি-আস্বাদ লাভ করা যায় না। ভীমসিংহের দুর্বলতা তার পথে প্রধান অন্তরায়। ভীমসিংহ বা কৃষ্ণার চরিত্রের আভ্যন্তরীণ কোন বিশিষ্ট সঙ্কটের ফলে এদের জীবনে বিপর্যয় বা ভীষণ দুঃখ আপতিত হয় নি। এদের ক্ষেত্রে চরিত্রই ট্রাজিক নিয়তি এমন কথা বলা চলে না।

গ্রীক নাটকের ট্রাজেডি কল্পনা মূলত অন্য ধরনের। বিশ্বন্যায়নীতির বিঘ্ন ঘটলে সেখানে ব্যক্তিজীবন বিপর্যস্ত হয়। ব্যক্তির কোন বিশেষ কর্ম বা তার চরিত্রধর্ম যদি এই সামগ্রিক কল্যাণচেতনাকে আঘাত করে তবে সে নিজে আহত হয়। কিন্তু হোমরের মহাকাব্যে হেক্টরের মৃত্যু, প্রায়ামের শোক এবং একিলিসের অস্ফুট অকালমৃত্যুর আশঙ্কা বুকে বহন করে যে ট্রাজিক পরিমণ্ডল রচনা করেছে তাকে সমাজচেতনা এবং ব্যক্তিস্বভাব-ব্যক্তিক্রিয়ার দ্বন্দ্বও যেমন বলা যায় না, তেমনি কোন বিশেষ অপরাধের ফল বলেও চিহ্নিত করা চলে না। সব মিলে একটা অজ্ঞাত·দৈবশক্তির ভ্রূকুটির কথা মনে আসে, একটা বিমূঢ় বিশ্বজিজ্ঞাসা ও আর্ত, ভীতিজড়িত বেদনায় চিত্ত স্ফুরিত হতে থাকে। রসাস্বাদের এই রাজ্য থেকেই মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য তথা

কৃষ্ণকুমারী নাটকের ট্রাজিক সুরটি গ্রহণ করেছিলেন। কবি নিজ ভাগ্যকেও অনুরূপ অজ্ঞাত নিয়তির দ্বারা আহত বলে মনে করতেন।

পদ্মিনীর প্রসঙ্গ এনে অলৌকিকতার সহযোগে মধুসূদন এই নাটকের ট্রাজেডির উৎসকে নভস্পর্শী এবং রহস্যময় করে তুলেছেন। প্রত্যক্ষত রাজনীতির চক্রে কৃষ্ণকুমারী বিসর্জিত হলেও তারও পশ্চাতে যেন নক্ষত্র-লোকের এক অকারণ ও নিরাসক্ত ষড়যন্ত্র গোপনে সক্রিয় থেকেছে। মৃত্যুর হাতছানি বারবার তাকে আহ্বান জানিয়েছে। এর ফলে এ জগতে একটা অন্যতর জগতের ছায়াপাত ঘটেছে।

১ মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী রচনাকালীন মানসিক অবস্থা এবং অনন্যচিত্ত শিল্পভাবনার পরিচয় আমার 'মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্পে'র মেঘনাদবধ কাব্য নামক অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে।

২ একটি চিঠিতে তিনি সাহিত্যিক সাফল্যে উত্তরণকে ধূমকেতুর গতির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

৩ আমার "মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্পে"র ব্রজাঙ্গনা নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪ "Some weeks ago, I sent you the First Act of সুভদ্রা through our friend Jodu. Here goes the second Act...It is simply a Dramatic poem." [কেশব গাঙ্গুলিকে লেখা চিঠির অংশ।]

৫ রিজিয়া নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের কিছুটা (আলতুনিয়ার প্রারম্ভিক সংলাপ) অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি রচনাও করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ মধুসূদন গ্রন্থাবলীতে সে অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে। 'মধু-বিচিত্রা'য় 'মধুসূদনের অপূর্ণ রচনা' নামক প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

৬ "কবি মধুসূদন এবং তাঁর পত্রাবলী"তে আমি এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

৭ Look at the splendid Shakespearean Drama.

[—কেশব গাঙ্গুলিকে লেখা পত্রাংশ।]

৮ "...I like to preserve 'unity of place' and as far as I

can, that of time also. Examine each act and you will find unity of place if not of time."

[—কেশব গাঙ্গুলিকে লেখা চিঠি]

৯ 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' নাটকের প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যরীতির পার্থক্যের কথা বিস্তৃতভাবে বলেছি।

১০ 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষার্ধে। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬০ তারিখে, কৃষ্ণকুমারী লেখা শেষ হয়। এর পূর্বে নীলদর্পণ নিশ্চয়ই লেখা হয়েছিল। কিন্তু মধুসূদন এ নাটকের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করা সম্ভবও ছিল না।

১১ বহু পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকে দারার মৃত্যুতে সাজাহান প্রায় এই জাতীয় ভাষায় শোকপ্রকাশ করেছে।

১২ যোগীন্দ্রনাথবসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত দ্রষ্টব্য।

১৩ ইউরিপিদিস ইফিগিনিয়ার উপাখ্যান নিয়ে দুটি নাটক লিখেছিলেন। 'Iphigeneia in Aulis' এবং 'Iphigeneia in Tauris'। কেউ কেউ ভুল করে দ্বিতীয় নাটকটির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীর সাদৃশ্য আছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে প্রথম নাটকটির সঙ্গেই এর কাহিনীসাদৃশ্য আছে, দ্বিতীয় নাটকটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কাহিনী।

১৪ অলিসে দেবী আর্টেমিস ইফিগিনিয়াকে বাঁচাবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করেন। গ্রীক নেতারা বুঝতে পারে না যে আর্টেমিস ইফিগিনিয়াকে অলিস থেকে টরিসে নিয়ে যান এবং নিজ মন্দিরের দেবদাসী করে রাখেন। টরিসে থাকাকালীন বহুবৎসর পরে ভাই অরেষ্টেসের সঙ্গে ইফিগিনিয়ার পুনর্মিলন 'ইফিগিনিয়া ইন টরিস' নাটকের বিষয়।

১৫ কৃষ্ণকুমারীতে প্রতি অঙ্কে স্থানগত ঐক্য আছে। কিন্তু গোটা নাটক মিলে স্থানগত বা কালগত ঐক্য রক্ষিত হয় নি।

১৬ কীথ 'The Sanskrit Drama'-য় বসন্তসেনার চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "Not less attractive is Vasantasena, bound, despite herself, to a profession which has brought her great wealth but which offends her heart; the judge and all the others believe her merely carried away by sensual passion; Carudutta and his wife alone recognize her nobility of soul,

and realize how much it means for her to be made eligible for marriage to her beloved."

১৭ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত টডের 'রাজস্থান' থেকে উদ্ধৃত।

১৮ 'মধুসূদনের কবিআত্মা এবং কাব্যশিল্পে' আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

১৯ উপন্যাস এবং নাটকের রূপে ও আস্বাদে গোড়াকার পার্থক্য আছে। কিন্তু ইতিহাসের সংযোগে এদের মধ্যে যে বিশিষ্ট সুরটি জন্ম নেয়, তার মধ্যে গুরুতর মিলও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধের সহায়তায় 'ঐতিহাসিক নাটকে'র তত্ত্বগত পরিচয় লাভের চেষ্টা তাই অসঙ্গত ও পরিহার্য নয়।

২০ রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্যের পথে" গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধে এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২১ "Fancy, only 5 or 6 Males, and but 4 Females in a Historic Tragedy"

২২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ বঙ্কিম রচনাবলীর 'রাজসিংহে'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে যদুনাথ সরকার এই মন্তব্য করেছিলেন।

২৩ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' এবং নূরজাহান ইতিহাসাশ্রিত নাটক হলেও ঐতিহাসিক সমগ্রতা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিগত সমস্যাই সেখানে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে।

২৪ ট্র্যাজেডির climax-এ "the protagonist visualises his inacceptable but unwillingly accepted defeat" এই দৃশ্যেই "the emotion and tension is maximum." [Millete and Bentley] ভীমসিংহের চরিত্রে দুর্বলতা প্রধান হওয়ায় এই লক্ষণ যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া কৃষ্ণার হত্যার প্রস্তাবে এবং তার মৃত্যুর দৃশ্যের উত্তেজনা এর চেয়ে বেশি বই কম নয়। তাই এই দৃশ্যটিকে নিশ্চিতভাবে climax-দৃশ্য বলে চিহ্নিত করা চলে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মায়াকানন

"যাবার সময় হোলো বিহঙ্গের"

। এক ।

১৮৭৩ সালে মায়াকানন লেখা হয়। এই বছরেই শরচ্চন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য কবিকে দুটি নাটক লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। কবি দুখানি নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। 'মায়াকানন' লেখা শেষ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় নাটক 'বিষ না ধনুর্গুণ' সবে আরম্ভ হয়েছিল, শেষ হয় নি। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন যে মায়াকানন কবি শেষ করে যেতে পারেন নি।[১] এ অনুমান যথার্থ নয়। কারণ,—এক। মায়াকানন নাটক প্রকাশিত হলে প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক শরচ্চন্দ্র ঘোষ এবং অখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

> "বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত শয্যায় শয়ন করিয়া 'মায়াকানন' নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তদনুসারে তিনি 'মায়াকানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানা নাটকের কতকঅংশ রচনা করেন।"

এই বিবৃতি দেখে মনে হয়, প্রথম নাটকটি তিনি শেষ করে গিয়েছিলেন কিন্তু দ্বিতীয়টি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। এই বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে লেখা হয়েছে—

> "সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।"

এ দেখে মনে হয় কবি নাটকটির সংশোধন ও পরিমার্জনা করে যাবার অবকাশ পান নি। নাটকটি দেখে দিতে গিয়ে সহ-সম্পাদক মহাশয় কোথাও যে কিঞ্চিৎ সম্পাদনা করেন নি একথা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যায় না। দুই। মধুসূদন 'মায়াকানন' শেষ না করে 'বিষ না ধনুর্গুণ' লিখতে আরম্ভ করতেন না। দ্বিতীয় নাটকটি তিনি আরম্ভ করেছিলেন; এবিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। আগে প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার মধ্যাহ্নে কবি যুগপৎ

একাধিক রচনায় হাত দিয়েছেন। কিন্তু রোগজীর্ণ, মৃত্যুমুখী কবির দেহ বা মনে সেই শক্তির সামান্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল না যাতে একাধিক রচনায় ভাবনাকে ধরে রাখা সম্ভব। প্রথমটি শেষ করে তবেই তিনি দ্বিতীয়টিতে হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় যাবার সময় হ'ল। দ্বিতীয়টি আর শেষ হ'ল না।

মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী রচনার কাল থেকে ১৮৭৩ সালের ব্যবধান দীর্ঘ ১৩ বছরের। তাঁর সাহিত্যচর্চাও প্রকৃতপক্ষে শেষ হয়েছে ১৮৬৫ সালে, চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ এর ৮ বছর আগে। মায়াকানন কবির নিয়মিত সাহিত্যজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এমন কি কবির নাট্যবোধের ক্রমবিকাশের ধারায় রেখেও একে বিচার করা চলে না।

মায়াকানন কবির শেষ রচনা, শেষ পূর্ণাঙ্গ রচনা। ১৮৬৫ সালের পর ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত আরও কয়েকটি লেখা তিনি আরম্ভ করেছিলেন, কোনটিই শেষ করতে পারেন নি। একমাত্র মায়াকানন শেষ হয়েছিল, সম্ভবত অগ্রিম অর্থপ্রাপ্তির জন্যই।[২]

কবির মনের অবস্থা তখন কোথায় পৌঁছেছিল জীবন চরিতকারের বর্ণনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়,

> "মধুসূদনের পত্নীরও শরীর পূর্ব্ব হইতেই ভগ্ন হইয়াছিল; এই সময় তিনিও অতি কঠিন রূপ পীড়িতা হইলেন। পতিপত্নী উভয়ের এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসার ও পথ্যের অভাব, দুইটি অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার এবং তাহার উপর ঋণদাতাগণের নিপীড়ন, সুতরাং মধুসূদনের যন্ত্রণা পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইল।·· যে অবস্থায় তিনি মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। রোগের যন্ত্রণায় কখনও কখনও তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন; রক্তবমনে শরীর মধ্যে মধ্যে অবসন্ন হইয়া আসিত, অথচ তাহারই মধ্যে অর্থাভাব ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে ভাবিয়া, লেখনী হস্তে যখন যে ভাবটী হৃদয়ে উদিত হইত, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। নিজের যখন লেখনী ধারণের সামর্থ্য না থাকিত, তখন কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নিকটে থাকিলে, তাঁহার দ্বারা অভিপ্রেত বিষয় লিখাইয়া লইতেন।"

এই অবস্থা কোন দিক থেকেই সাহিত্য রচনার অনুকূল নয়। মায়াকানন তাই নাট্যধর্মের বিচারে উল্লিখিত হবার মত নয়। কিন্তু মহৎ প্রতিভার বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ এই রচনায় নানাস্থানে ভস্মাবৃত হয়ে আছে। সর্বোপরি এর ট্রাজিক উপলব্ধিতে মুমূর্ষু কবির আত্মপ্রতিফলন ঘটেছে। অনন্ত গগনচারী বিহঙ্গের যে প্রত্যাবর্তনের সময় এসেছে তার চিহ্ন ধরে রেখেছে মায়াকানন। কবির জীবনচেতনা ও সাহিত্যসাধনার দিক থেকে এই নাটক তাই তাৎপর্যহীন নয়।

॥ দুই ॥

মায়াকাননের কাহিনীর পটভূমিতে গ্রীক পুরাণ-কথার সামান্য প্রভাব আছে। সিন্ধু রাজবংশের কন্যা ইন্দিরা সৌন্দর্যগর্বে রতির রূপ-শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করেছিল। প্রণয়দেবীর অভিশাপে পাষাণী মূর্তিতে মায়াকাননের মন্দিরে তার স্থান হল। অভিশাপমুক্ত হবার জন্য অধিকতর সুন্দরী কোন রমণীর আত্মদানের প্রয়োজন ছিল, ইন্দিরার পাষাণ মূর্তির পদতলে। মায়াকানন নাটকে সেই আত্মদানের কাহিনী বিবৃত। রতির এই আচরণের সঙ্গে গ্রীক দেবী আফ্রোদিতির সাইকির প্রতি ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৩] কবি শেষ পর্যন্ত গ্রীক পুরাণ-জগতের প্রতি তাঁর প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, এটি খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মায়াকাননের কাহিনীটি কবির স্বকল্পিত। কাল্পনিক হলেও হিন্দু পুরাণের সঙ্গে এ গল্পের কিছুটা সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছিলেন কবি। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে কয়েকশত বৎসরের মধ্যেকার ঘটনা হিসেবে কবি এ কাহিনীকে কল্পনা করতে চেয়েছেন। মায়াকাননে উল্লিখিত রাজবংশগুলি বিখ্যাত মহাভারতীয় রাজন্যবর্গের উত্তরপুরুষ। সেই বিখ্যাত বীরদের স্মরণে এখনও তারা গর্বস্ফুরিত, এখনও তাদের সংলাপে সেই বীরদের প্রসঙ্গ বহু উচ্চারিত। জয়দ্রথের সিন্ধুরাজ্য, গান্ধারীর স্মৃতিধন্য গান্ধার, দ্রৌপদীর গৌরবে মহিম পাঞ্চাল এ কাহিনীর রাজনৈতিক পটভূমিটি গঠন করেছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের কিঞ্চিৎ অনুবৃত্তিও এই রচনায় লক্ষ্য করা যায়। ইন্দুমতী-অজয়ের প্রেমমিলনের পথে রাজনৈতিক ঘটনাচক্রই প্রত্যক্ষ ও বোধগম্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; ঘূর্ণমান রাজনৈতিক চক্রনেমীই প্রত্যক্ষত এদের পিষ্ট করেছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকেও বহু বিরোধী রাজশক্তির আক্রমণে নিষ্পিষ্ট মেবারের অবস্থা অজয়ের সিন্ধুরাজ্যের মত হয়ে পড়েছিল। রাজ্যরক্ষায়

জন্য উভয়ত পরম মানবিক সত্য লজ্মিত হয়েছে। দুটি নাটকেই এর ফলে চরম বিপর্যয় ঘটেছে, রাজ্যরক্ষা ব্যাপারটিই তখন হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থহীন। ইন্দুমতীর আত্মহনন আমাদের নিশ্চিতভাবেই কৃষ্ণকুমারীর পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

এ নাটকের মূল সমস্যা অজয়-ইন্দুমতীর প্রেম ও মিলনের সমস্যা। নাটকের ঘটনাদ্বন্দ্ব এই সমস্যাটিকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে এবং পরিণতি পেয়েছে। কাহিনীর রাজনৈতিক ঘটনাংশ যে সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাও একটিবারের জন্য মূল প্রণয়-সমস্যা থেকে চ্যুত নয়। পাঞ্চাল রাজ্যের সঙ্গে সিন্ধুর যে বিরোধ-সম্ভাবনা দেখা গেল তার কারণ ইন্দুমতীর প্রতি অজয়ের সুগভীর আকর্ষণ, পাঞ্চাল রাজকন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। গান্ধারের নৃপতির সঙ্গে তার সম্পর্ক তো প্রত্যক্ষত ইন্দুমতীকে কেন্দ্র করেই। গান্ধার-নৃপতি আপন পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য ইন্দুমতীকে তার হাতে সমর্পণ করবার জন্য অজয়কে অনুরোধ করল, অনুরোধের পেছনে লুকানো শক্তির দম্ভও অপ্রকাশিত রইল না। অজয়-ইন্দুমতীর প্রেমের পরিণতি পাঞ্চাল-গান্ধারের আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। এদের স্বতন্ত্রভাবে বিচার করার কোন সুযোগই লেখক রাখেন নি।

নাট্যকার একাগ্র তীক্ষ্ণতায় মূল সমস্যার প্রতি অনুগত থেকেছেন, পার্শ্বকাহিনী আমন্ত্রণ করেন নি, কোনরূপ জটিলতার সৃষ্টি করেন নি। কৃষ্ণকুমারী নাটকে ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা মিলে ঘটনার যে অন্তর্বৃত্ত রচনা করেছিল, তার অনুরূপ এখানে নেই। তবে মদন-সুভদ্রা-নৃসিংহ-বিচারের অংশটি মূল কাহিনীর সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ক্ষুদ্র গল্পাভাস (episode) কিন্তু মূল নাট্যসমস্যার দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুভদ্রা-নৃসিংহের বিবাহের সিদ্ধান্তে নরনারীর মুক্ত প্রেমের মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। অজয়ের মনোভাব এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের ভিত্তিটা এই উপলব্ধির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দৈবের নির্মম হাস্য এখানেও অপ্রকট থাকে নি। মুক্তপ্রেমের সত্যকে যে জীবনের কেন্দ্রীয় সত্য বলে বুঝেছিল নিজ প্রিয়তমার মৃত্যুকালীন এই ন্যায্য অভিযোগ তারই বিরুদ্ধে উচ্চারিত হল "গান্ধার-রাজকন্যা বিনিময়ের সামগ্রী নয়।"

মায়াকাননের দৃশ্যগুলি মর্মান্তিক পরিণামের দিকে রুদ্ধশ্বাস বেদনায় অগ্রসর হয়েছে। কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজেডির মধ্যেও কৌতুকের অবকাশ করে নিয়েছিলেন

কবি। এ বিষয়ে কিছু সাহিত্যতত্ত্বও কেশববাবুকে লেখা চিঠিতে উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু ১৮৬০ এবং ১৮৭৩-য়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। কবির জীবন থেকে সবটুকু হাসি এমন নিঃশেষে মুছে গিয়েছে যে ভাষায় কৌতুক-পরিবেশ সৃষ্টি আজ স্বপ্নেরও অতীত। মায়াকাননে বিদূষক নেই, ধনদাস-মদনিকাও আসে নি কৌতুকরস সৃষ্টি করতে। রাজসভার নকুল নামক জনৈক নাগরিকের ভুয়া পাণ্ডিত্য নিয়ে কৌতুক সৃষ্টির যে চেষ্টা নাট্যকার করেছেন তা একান্ত ক্লিষ্ট।

মায়াকাননের মূল সমস্যা অজয়-ইন্দুমতীর প্রেম ও মিলনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এই প্রণয়-চরিতার্থতার প্রধান বাধা কোথায়? নাট্যসংঘর্ষের মূল ভিত্তিটি কোথায়? পাঞ্চাল রাজের সঙ্গে বিরোধ কিংবা ধূমকেতুর শক্তিমত্ত প্রস্তাব সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ বিষয় রূপে চিহ্নিত। কিন্তু আসল বাধা মানবলোকের অতীত কোন উৎস থেকে আপতিত। আকাশ থেকে বজ্রগর্জনে দেবতারা বিরুদ্ধতা প্রকাশ করেন, লোকপ্রবাদে এই প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বহু পূর্ব থেকেই ঘোষিত ["এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার ঐ ধনাধিষ্ঠাত্রী-পাষাণময়ী-দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব রূপগুণশালিনী কোন রমনীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমন-গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়। আব তার সমুদয় বাসনা চিরদিনের জন্য শুষ্ক হয়ে যায়!" (১।২)], মৃত নৃপতিব প্রেতাত্মা আবির্ভূত হয়ে এই সর্বনাশ বাণী উচ্চারণ করে, সাবধান হতে নির্দেশ দেয়, মনে হয় সিন্ধুরাজ্য তথা ইন্দুমতী-অজয়ের ভাগ্যের উপরে যে বেদনাদগ্ধ নিষ্ঠুর পরিণাম ঘনীভূত হয়েছে তাতে পাঞ্চালের রণনৈতিক বিরোধিতা, গান্ধারের ইন্দুমতী-প্রার্থনা নিমিত্তমাত্র। নিষ্ঠুর নিয়তির বহু অস্ত্র সজ্জিত তূণের দুটি শায়ক মাত্র। তার ধনুর জ্যা আকর্ষণ ঘটেছে সর্বলোক-চক্ষুর অন্তরালে, বুদ্ধির অগম্য কোন রহস্যকেন্দ্র থেকে।

কিন্তু বুঝবার উপায় নেই দৈব কেন ক্রুদ্ধ। নাট্যশেষে অজয়-ইন্দুমতীর পূর্বজন্ম এবং গন্ধর্বজীবন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা একান্ত মূল্যহীন।

এ নাটকে তীব্র সংঘাত নেই, তার পরিবেশ মাত্র আছে। নাট্যরচনা হিসেবে এটি এর প্রথমতম দুর্বলতা। গোটা নাটকে সেই দৈবের কাছে নতিস্বীকারই জয়যুক্ত হয়েছে। অরুন্ধতী এবং মন্ত্রী দৈবের নিকটে অনুগত হয়ে সিন্ধুরাজ্যের, অজয়ের এবং ইন্দুমতীর অকল্যাণ দূর করতে চেয়েছে।

এমন কি অজয়ের কণ্ঠেও অজ্ঞাত দৈবকে অস্বীকার করবার পুরুষ কঠিন সুর ধ্বনিত হয় নি। অবশ্য নাট্যকার দৈবের বিধি সম্পর্কে অজয়কে অনবহিত রেখে এই প্রশ্নটিকে এড়াতে চেয়েছেন। ফলে নাট্যদ্বন্দ্বের মূলকেন্দ্রটি বল হারিয়েছে। দৈবের অস্ত্র পার্থিব উপকরণেই গঠন করেছেন মধুসূদন। সেই পাঞ্চাল রাজার বিরোধ কিংবা ধূমকেতুর অন্যায় প্রস্তাবের সঙ্গে অজয়কে তীব্র সংঘর্ষরত করে দেখান উচিত ছিল। অজয় অবশ্য পাঞ্চালকন্যাকে বিবাহ করতে চায় নি, এমন কি তাদের যুদ্ধের প্রস্তাবেও যথেষ্ট বিচলিত হয় নি। কিন্তু যথেষ্ট তীক্ষ্ণ বলিষ্ঠতার সঙ্গে এই প্রতিরোধ উপস্থিত করা হয় নি। ধূমকেতুর সাংঘাতিক প্রস্তাবে অজয় ক্ষীণকালের জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছিল বলে সংবাদ পাই ["মহারাজ প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়। ভগবতী অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রীমহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশ শান্ত হচ্ছেন।"] কিন্তু তা মঞ্চান্তরালে, তার তীব্রতা সামান্য এবং শেষ পর্যন্ত অজয় সম্মত হয়েছে। নাটকের নায়ক সমাপ্তি পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাবেন, এটিই প্রত্যাশিত। এই দ্বন্দ্বেই নাট্যরস উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মধুসূদনের রাবণ প্রথম সর্গ থেকেই জানে, "হবো আমি নির্ম্মূল সমূলে এর শরে," তবুও সংগ্রাম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবার প্রশ্ন মুহূর্তের জন্যও আসে নি। এমন কি ইন্দ্রনীলও পদ্মাবতীর জন্য যুদ্ধ করেছে। কিন্তু রাজ্য-রক্ষার জন্য অজয় ইন্দুমতীকে তুলে দিতে সম্মত হয়েছে ধূমকেতুর দূতের হাতে। নাট্যসংঘাতকে একেবারেই মূল্য দেওয়া হয় নি মায়াকাননে। উপযুক্ত উপকরণের সমাবেশ সত্ত্বেও নাটক হিসেবে এ রচনা অনুত্তীর্ণ।

গোটা নাটক জুড়ে ভাগ্যের অপ্রতিরোধনীয় অন্ধ শক্তির লীলা নর্তন অনুভব করা যায়। অজয়-ইন্দুমতী মায়াকাননে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবার পরে বৃদ্ধ রাজা পুত্রকে বাধা দিতে চেয়েছেন। উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে। মন্ত্রী এবং শশিকলা যুক্তি করে কন্যা-সম্মিলনের ব্যবস্থা করেছে। আশা করেছে অনামিকা সেই কন্যার পরিচয় লাভ এবার সম্ভব হবে, অজয়ের মনোকষ্ট দূর হবে। কিন্তু কন্যাসম্মেলনে অজয়-ইন্দুমতীর সাক্ষাৎ সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলল। অরুন্ধতী দৈবী রোষের কথা স্মরণ করে সম্ভাব্য বিবাহ পিছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। অরুন্ধতী ও মন্ত্রী পরামর্শ করে চিরকালের জন্য এই বিবাহ-সম্ভাবনা দূর করবার জন্য ধূমকেতুর নিকটে দূত পাঠিয়েছে। বিবাহ হয় নি—এদের সাম্প্রতিক লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু অজয় ও ইন্দুমতী আত্মহত্যা করেছে। এদের আসল উদ্দেশ্য দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে।

যাদের কল্যাণসাধনের জন্ত এত চেষ্টা তাদের মৃত্যুতে সব কর্মকৌশলের অবসান ঘটেছে। যে মুহূর্তে একে অন্যকে দেখেছে তখন থেকেই কোন অজ্ঞাত কারণে প্রতিকূল দৈবশক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিপন্মুক্তির প্রতিটি চেষ্টা তাদের সর্বনাশকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। যখনই অরুন্ধতী এবং মন্ত্রীর মনে হয়েছে কৌশল সফল হল, তখনই ভাগ্য পেছনে বসে নীরব হাস্যে মৃত্যুকে নিকটতর করেছে।

নাট্যরসের দিক দিয়ে মায়াকাননের কয়েকটি মূল দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপে যে প্রত্যক্ষতা দেখেছি মায়াকানন তা থেকে বঞ্চিত। মায়াকাননে কবিত্বের চেষ্টা নেই। এ নাটকের গদ্যকে আদৌ কাব্যধর্মী বলা চলে না। কিন্তু বিবৃতিপ্রাধান্য এর নাট্যরসের হানি ঘটিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘটনাবিরলতা। ঘটনাবিরলতার দিকে কবির স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই নাট্যমধ্যে ঘটনা-প্রাচুর্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে হৃদয়োদ্বেলতার জন্যই স্থান ছেড়ে দিয়েছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথমদৃশ্যে মায়াকাননের দেবীমূর্তির সামনে অজয়-ইন্দুমতীর প্রার্থনা এবং এদের সাক্ষাৎকার বেশ নাটকোচিত ঘটনাতরঙ্গিত। কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রত্যক্ষ ঘটনা কিছুই নেই; পাঞ্চাল রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহে অজয়ের আপত্তি সংবাদরূপে পরিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাগরিকদের কথোপকথনে কোন নূতন তথ্য প্রকাশ পায় নি, অজয়ের মায়াকাননের অভিজ্ঞতাই পুনরুক্ত হয়েছে। নূতন রাজারূপে অজয়ের প্রবেশ এবং পাঞ্চালের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ ঘটনা হলেও পুনরুক্তিমাত্র। সুভদ্রা-প্রসঙ্গ মূল নাট্যকাহিনীর অঙ্গ নয়, তবে তাৎপর্যবহ। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজার মনোকষ্ট দূর করবার জন্য মন্ত্রী ও শশিকলা রাজউদ্যানে তরুণী নগরবাসিনীদের আমন্ত্রণের পরামর্শ করেছে। তৃতীয় দৃশ্যে ঢেঁড়া দিয়ে এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ দৃশ্যটি অনাবশ্যক। পূর্ব দৃশ্যের প্রকাশ্য পরামর্শ একে একটা পুরাতন ব্যাপারে পরিণত করেছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অরুন্ধতী মন্ত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অজ্ঞাত দৈবী কারণে ইন্দুমতী-অজয়ের মিলন যে অসম্ভব তা পাঠক-দর্শকদের জানানো হয়েছে। এ দৃশ্য বিবৃতিপ্রধান। তবে কৌশলে কিছুটা নাটকীয় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবার জন্য মৃত বৃদ্ধ রাজার প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটানো .হয়েছে। অরুন্ধতীর কাছে ইন্দুমতীর প্রণয় ব্যক্ত হয়েছে; অরুন্ধতী ইন্দুমতীকে বিবাহ বিলম্বিত করবার জন্য উপদেশ দিয়েছে। দ্বিতীয়দৃশ্যে কিছু নাটকীয় ঘটনার সংস্থান

কর। হয়েছে। মন্ত্রী রাজাকে যতই ইন্দুমতী থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে ততই অজয় অধীর হয়ে উঠেছে। অবশেষে ইন্দুমতীর দেখা পেয়ে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে।. ইন্দুমতী বিবাহের জন্য এক বছরের সময় চেয়ে নিয়েছে। এই দৃশ্যের শেষভাগে অরুন্ধতী ও মন্ত্রী পরামর্শ করে অজয় ও ইন্দুমতীকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। গুর্জরনগরে ধূমকেতুর কাছে ইন্দুমতীর খবর দিয়ে গোপনে পত্র পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এই সিদ্ধান্ত পালিত হয়েছে। মন্ত্রীর দূত ধূমকেতুর কাছে ইন্দুমতীর খবর পৌছে দিয়েছে। ধূমকেতু অজয়ের কাছে ইন্দুমতীকে প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছে। এই দৃশ্যটি অনাবশ্যক তাই পরিহার্য। পূর্ব দৃশ্যের সাহায্যেই পাঠক-দর্শক এটুকু ভেবে নিতে পাবে। পাঠকের ভাবনাকে এটুকু অবকাশ দেওয়া ভাল রচনার লক্ষণ। দ্বিতীয় দৃশ্যও ঘটনার দিক থেকে একান্ত দীন। ব্যর্থ প্রণয়ী অজয়ের রাজকর্মে অনীহাই এর একমাত্র নূতন দিক। পাঞ্চালদূত এবং ধূমকেতুর সেনানীর আগমন সংবাদ দেবার কোন অর্থ নেই, পরের দৃশ্যে তাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের ব্যবস্থা যখন করাই হয়েছে। আগের এক দৃশ্যের মত এই দৃশ্যেও অরুন্ধতীর কিছু অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা নিস্তরঙ্গ দৃশ্যে সামান্য নাটকীয়তা সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়, তবে তা একান্ত স্থূল। তৃতীয় দৃশ্যের নাগরিকদের অনাবশ্যক কথোপকথনটুকু বাদ দিলে নাট্যসমৃদ্ধি লাভ করা যেত। পাঞ্চাল দূতের যুদ্ধ ঘোষণা এবং গান্ধার দূতের ইন্দুমতী যাজ্ঞা যে নাট্যসম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল অজয় একটু দৃঢ়তা প্রকাশ করলে তাতে চমৎকার দ্বন্দ্বরসের আস্বাদ পাওয়া যেত। চতুর্থ দৃশ্যটি রচনার দিক থেকে উৎকৃষ্ট। ধূমকেতুর হাতে অজয় বাধ্য হয়ে তাকে সমর্পণের সিদ্ধান্ত করেছে এই সংবাদ ইন্দুমতীর কাছে পৌছেছে। ইন্দুমতীর অভিমান, বেদনা এবং আত্মহননের সঙ্কল্প খুবই সংযত ভাষায় এই দৃশ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটির কোন প্রয়োজন ছিল না। অরুন্ধতীর কাছ থেকে ইন্দুমতীর বিদায় গ্রহণের জন্য একটা স্বতন্ত্র দৃশ্যের আয়োজন প্রায় অর্থহীন। দ্বিতীয় দৃশ্যটি ঘটনাচঞ্চল, এবং বলা যায় ঘটনাবহুল। ইন্দুমতী, অজয়, সুনন্দার আত্মহননে নাটক শেষ হয়েছে।

নাটকের শেষ দৃশ্যে পর পর তিনটি আত্মহত্যা ঘটিয়েছেন কবি। এর কোনটিই আকস্মিক নয়। এদের প্রত্যেকের চরিত্র এবং ঘটনার বিচিত্র গতি এই আত্মহননকে একরূপ অনিবার্য করে তুলেছিল। তবুও একই

দৃশ্যে একই ধরনের তিন তিনটি মৃত্যুতে অতিনাটকীয়তা প্রকট হয়ে উঠেছে।

নাট্যঘটনা শেষ হয়ে যাবার পরেও নাট্যকার থামেন নি। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনিদের নিয়ে এসে ইন্দিরার পুরাতন কথা আমাদের শুনিয়েছেন। এই রহস্যটি উদ্ঘাটন দর্শকের কৌতূহল নিবৃত্তির দিক থেকে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু অজয়-ইন্দুমতীর আত্মহনন দর্শক-পাঠকের মনকে এমন একটা হতাশ শূন্যতায় ভরে দেয় যাতে এজাতীয় সংবাদ তার মনে আর কোনরূপ দাগ কাটতে পারে না। তাছাড়া অজয়-ইন্দুমতী পূর্বজন্মে গন্ধর্ব ছিল বলে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা একান্ত অনাটকীয়। অন্তত এ-অংশে সংবাদ প্রভাকরেব সহ-সম্পাদকের হাতের স্পর্শ আছে এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অজয়-ইন্দুমতীর ভাগ্যে ব্যাখ্যার অতীত কারণে যে বিপর্যয় এসেছে তা মানুষকে বিমূঢ় করে তোলে, অত সহজে তাব সমাধান পাওয়া যায় না। রসের আবেদনেও এই অংশ পর্যাপ্ত সাহিত্যরুচিব পরিচয় বহন করে না। গভীর ট্রাজিক হাহাকারেব অব্যবহিত পরে এ জাতীয় শান্তিবারি বর্ষণের চেষ্টা আস্বাদের দিক থেকে পাঠক-দর্শকের মনকে আকর্ষণ করতে পারে না।

॥ তিন ॥

চবিত্রচিত্রণের দিক থেকে মায়াকাননের মূল্য বেশি নয়। চরিত্রগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাব চোখে পড়ে। তাছাড়া বিবর্ণতাও অনেক চরিত্রের আবেদনকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে।

নাটকের দুর্বলতম বিষয় নায়ক অজয়ের চরিত্র। ব্যর্থ প্রণয়ীরূপে তার উদাসীন মূর্তি দায়িত্বজ্ঞানহীন তারুণ্যের কথা মনে কবিয়ে দেয়। ইন্দুমতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে অন্য নারীকে বরণ না কবার প্রতিজ্ঞায় কিছু দৃঢ়তা এবং অনেকখানি রূপমোহ আছে। ইন্দুমতীকে দেখে তার মূর্ছিত হয়ে পড়ায় এবং ইন্দুমতীর সঙ্গে মিলন না ঘটায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে কর্মজগৎ থেকে অন্তরের অন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করায় তার চরিত্রের পৌরুষ লাঞ্ছিত হয়েছে। বিরোধী ঘটনা এবং প্রতিকূল দৈবের প্রতিরোধের বলিষ্ঠতা তার চরিত্রে আমরা দেখি না। পাঞ্চাল দূতের অসিপ্রদর্শনের কোন দৃঢ় উত্তর তার মুখ থেকে বেরোয় নি। ধূমকেতু ইন্দুমতীকে প্রার্থনা করলে তার প্রেমিকপ্রাণ নৃপতির ক্রুর ক্রোধে, ক্ষত্রিয়ের বীর্যে যে উত্তেজনা প্রকাশ

করতে পারত, অন্তত যেটুকু কঠিন বিরুদ্ধতা না দেখালে তার মনুষ্যত্বও মিথ্যা হয়ে যায় তার সামান্য অংশও এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি না। অজয় যেভাবে তার প্রিয়তমা রমণীকে শুধু রাজ্যরক্ষার জন্য শক্তিশালী নৃপতির হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত হয়েছে তাতে প্রেমের মর্যাদা মাটিতে লুণ্ঠিত হয়েছে, আশ্রিতকে রক্ষা করার রাজকীয় আদর্শ আহত হয়েছে, মানবতা অস্বীকৃত হয়েছে। অন্তত সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যদি অবক্ষয়িত নায়কের সম্মতিদানের চিত্র আঁকা হত, তার চরিত্রের মাহাত্ম্য কিছুটা রক্ষিত হত। অজয়ের অপদার্থতা এতটা বড় হয়ে উঠেছে যাতে তার প্রেম এবং আত্মদান সবই গৌরবহীন ও তুচ্ছ হয়ে পড়েছে।

লক্ষণীয় মায়াকাননে উল্লেখযোগ্য পুরুষচরিত্র মাত্র দুটি। অজয়ের মন্ত্রী বেশ সক্রিয়তা দেখিয়েছে এ নাটকে। ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা যদি কেউ করে থাকে তবে পুরুষের মধ্যে মন্ত্রী এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে অরুন্ধতী, নায়ক অজয় নয়। রাজার উদ্যানে কন্যাসম্মেলনের ব্যবস্থা, এবং ধূমকেতুর কাছে গোপনে খবর পাঠানোয় তার ভূমিকা আছে। অজয়ের সে হিতাকাঙ্ক্ষী, সে শান্ত এবং বিবেচক। হৃদয়বৃত্তিকে রক্ষণশীল বুদ্ধির উপরে স্থান দেবার পক্ষপাতী সে নয়। অর্থাৎ এদেশের নাটকের মন্ত্রীরা শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক তাই। এই হৃদয়ধর্মের অল্পতাই তাকে বিবর্ণ করেছে; আবার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এমনভাবে প্রকাশিত নয় যাতে তা ঔজ্জ্বল্য পেতে পারে।

অরুন্ধতী কৃষ্ণকুমারী নাটকের সন্ন্যাসিনীরই পুষ্টতর রূপ। কপালকুণ্ডলাকে দর্শক হিসেবেই দেখেছি। অরুন্ধতীর সক্রিয়তা এবং দায়িত্ব তার তুলনায় অনেক বেশি। এই চরিত্রটিকে অনেকখানি ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করে তুলতে পেরেছেন নাট্যকার। অজয়ের কল্যাণকামনায় ইন্দুমতীর প্রেম থেকে তাকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা অরুন্ধতী করেছে, এবং মঙ্গলার্থে এই তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করার জন্য অন্তরে বেদনাও অনুভব করেছে।

কপালকুণ্ডলার চরিত্রকে আশ্রয় করে কবির যে মর্তমমতা প্রকাশ পেয়েছিল অরুন্ধতীর চরিত্রে তা প্রবলতর শক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। অরুন্ধতী তপস্যা-প্রবৃত্তিকে অন্তর্মুখী ও সংহত করলেও সে হৃদয়দৌর্বল্য থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এখানেই তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

নারী চরিত্রের মধ্যে শশিকলা এবং সুনন্দা অকিঞ্চিৎকর। শশিকলা তার ভাইয়ের প্রতি ভালবাসায়, ইন্দুমতীর প্রতি সখ্যে এবং আন্তরিক প্রীতিতে মোটামুটি প্রাণলক্ষণযুক্ত হলেও একান্ত মামুলি। আর সুনন্দা প্রায়ই ইন্দুমতীর পশ্চাতে আপন স্বাতন্ত্র্যকে সম্বরণ করে রেখেছে, যখন তা আত্মহত্যায় প্রকাশ পেয়েছে তখন উচ্চকণ্ঠ অতিনাটকীয়তায় তার স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়েছে।

কিন্তু ইন্দুমতীকে সুঅঙ্কিত চরিত্র বলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। রাজকীয় ঐশ্বর্য ও গৌরব থেকে ছদ্মবেশের সামান্য জীবনে অবনমিত হয়ে সে প্রতিনিয়ত মানস-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। প্রশান্তির সঙ্গে সে আশ্রমজীবনকে গ্রহণ করতে পারে নি। তাহলে প্রথম দৃশ্যে তার সংলাপে ভাগ্যাহত রমণীর চাপা অন্তর্বেদনা প্রকাশ পেত না। ইন্দুমতীর চরিত্র ঘিরে এক বিষাদঘন পরিমণ্ডল প্রায় আদ্যন্ত বিরাজ করেছে। মাঝখানে একটিমাত্র দৃশ্যে মুহূর্তের জন্য যুবতী রমণীর প্রথম প্রণয়াবেগের কৌতুক বিদ্যুৎ ঝলকের মত প্রকাশ পেয়েছে। শশিকলার সঙ্গে সে রসিকতা করেছে, বীণাসহযোগে মধুর সঙ্গীত পরিবেশন করেছে (৩।২)। অরুন্ধতীর ভাষায় ইন্দুমতীর মুহূর্তস্থায়ী এই তরুণ-মধুব মূর্তির প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়েছে। ["সুবর্ণ-প্রজাপতি, অতি অল্পকাল মাত্র জীবন ধারণ করে,—আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিবাহিত করে, এরাও তাই করুক! শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ অসি সর্ব্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ অনুগ্রহ।"]

ইন্দুমতীর প্রেম তাকে অজয়ের ন্যায় সংসারবিরাগী উদাসীন করে তোলে নি। এই ঔদাসীন্যে অন্তরের গভীরতার চেয়ে চরিত্রের তরল উচ্ছ্বাসাতিরেক এবং অন্তঃসারশূন্যতা বেশি প্রকাশিত। ইন্দুমতীর স্বল্পবাক্ সংহতি তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর চরম পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তার আত্মহননের মধ্যে।

ইন্দুমতীর প্রেম তাকে নারী-মহিমা থেকে ভ্রষ্ট করে নি। উনবিংশ শতকের নবজাগরণ নারীব্যক্তিত্বে যে বীর্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, মধুসূদন তাঁর কাব্যসৃষ্টির স্বর্ণযুগে সেই মন্ত্রকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মুমূর্ষু কবি সেই নারী-মহিমা থেকে তাঁর নায়িকাকে বঞ্চিত করেন নি। প্রেম তার আত্মাকে প্রেমিকের খেলার পুতুল হতে দেয় নি; প্রেমকে সে

জীবনের চেয়ে বড় বলে জেনেছে—প্রণয়-ব্যর্থতায় সে আত্মাহুতি দিয়েছে; কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্বকে মেনেছে প্রেমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে, তাই মৃত্যুর উপরেও আত্মঘোষণার এই বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে, "মহারাজকে আরো বলিস, গান্ধারের রাজকন্যা বিনিময়ের সামগ্রী নয়।" শুধু প্রণয়-ব্যর্থতা নয়, বিনিময়-সামগ্রী হবার লজ্জা ও অপমান তাকে তীরের মত বিঁধেছে এবং স্বেচ্ছায় অনিবার্য মৃত্যুর সঙ্গিনী করেছে।

॥ চার ॥

মায়াকাননের আসল মূল্য এর নাট্যরসে, কাহিনীগ্রন্থনে কিংবা চরিত্র-চিত্রণে নয়। কবি এই নাটকে মৃত্যুমুখী আপনাকে প্রতিবিম্বিত করে দেখেছেন। মায়াকানন আসলে মায়ামুকুর। মধুসূদনের নাটকে নানাভাবে তাঁর মনোভাব ধরা পড়েছে, কোথাও কিঞ্চিৎ আত্মপ্রতিবিম্বনও আছে। তবে নাট্যসাহিত্যের সাধারণ ধর্ম যে detachment বা নৈর্ব্যক্তিকতা, তাকে অন্তত কিছুটা রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে কবি অবহিত ছিলেন। মায়াকাননে যে রূপ ব্যাপকভাবে কবি নিজেকে ধরে দিয়েছেন, মেঘনাদবধ এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতা ছাড়া আর কোথাও তা ঘটে নি।

মায়াকাননে আদ্যন্ত একটা সর্বব্যাপী সর্বনাশের সুর বেজেছে। রুষ্ট দৈবের সামনে অসহায় মানুষের বাসনাকামনা কিরূপ শুষ্ক হয়, প্রেম মৃত্যুকে ডেকে আনে তার মর্মান্তিক হাহাকারে এই নাটক পূর্ণ। কেন এ সর্বনাশ, কোন্ অজ্ঞাত উৎস থেকে কার্যকারণের কোন্ সূত্রে এই বিপদ ঘনায় মানব জীবনে সে রহস্য উন্মোচনে কবি ব্যর্থ হয়েছেন। এক বিমূঢ় জিজ্ঞাসা বিশ্বের আকাশে উত্থিত করে তিনি নিজেও মায়াকাননের নায়ক-নায়িকার মত পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কবি নিজে আজ জরাজীর্ণ, রুগ্ন, পরাজিত। তার নায়কও প্রথমাবধি এই পরাজয়ের মনোভাব বহন করেছে। নতমস্তকে দৈবকে মেনে নিয়েছে। প্রতিরোধের সব শক্তি যেন আজ নিঃশেষিত। ক্লান্ত পদক্ষেপে মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশ করাই যেন একমাত্র করণীয়।

কিন্তু এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে গিয়েও ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব প্রথম দ্বিধাহীন মানববাদী কবি তাঁর শেষ প্রণতি জানিয়ে গিয়েছেন এই বিশ্বের প্রতি, বিচিত্র মানবিক অনুভূতির প্রতি। তাপসী অরুন্ধতীর এই আত্মোদ্ঘাটনে—"ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার

কোমল হৃদয় বিদারণ করে, উদ্যানশোভা লতিকার মূলোৎপাটনপূর্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসবৃত্তিও কালসহকারে অস্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতাগুল্মাদির মূল পর্যন্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো।"—নিঃসংশয়ে কবির অন্তরের বিদায়বাণীতে প্রকাশ পেতে চেয়েছে এক অপূর্ব মর্ত্যমমতা,—বৈরাগ্যে নয় মানুষকে ভালবাসায় আমাদের পরিচয়।

> "এ পারেব ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
> ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
> বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে ॥"[৪]

[১] 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' দ্রষ্টব্য।

[২] আমার 'মধু-বিচিত্রা'র অন্তর্গত 'মধুসূদনের জীবন গোধূলির কবিতা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

[৩] "One day, the wife of king Cinyras the Cyprian—but some call him king Phoenix of Byblus, and some king Theias the Assyrian—foolishly boasted that her daughter Smyrna was more beautiful than Aphrodite. The goddess avenged this insult by making Smyrna fall in love with her father and climb into his bed one dark night, when her nurse had made him too drunk to realise what he was doing. Later, Cinyras discovered that he was both the father and grandfather of Smyrna's unborn child and wild with wrath, seized a sword and chased her from the palace. He overtook her on the brow of a hill, but Aphrodite hurriedly changed Smyrna into a myrrh-tree, which the descending sword split in halves."

—[The Greek Myths vol. 1 : R. Graves]

[৪] রবীন্দ্রনাথ : প্রান্তিক।